পরিচয়-এর কুড়ি বছর
ও
অন্যান্য স্মৃতিচিত্র

হিরণকুমার সান্যাল

ভূমিকার বদলে

সুশোভন সরকার

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : ঈদ ১৯৭৮

স্বত্ব : মীরা সান্যাল

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার
প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬ বি বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

জেলদ্গর : দীনেশ বিশ্বাস
১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রুফ-সংশোধক : সুবিমল লাহিড়ী

পনেরো টাকা

সূচীপত্র

অন্যান্য স্মৃতিচিত্র

ভূমিকার বদলে

আমার সঙ্গে হাবুলের প্রথম বন্ধুত্ব হয় ১৯১৮ কিংবা ১৯১৯-এ। সে আমার চেয়ে বয়সে এগার মাসের বড় ছিল। জন্ম তার ১৮৯৯-এর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় অর্ধে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় আরো বেশিদিনের। আমার স্ত্রী তখন ছিলেন স্কুলের ছাত্রী। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই অবধি, একটানা ষাট বছর, তার মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের গভীর সখ্য অটুট ছিল। বিশেষ ক'রে তার জীবনের শেষ বছর চারেক সে যখন গড়িয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করল, তখন আমরা তার প্রায় প্রতিবেশী হয়ে পড়লাম।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তিন-চারদিন সন্ধ্যাবেলাগুলি তখন সে আমাদের সঙ্গে কাটাত। কত গল্প আলোচনা ছোটখাটো ঝগড়া তর্কাতর্কি—এই সব স্মৃতিতে আমাদের মিলিত শেষকটি বছর যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তার দরজায় এসে ঘণ্টা বাজানোর একটা বিশেষ রীতি ছিল। বেল্-এ হাত রেখে সে একটানা অনেকক্ষণ ধ'রে বাজাত। এখনো মাঝে-মাঝে সব ভুলে গিয়ে চমকে উঠি—মনে হয় আবার বুঝি সেইভাবে ঘণ্টা বেজে উঠবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন হাবুলের সঙ্গে প্রথম ভাব হয়, তখন আমরা সহপাঠী। কী আনন্দে যে সেই দিনগুলি কেটেছিল—এখনো খুব মনে পড়ে। আমি থাকতাম প্রেসিডেন্সি কলেজের খুবই কাছে। প্রথমে মেসে, পরে হিন্দু হোস্টেলে। হাবুলের বাড়ি তখন ছিল বাদুড়বাগানে। কলেজের বাইরেও আমাদের দেখাশোনা হ'ত। প্রধান-প্রধান জায়গা ছিল কয়েকটি কাছাকাছি অবস্থিত পরিবারের বাস-ভবনে। যেমন মহলানবিশ পরিবারে, হেরম্ব মৈত্রের বাড়ি, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ি এবং স্যার নীলরতন সরকারের গৃহে। এছাড়াও আমরা গল্পগুজব করতাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রাঙ্গণে ও সংলগ্ন গলিতে।

তরুণ ব্রাহ্মেরা কতকগুলি ক্লাব-জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। প্রত্যেক-টিরই নাম দেওয়া হয়েছিল ফ্রেটার্নিটি। সেগুলির অবিসংবাদী নেতা ছিলেন তাতাদা অর্থাৎ সুকুমার রায়, এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র

আকাশের তলায় রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—"আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।"

বিলেত থেকে ফিরে আমি শিক্ষকতা গ্রহণ করলাম। আমি পড়িয়েছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে—পর-পর এই সব প্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষকতা গ্রহণের পর আমি বিবাহ করি। মহলানবিশ পরিবারে। সময়টা ছিল ১৯২৬। বলা বাহুল্য এই অনুষ্ঠানে ও অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে হাবুলই ছিল একরকম প্রধান কর্মকর্তা। বেশিরভাগটাই কন্যাপক্ষের দিক থেকে। আমাদের নতুন সংসারে হাবুল নিয়মিত আসত, এবং সর্দারি করত। তারপর ১৯২৯-এ আমি যখন ঢাকায় চাকরি নিয়ে যাই তখন সে ধিক্কার দিয়ে যে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিল তার ভাবটা ছিল সংক্ষেপে এইরকম—টাকার লোভে সুশোভন ও রেবা ঢাকা চ'লে যাচ্ছে, আর এদিকে বৈকালিক চায়ের অভাবে আমি যদি উপবাসে মরি, তাহলে লোকে কী বলবে?

ঢাকাতে সে আমাদের কাছে একবার গিয়েছিল। কিন্তু তাকে স্বাস্থ্য কারণেই থাকতে হয়েছিল অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়ি। তিনি ছিলেন তার পিতৃব্যস্থানীয়। ১৯৩৩-এর গোড়ার দিকে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলাম। আমার মেয়ে কাজলা তখন দেড় বছরের শিশু। সেই থেকে যতদিন হাবুল বেঁচেছিল সে কাজলাকে ভালোবেসে এসেছিল প্রায় নিজের প্রাণের মতন। কাজলাকে সে কত মজার-মজার চিঠি লিখত আর কবিতা পাঠাত।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য মিলিত হয়ে 'পরিচয়' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় বয়সে কিছুটা বড় হলেও কলেজ-জীবন থেকেই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের বেশ কিছুদিন আগে থেকে সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতে ঘন-ঘন বৈঠক বসত। এই পরামর্শ সভা থেকেই উদ্ভব হয় 'পরিচয়'-এর সুবিখ্যাত শুক্রবারের আড্ডা। সে-আড্ডা সম্বন্ধে হাবুলের প্রকাশিত লেখা সুপরিচিত।

'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হয়। সেটাই আমার প্রথম বাংলা লেখা। সাধু ভাষায় আড়ষ্টভাবে লিখিত। দ্বিতীয় সংখ্যায় হাবুলের লেখা প্রকাশিত হয়। সেই থেকে সে হয়ে দাঁড়ায় 'পরিচয়'-এর এক প্রধান সাহিত্য-শিল্প-বিষয়ক সমালোচক ও লেখক, এবং শুক্রবারের বৈঠকের

এক নিয়মিত সভ্য। 'পরিচয়'-এর আড্ডার তুমুল তর্কাতর্কিতে হাবুল বিশেষ যোগ দিত না। কিন্তু থেকে-থেকে তার মজার মন্তব্যে ঘরের উত্তেজনা প্রশমিত হ'ত কৌতুকের প্লাবনে। 'পরিচয়'-এর আড্ডায় হাবুলের প্রধান অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন দার্শনিক বসন্তকুমার মল্লিক, যিনি মল্লিকদা নামে পরিচিত ছিলেন। আড্ডার সবিশেষ বিবরণ শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের ধারাবাহিক ইংরেজি ডায়রিতে লিপিবদ্ধ আছে।

বিলেত থেকে আমি ফিরেছিলাম মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে। প্রথমটা হাবুলের পলিটিক্‌স-এ বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে পরিচয়-এর আড্ডায় তার মতামত বামমার্গের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর খানিকটা বোধহয় সঙ্গদোষ। ইতিমধ্যে বৈঠকে এসে জুটেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ইত্যাদি বামপন্থী।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে একটা চলতি বিশ্বাস—হাবুল সাহিত্য, শিল্প, গান, খাওয়াদাওয়া, কৌতুক ইত্যাদিতেই ছিল ভরপুর। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তার মনে রাজনৈতিক বামপন্থী বিশ্বাসও স্থান পেয়েছিল। সেটা বাইরের আচরণে প্রকাশ পেত না, কিন্তু তার প্রমাণ মেলে কয়েকটি ব্যাপারে। প্রথমে 'পরিচয়'-এর যুক্ত সম্পাদক হয়ে সে সুধীন্দ্রনাথের কাজের লাঘব করত। কারণ 'পরিচয়' তখন মাসিক পত্রিকা হওয়ায় তার কাজ বেড়ে গিয়েছিল। তারপর 'পরিচয়' ক্রমশ হাত বদল হয়ে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে আসে। তখনো কিন্তু সাহিত্যিক হিরণকুমার সেই পলিটিক্‌স-মুখী কাগজের হাল ছাড়ে নি। গোপাল হালদারের সঙ্গে সে হ'ল যুক্ত সম্পাদক। 'পরিচয়'-এর এবং পার্টির ঘোর দুর্দিনেও তারা হাবুলের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে নি। যদিও নীরেন রায়ের 'ডগম্যাটিজম্' (তার মতে) তাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করত।

অবশ্য চল্লিশের বছরগুলিতে হাবুলকে বেশি আকর্ষণ করত স্বভাবতই বামপন্থার সাংস্কৃতিক আন্দোলন। অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সে ছিল এক পাণ্ডা। (মনে পড়ে যুদ্ধের পরে যখন এর নাম পাল্টে আবার প্রগতি লেখক সংঘ করা হয়, তখন হাবুলের ঘোর আপত্তি ছিল অ্যান্টিফ্যাসিস্ট কথাটা বাদ দেওয়ার জন্য। তার মতে 'প্রগতি' একটা loose শব্দ। তার অনেক অর্থ হতে পারে এবং হয়ও। কিন্তু অ্যান্টিফ্যাসিস্ট কথাটা অত্যন্ত direct এবং ফ্যাসিজমের বিপদ সহজে কাটিয়ে ফেলা যায় না।) এই কথাগুলির মধ্যে একটা রাজনৈতিক বিশ্বাস কি খুব প্রকট নয়?

৪৬নং ধর্মতলায় হাবুল তার মনের মতো কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল। আমার চেয়ে তার ওখানে আনাগোনা অনেক বেশি ছিল। কারণ আমি তখন মার্কসতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও প্রচারে বেশি ব্যস্ত ছিলাম। গণনাট্য আন্দোলন, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে হাবুলের ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। কিন্তু তার সাহিত্যের মানদণ্ড ছিল খুব উঁচু স্তরের। বামপন্থী শিল্প ব'লেই শিল্পের যথাযথ সমালোচনা থেকে সে কখনো বিরত থাকে নি। বস্তুত 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত তার তীক্ষ্ণ সমালোচনাগুলি একত্র ক'রে প্রকাশ করার তাই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই সব লেখার মধ্যে অনেক অপ্রিয় কথা থাকত। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের একটা উঁচু মানদণ্ড সে বরাবর তুলে ধরতে চেয়েছিল। সুধীন্দ্র মিথ্যে-মিথ্যে বলে নি যে, "আজকালকার বাংলা লেখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্টাইল হ'ল হাবুলের।"

তথাকথিত 'শুদ্ধ' এবং কথ্য বাংলা, দুই রীতিতেই হাবুল ছিল সিদ্ধহস্ত। আর বাংলা কথার মধ্যে অযথা ইংরাজি মেশানো ছিল তার কাছে অসহ্য। পরিচিত কোন পরিবারে ছেলেমেয়েদের বাড়িতে ইংরাজি বলা সে অন্যায় মনে করত। কেক তার প্রিয় ছিল, কিন্তু birthday cake-এ সে অত্যন্ত বিরক্ত হ'ত। নিজের জন্মদিন সে বরাবর পালন করত বাংলা তারিখ (৬ই আশ্বিন) অনুসারে।

কালক্রমে হাবুল 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার ভার থেকে মুক্তিলাভ করল, কিন্তু প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হাবুল 'পরিচয়'-এর কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে গিয়েছিল, যেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 'পরিচয়' অফিসের দোতলায় গিয়ে তার অভ্যাস ছিল নীচের দোকান থেকে চা সিঙ্গাড়া চপ ইত্যাদি আনিয়ে সকলকে খাওয়ানো। আমি মনে করি দীপেন বা হাবুলের অন্যান্য একালীন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর এ-বিষয়ে সবিস্তারে কিছু লেখা দরকার। কারণ হাবুল ছাড়া আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি তরুণ লেখকদের তরুণ মনের সঙ্গে সজীব সম্পর্ক বজায় রেখে চলা। সাধে কি সে সকলের হাবুলদা কিংবা হাবুলমামা হয়ে স্মৃতিতে বিরাজ করছে!

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল অসীম। দেশের দুর্ভাগ্য সে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য বই লিখে গেল না আমাদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথের সে ছিল পরম গুণগ্রাহী। কিন্তু তা ব'লে সে সমালোচনা করতেও কখনো পশ্চাৎপদ হয় নি। তার মতে রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কবিতা, যা আজকালকার পাঠকেরা শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করেন, ভাবসম্পদে এবং মাঝে-মাঝে সহজ সারল্যে অতুলনীয় হলেও আগেকার লেখার মতো ঠিক পূর্ণাঙ্গ কবিতা হয়ে ওঠে নি। সে বলত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান দুর্বলতা হ'ল diffuseness যেটা মহাকবির পক্ষে একটা খুঁত তো বটেই। আমি তাকে প্রশ্ন করি তার অতি প্রিয় কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য নয় কি? সে ঠিক উত্তর দিতে পারে নি। অবশ্য হাবুল বরাবরই রোম্যান্টিকতারই পক্ষপাতী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলির সে ছিল বরাবরের ভক্ত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতি তার এই আকর্ষণ হয়তো-বা তার দাদামশায় হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কাছ থেকে পাওয়া। শুনি যে, আজকাল ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতি শ্রদ্ধা ইংরেজি সাহিত্য-মহলেও আবার ফিরে আসছে। এ-সব ব্যাপারে আমি অবশ্য কিছু বিশেষজ্ঞ নই।

আমার কথা হ'ল, হাবুল ভালোবাসত প্রকৃতি আর মানুষকে। সাধারণ মানুষকে। প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ তার শেষদিন পর্যন্ত চোখে পড়ে। হাবুলের প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা শুরু হয় শৈশবে তার ঠাকুরদাদার (রামব্রহ্ম সান্যালের) বাড়িতে। তিনি আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রথম ভারতীয় সুপারিনটেনডেন্ট। তাঁর *Hours with Nature* বইখানি অনেককে মুগ্ধ করেছে। আলিপুর Zoo-র বাগানে শিশু হাবুল গাছপালা জীবজন্তুর ঘনিষ্ঠ স্পর্শ প্রথম পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শিকার-কাহিনীর প্রতি তার আকর্ষণের প্রধান বস্তু নিশ্চয় ছিল ঠিক প্রাণীশিকার নয়, অরণ্যের স্পর্শ ও স্বাদটুকু।

একডালিয়া রোডের বাড়ি শহরের জঞ্জাল হয়ে উঠছে দেখে হাবুল গড়িয়ায় তার দিদির বাড়ি ভাড়াটে হিসেবে আশ্রয় নেয়। তখন গড়িয়ার চারপাশের আধাশহর পল্লীতে, এবং গ্রামে, অবিরাম ঘুরে বেড়ানোতে তার যে কী আনন্দ দেখেছি! অজানা পাড়ায় গিয়ে গৃহস্থবাড়ির লোকের সঙ্গে আপনা থেকে আলাপ করা, খালি বাস পেলে গড়িয়া স্টেশনে চ'লে গিয়ে চা খাওয়া, বোড়ালগ্রাম ও তার আসেপাশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে লোকের সঙ্গে পরিচয় করা, এত শক্তি আমার মতন লোকের প্রকৃতিতে নেই। তবে কাজনা সময় পেলেই তার সঙ্গে জুটে পড়ত।

কলকাতার এবং বাইরের খাওয়ার দোকান সম্বন্ধে তার আগ্রহ এবং এ-সব বিষয় নিয়ে তার লেখা সুবিখ্যাত। আমার নিজের বিশ্বাস যে ভোজ্যদ্রব্যের সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ মানুষের মেলায় মিশে যাওয়ার ব্যাপারটাও তাকে অবশ্যই

আকৃষ্ট করত। কারণ আশ্চর্যের কথা এই যে, খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে এত বলা এবং লেখা সত্ত্বেও হাবুলের আহার ছিল অতি পরিমিত। আসলে হাবুল ছিল — ফরাসীতে যাকে বলে — gourmet, কিন্তু gourmand নয় — connoisseur in eating কিন্তু glutton নয়।

সংসার-জীবনে দীর্ঘকাল হাবুলের সঙ্গে ছিলেন একমাত্র তার মা। আর পৈত্রিক কিছু সম্বল তার ছিল। সেইজন্য ঠিক দশটা-পাঁচটা অফিস করা তার খুব প্রয়োজন হয় নি। যৌবনের পূর্ণ ব্যবহার সে এই সুযোগে করেছিল দেশভ্রমণ ক'রে। আমাদের সকলের চাইতে বেশি ক'রে নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ সুবিধা ও সৌভাগ্য তার হয়েছিল। পরে অবশ্য শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় দীর্ঘদিন বাইরে বেড়ানো বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হয়। শেষ জীবনে তাই চ'ষে বেড়িয়েছিল কলকাতা শহর ও তার সংলগ্ন পল্লীগুলিতে।

আমরা অনেকবার তাকে বলেছি, তার সমস্ত ভ্রমণ-কাহিনী লিখে রাখার জন্য। কিন্তু কোন-কিছুই সম্পূর্ণ করা তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সম্ভবত 'আলেখ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তার এক ভ্রমণ-কাহিনী, ভারতের কয়েকটি অপরিচিত অঞ্চলের দৃশ্য ও তার সম্বন্ধে অনুভূতি। বাংলায় এমন ভ্রমণ-কাহিনী আমার চোখে পড়ে নি।

আমাদের আর-একটা আক্ষেপের ব্যাপার রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যিকার বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সে কোন-কিছু লিখে গেল না। একটা কারণ অবশ্য ছিল। সে নিজে হাতে লিখতে ভালোবাসত না। তার খানিকটা অক্ষমতাও ছিল। তাই সে সন্ধান করত একজন 'লেখাবাবু'র। লেখাবাবু অর্থাৎ যে ওর কথাগুলো লিখে নিতে পারবে। এই কাজ অনেকদিন সম্পন্ন করেছিলেন সত্যজিৎ দাশ, এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরির একজন উচ্চ কর্মচারী। ইদানীং-কালে লেখাবাবু হয়েছিলেন সুবিমল লাহিড়ী। মাঝে-মাঝে আরো অনেকেই হয়তো তাকে লিখতে সাহায্য করেছে। আসলে তার মনটা ছিল খানিকটা অশান্ত। কিছুতেই স্থির হয়ে বসত না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে হাবুল প্রাচীন ব্রহ্মসঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিল। সে-গানের সুর-গাম্ভীর্যের জন্যই তার প্রাচীন ব্রহ্মসঙ্গীত খুব ভালো লাগত। কিন্তু আধুনিকতম গানেরও সে ছিল খুব সমঝদার। আমার সঙ্গে এ-সব নিয়ে তার খুব তর্ক হ'ত। হাবুল মনে করত প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথের মধ্য ও শেষ জীবনের গানের প্রধান উপজীব্য। কারণ হাবুলের মতো তিনিও এই মাটির পৃথিবী ও মাটির মানুষের

প্রতি আসক্ত ছিলেন। সে বলত রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য : পৃথিবী আমাদের প্রিয়। (কথাটা বোধহয় হাবুলের পক্ষেও সমান প্রযোজ্য।)

আমি বলতাম রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে কিন্তু এরই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে গেছে এক অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা। তার কারণ কী আমি ঠিক বলতে পারি না। বৈষ্ণব কবিতায় যেমন দেবতার প্রতি ভক্তি ও মানুষের প্রেম একাকার হয়ে গেছে দেখা যায়, আমার মনে হ'ত রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং প্রেমের বেদনা (প্রেমের আনন্দ নয় কিন্তু) কীরকম যেন জড়িয়ে গেছে। বিশেষ কোন গানে কোন্ ধারাটা প্রধান এই নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্কের ঝড় বইত। সে যাই হোক, এই পৃথিবী আর এই জীবন হাবুলেরও অতি প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও যেমন দেখা যায়।

সমালোচকেরা অনেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রায় একেবারে গোড়া থেকে মৃত্যু সম্বন্ধে একটা ভয় লক্ষ্য করেছেন। হাবুল আর আমি একমত ছিলাম যে, সেই ভয় আর কিছুই না শুধু পৃথিবী আর মানুষকে ছেড়ে চ'লে যাওয়ার কষ্ট। তাই তার শ্রাদ্ধ-বাসর আমরা গান দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলাম। পৃথিবী ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার গান।

আগেই বলেছি, যে, বিশেষ ক'রে অনেক লোকের সামনে হাবুলের কৌতুকপ্রিয়তাই বেশি প্রকাশ পেত। সঙ্গে-সঙ্গে দু-একটা ব্যাপারে দুর্বলতাও দেখা যেত। যেমন অতীতে কোন আঘাত পেলে সে সেটার স্মৃতি ঝেড়ে ফেলতে পারত না। কিন্তু কৌতুকের আড়ালে যে পলিটিকাল আদর্শের বিশ্বাস তার মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার নিদর্শনও পেয়েছি। যেমন অ্যান্টিফ্যাসিস্ট যুদ্ধের সময় সে এগিয়ে এসে 'রথের রশি'তে পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। (অবশ্য স্টেজে উঠে পার্ট অনেকখানি ভুলে গিয়ে সে মঞ্চের ওপরই নতুন-নতুন কথা বানিয়ে-বানিয়ে বলেছিল।) তার রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসের আর-একটি প্রমাণ ঘোর দুর্দিনেও পার্টি ও 'পরিচয়'-এর পাশাপাশি থাকা। আর-একটা নিদর্শন হ'ল সোমেন চন্দর হত্যাকাণ্ডের পর তার 'পরিচয়'-এর সম্পাদকীয়। যেটির সম্বন্ধে বন্ধুবর নীরেন্দ্রনাথ রায় বলেছিলেন এবার সত্যিই 'পরিচয়'-এর মোড় ফিরল। কিংবা এই সেদিন চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যখন 'দেশ' পত্রিকা স্বাধীন সাহিত্য-এর নামে লেখকের পর লেখককে প্রায় কোণঠাসা ক'রে স্বীকারোক্তি আদায় ক'রে নিচ্ছিল যে তারা কমিউনিজম্-বিরোধী তখন, হাবুল একদিন আমার মেয়ের কাছে এসে

সুকান্তের 'ছাড়পত্র' বইটির পিছনের মলাটের ভিতরের পাতায় সুকান্তের 'ঘুম নেই' থেকে "বিক্ষোভ" নামে একটি কবিতা লিখে দিয়ে গেল। তার দুটি ছত্র এখানে উদ্ধৃতি করি :

"ইতিহাস জানি নীরব সাক্ষী তুমি
আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশভূমি।"

হাবুল দীর্ঘদিন অবিবাহিত ছিল। ওর মায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন সেই অবস্থায় কাটানোর পর তার বিয়ে হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রী ও হেমলতা সরকারের কনিষ্ঠা কন্যা মীরার সঙ্গে। হাবুলের বাইরের আকর্ষণ ও নানাবিধ activities-এর সঙ্গে মীরার অপ্রত্যক্ষ যোগ ছিল। আমাদের পরিবারের সঙ্গে অবশ্য সে ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। মীরা হাবুলের পরিপূরক হিসেবে যেন যাকে বলে foil হয়ে দাঁড়ায়। অন্য কোন স্ত্রী হলে হাবুলের শেষ জীবন এত সুখের হ'তে পারত না।

হাবুল চিরকালই ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত। প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত সে ছিল mobile। আমরা সমবয়সীরা ভাবতাম এইভাবেই বছরের পর বছর কাটবে কিন্তু তাকে চ'লে যেতে হ'ল। হঠাৎ। একমাত্র সান্ত্বনা যে সে কয়েক ঘন্টার বেশি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে নি। এবং অসুস্থ অবস্থায় দিনের পর দিন বাড়িতে তাকে প'ড়ে থাকতে হ'ল না। তার মতো লোকের পক্ষে সেটা হ'ত অসহনীয়।

সকল মানুষের মতো হাবুলেরও দোষগুণ ছিল। কিন্তু গুণের দিকটা এত ভারী ব'লেই আজ অসংখ্য মনে শোকের ছায়া কাটতে চায় না। আমাদের ছোটো পরিবারের কথা কীই-বা বলব—আমি বার্ধক্যে নিতান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছি। এই বেদনা অজস্র মনেও ছায়া ফেলছে। হাবুলই ব'লে গেছে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নিমতলা ঘাটের কাছে উদ্‌ভ্রান্ত সুধীন্দ্রনাথ হাবুলকে বলেছিল, "হাবুল, it is going to make a difference।" আজ আমাদের কাছেও তার সম্বন্ধে মনে হচ্ছে : it is going to make a difference.

অধ্যাপক সুশোভন সরকারের বাড়ি ২০২এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, নাকতলায় ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ তারিখে কবিতা সিংহ কর্তৃক অনুলিখিত ও লেখক কর্তৃক সংশোধিত।

পরিচয়-এর কুড়ি বছর

প্রকাশকের নিবেদন

'পরিচয়' পত্রিকার বয়স যখন পঞ্চাশের উপক্রমে, তখন বই হ'য়ে প্রকাশিত হচ্ছে 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর'। সেই সঙ্গে বিভিন্ন মৃত্যু উপলক্ষ্যে কিছু সাময়িক ও বিলম্বিত স্মৃতিও গ্রথিত হয়েছে "অন্যান্য স্মৃতিচিত্র" অংশে।

১৩৫৮ শ্রাবণ থেকে ১৩৬১ আষাঢ় পর্যন্ত 'পরিচয়' পত্রিকায় অনিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত রচনাটির শেষ ও সপ্তদশ কিস্তিতেও ধারাবাহিকতার আশ্বাস ছিলো। লেখক জীবিত থাকলে অবশ্যই তার যথাযোগ্য পরিমার্জনা ও পূর্ণতাসাধন করতেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে কোনো পরিশোধনের—এমন-কি অনুচ্ছেদ-শিরোনামে অকারণ পুনরাবৃত্তি ঘটলেও (পৃ ৮ ও ৯) অথবা কোথাও শিরোনাম কাম্য হ'লেও (চারুচন্দ্র দত্ত। পৃ ৪৮)—চেষ্টা আমরা করিনি।

ছাপার সময় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ ও শ্রীসুশোভন সরকার-সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে। বাংলা দেশে কুড়ি পেরোলেই বুড়ি; অতএব প্রবীণা পরিচয় পত্রিকা আত্মজীবনী প্রকাশ করবার অধিকার অর্জন করেছে।

এ-ক্ষেত্রে গণেশ হবার দাবি সর্বাগ্রে সম্পাদকের। কিন্তু পরিচয়-এর প্রথম সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বর্তমান সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়—এই দুই-জনের মাঝখানে সম্পাদকীয় ব্যবধান প্রায় বছরদশেক। মাঝামাঝি সময়টাতে আরো জনপাঁচেক সম্পাদকের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে। এই নানা হাত-বদলের মধ্য দিয়ে পরিচয় যদি কোন ঐতিহ্য সৃষ্টি ক'রে থাকে, তার জের টেনে চলার দায়িত্ব তাঁদের, যাঁরা আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছেন। বর্তমান লেখক ঐ-দলের একজন ব'লেই তাঁকে রাজি হতে হয়েছে এই ইতিবৃত্তের কথকতার ভার নিতে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কথক নিমিত্তমাত্র; কেননা পরিচয় পত্রিকার ইতিবৃত্ত সত্যিকারের আত্মজীবনীরই সামিল ও এই আত্মজীবনী শুধু পরিচয় পত্রিকার নয়, সমগ্র পরিচয়-গোষ্ঠীর। এই গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছিল লেখক ও অ-লেখক অনেককে নিয়ে, কিন্তু এই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয়-এর সম্পর্ক হয়েছিল একেবারে অঙ্গাঙ্গী।

অতএব যাঁর আগ্রহে ও আকর্ষণে যুগপৎ গোষ্ঠীর ও পত্রিকার উদ্ভব হয়েছিল এই আখ্যায়িকা শুরু হওয়া উচিত তাঁর কথা দিয়ে।

কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনে যে-গল্পের আরম্ভ তার আসল সূত্রপাত নূরনগরবাসী তার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পুরুষানুক্রমিক রেষারেষিতে। পরিচয়-এর ঐতিহাসিক পটভূমিতে এ-জাতীয় কোন সংঘাতের সন্ধান মেলে না, কেননা স্বয়ং যিনি অবিনাশ ঘোষালের স্রষ্টা, একমাত্র যাঁর নামে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পুরো কুল-পরিচয়, এই ইতিবৃত্তের আদিপুরুষ তিনি।

পরিচয়-এর জন্মকালে রবীন্দ্রনাথ সবে সত্তর পেরিয়েছেন, এই উপলক্ষে ঘটা ক'রে জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্‌যোগ করছেন সাহচর অমল হোম, সারা বাংলা দেশ

উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে এই উৎসবের, আর যাঁর জন্যে আয়োজন তাঁর অক্লান্ত সতেজ কলম মাসের পর মাস পুস্তকের ও পত্রিকার মাধ্যমে নতুন-নতুন সৃষ্টি উপহার দিচ্ছে বাঙালি পাঠককে। সুতরাং প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের রচনা, অন্তত সংক্ষিপ্ত একটি বাণী, বহন ক'রে পরিচয় পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলে প্রচলিত প্রথা বজায় থাকত। তা যে থাকে নি তার কারণ সুধীন দত্ত ও তাঁর সহযোগিবৃন্দ সংকল্প করেছিলেন যে সম্পাদকীয় ভিক্ষাপাত্র হাতে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হবেন না। অন্তত প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময়ে তাঁরা এই সংকল্প পালন করেছিলেন। কিন্তু তবু ইতিহাসের পরিহাসে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ অনিবার্য হয়ে পড়ল পরিচয়-এর জন্মবৃত্তান্তের একেবারে সূচনাতে।

অতঃপর কথকের উত্তমপুরুষে অধঃপতন ছাড়া এই আখ্যায়িকার অগ্রসর অসম্ভব।

আরম্ভের পূর্বে আরম্ভ

ইংরেজি ১৯২৯/৩০ সাল হবে। মাস তারিখ মনে নেই। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাবার তলব পড়ল কবির মুখে তাঁর নবতম উপন্যাস 'শেষের কবিতা' শোনার জন্যে। সেদিনকার শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অপূর্বকুমার চন্দ, তখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক।

'শেষের কবিতা'য় নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে ইংরেজি প্রেমের কবিতার ছোট-বড় একাধিক টুকরো। এইরকম একটি টুকরো পড়ার পর কবির মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি জাগল, অকস্মাৎ অপূর্ব চন্দের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "বলতে পারিস কার লেখা?" চন্দ সাহেব মাথা চুলকে জবাব দিলেন, "ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।" চোখে পড়ল অপরিচিত এক সুদর্শন যুবকের মুখে কৌতুকে-করুণায় মেশা হাসি—তার সরল অর্থ, কবিতাটিতে রচয়িতার স্বাক্ষর অতি স্পষ্ট। বুঝলাম ইংরেজি কাব্যের মাঠেঘাটে এঁর বিহার চন্দ সাহেবের চেয়েও ব্যাপক। সভা ভঙ্গ হবার পর জানলাম যুবকটি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আর দেখলাম পদার্থ-বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ চীন জাপানের পথে রওনা হলেন, পরে মার্কিন ও ইয়োরোপে যাবার সংকল্প নিয়ে। কবির যাঁরা সঙ্গ নিলেন

তাঁদের মধ্যে ছিলেন অপূর্ব চন্দ ও সুধীন দত্ত। শুনলাম চন্দ সাহেব এ-যাত্রায় কবির সেক্রেটারির কাজ করবেন—এইজন্যে সরকার থেকে তাঁর ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। সুধীন দত্তের বিদেশযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য-সংস্কার ও বোধ করি দুধের সাধ দুধে মেটানো। প্রমথ চৌধুরী মশায়ের মুখে শুনেছিলাম হীরেনবাবু নাকি তাঁকে আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন তাঁর ছেলে চিররুগ্ন হয়ে গেছে। এ-ক্ষেত্রে বিদেশে হাওয়া-বদলের ব্যবস্থা খুবই প্রশস্ত সন্দেহ নেই। পুত্রের মানসিক স্বাস্থ্যের খবর তিনি হয়তো রাখতেন না। প্রাক্-পরিচয় যুগে সুধীন দত্ত সম্বন্ধে আমিও প্রায় অজ্ঞ, কিন্তু তাঁর ঐ-যুগের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার অনুমান আশা করি সমর্থন করবেন।

বৈদেশিক বৈদ্যের কারিকুরিতে সুধীন দত্তের দেহ অচিরাৎ রোগমুক্ত হয়েছিল। সুস্থ দেহে তিনি দেশে ফিরলেন বিদেশী ছাঁচে-ঢালা মনের ওপর বিদেশী সমাজ ও সংস্কৃতির পালিশ লাগিয়ে ও মাতৃভাষাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাহিত্যসৃষ্টির সংকল্প নিয়ে। সন তারিখের হিসেব ধরলে হয়তো সুধীন দত্তের মনে এই সংকল্পের উদয় হয়েছিল দেশে ফেরার পর। কিন্তু এর মূলে ছিল নিঃসন্দেহ বিদেশী প্রভাব। ভারতবর্ষের আরো বহু যুবকের মতন সুধীন দত্তও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন স্বর্গলব্ধ মন্দার-মালিকার সুরভি স্মৃতি বহন ক'রে। এই স্মৃতি মলিন হয়ে এলেও তাঁর মননশীল চিত্তে বিদেশিনী সরস্বতীর (বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বারোয়ারি সরস্বতী নয়) জ্যোতির্ময় টীকা ছিল অনির্বাণ, তারপর একদিন তা দেদীপ্যমান হয়ে উঠল পরিচয় পত্রিকার পাতায়।

পরিকল্পনা

সরল ভাষায় বলা যেতে পারে, বিদেশ ঘুরে আসার কিছুদিন পরে সুধীন দত্তের বাসনা হ'ল একটি পত্রিকা প্রকাশ করার। মননশীল হলেও সুধীন দত্ত কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জিত নন, তাই এ-কথা তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন যে একক চেষ্টায় স্বর্গ লুণ্ঠন ক'রে মন্দার-মালিকার আহরণ সম্ভব হলেও, প্রমাণ-সই একটি পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ লোকবল ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু সেইসময়ে লোকবল বলতে সুধীন দত্তের ছিলেন শুধু বন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্য—সুধীন দত্তের মতনই স্বর্গলব্ধ মন্দার-মালিকার স্মৃতি-সৌরভে আকুল, আক্ষরিক ও আলংকারিক উভয় অর্থে। কেননা, পৌরাণিক মন্দারের আধুনিক সংস্করণ সুগন্ধি প্রসাধনী তৈরি করার খাস ফরাসি কৌশল শেখার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে

তিনি সুধীন দত্তের কয়েক বছর আগে বিদেশ ঘুরে এসেছিলেন — সুধীন দত্তের মতনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক জাহাজে যাত্রা ক'রে। পরিচয়-গোষ্ঠীতে বহুকাল এই জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে বিদেশের স্বর্গবাসান্তে দেশে ফেরার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিজাবাবুর আর-একবার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তখন কবি ওঁর আচরণ লক্ষ ক'রে বলেছিলেন, "চোখের জল ফেলতে-ফেলতে দেশ ছেড়ে এসেছিলে, আবার দেখি সেই চোখের জল ফেলতে-ফেলতে দেশে ফিরছ।"

এইধরনের কথাবার্তা কবির মুখে অনেকেই শুনেছে। গিরিজাবাবুর সমবয়সী আর-একটি যুবক প্রবাসের মায়াজালে এমনি জড়িত হয়েছিলেন যে আত্মীয়স্বজন শত চেষ্টাতেও তাঁকে ঘরমুখো করতে না-পেরে শেষকালে নিরুপায় হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার বরাত দিয়েছিলেন কবির উপর। কবি নাকি তাতে বলেছিলেন, "উর্বশীর কাজ কি আর দুর্বাশা মুনিকে দিয়ে হয়?" অবশ্য এ-সব কথা সত্যি কিনা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি না, কেননা, কাকে লক্ষ ক'রে কবি কখন কী বলেছিলেন তার হিসেবনিকেশ আমি কি ক'রে রাখব? কিন্তু এ-কথা নিশ্চিত জানি যে পরিচয়-প্রকাশের দুঃসাহসিক কাজে সুধীন দত্ত নামেন একরকম তাঁরই ভরসায়। ভরসার অতিরিক্ত গিরিজাবাবু দিয়েছিলেন পত্রিকা চালানোর উপযোগী লোকবল সংগ্রহ ক'রে ও এই লোকবলের বলিষ্ঠতম লোক ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। সত্যেন বোসের মুখে নীরেন রায়ের নাম আগেই সুধীন দত্তের কানে পৌঁচেছিল ও ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল পত্রিকার কাজে তাঁকে পাওয়া বিশেষ দরকার। তারপর যথাসময়ে গিরিজাবাবুকে তিনি বায়না দিলেন সশরীর নীরেন রায়কে হাজির করতে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আজ বাংলা দেশে সত্যেন বোসের নাম কে না-জানে? কিন্তু বিশ বছর আগে তিনি এত সুপরিচিত ছিলেন না। কলকাতা সায়েন্স কলেজে কিছুদিন ছেলে পড়ানোর পর তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন সেখানকার নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রীডার হয়ে। দেখতে-দেখতে সেখানে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল বিভাগ থেকে বিভাগে, কেননা বিজ্ঞান-সংক্রান্ত যে-কোন বিষয়ে ছাত্র বা অধ্যাপকদের যা-কিছু প্রশ্ন মনে আসত তার সমাধান করতে সত্যেন

বোসের জুড়ি আর-কেউ ছিল না। ঢাকায় থাকার সময়ে তিনি সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কিছু গবেষণা করেছিলেন, তার ফলে তাঁর নাম আইনস্টাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ইয়োরোপ-আমেরিকার বৈজ্ঞানিক মহলে।

কিন্তু শুধু এইটুকু জানলে সত্যেন বোস সম্বন্ধে কিছুই প্রায় বলা হয় না। তাঁর যথার্থ পরিচয় দিতে গেলে মনে পড়ে যে-সব বিরাট বরফের চাপ সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় তাদের কথা। এগুলির দশভাগের একভাগ থাকে জলের ওপর, বাকি ন'ভাগ নিচে। সেইরকম বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোসের যেটুকু সাধারণের চোখে পড়ে সেটুকু তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের সামান্য অংশ মাত্র। গোটা মানুষটির পুরো খবর জানে শুধু অন্তরঙ্গ বন্ধুরা। তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন যে সত্যেন বোসের জন্ম সহজাত মনীষা ও দরদী মন নিয়ে। হয়তো তাঁর উচিত ছিল সব-কিছু ছেড়ে গবেষণার গভীর জলে অকল্পিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান। যথেষ্ট সম্বল না-নিয়ে এইজাতীয় দুঃসাহসিক সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে যারা হাবুডুবু খায় তাদের অনেককে তিনি টেনে তুলেছেন প্রমাণগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের শক্ত ডাঙায়। কিন্তু তাঁর কোষ্ঠিতে লেখা ছিল না বিজ্ঞান অনুশীলনের বদ্ধ কুঠুরিতে আটকে থাকা, তাই জীবনের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছেন আড্ডা থেকে আড্ডায়, দিনের পর দিন, সকাল থেকে রাত, মানুষের প্রবল টানে আর সাহিত্য-শিল্প-সংগীতচর্চার দুর্নিবার আবেগে।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

সবুজপত্রের যুগে বীরবলের বৈঠকখানায় সত্যেন বোসের যাতায়াত ছিল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হারীতকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির সঙ্গে। ঐ-বৈঠকখানায় সাহিত্যিক আড্ডায় যাঁদের হাতে-খড়ি হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন বোসের সাকরেদ নীরেন রায়। তখন তিনি কলেজের ছাত্র, কিন্তু সত্যেন বোসের মতন সদ্গুরুর সদ্গুণে তাঁর ঐ-বয়সেই সুযোগ ঘটেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দুর্গম মহলে অবাধ আনাগোনার।

কলেজের জীবন যতই মধুর হোক, মেধাবী ছাত্রের পক্ষে এর মেয়াদ বড়ই অল্প। নীরেন রায়ের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। একটির পর একটি ডিগ্রির দেউড়ি পেরিয়ে তিনি যৌবন পেরোবার আগেই বহাল হলেন অধ্যাপকের আসনে ও কোমর বেঁধে লাগলেন পরীক্ষা-পাস-প্রয়াসী পারসেন্টেজ-প্রার্থী ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ ও সৌন্দর্যের বিস্তারিত

ব্যাপারে। এইভাবে একযুগ কাটার পর গিরিজাবাবুর দৌত্যে তাঁর ডাক পড়ল সুধীন দত্তের দরবারে। পেশার চাপে সাহিত্যিক নেশার ঘোর তখনো তাঁর কাটে নি, আর কোনর বাঁধার অভ্যাস তো তাঁর জন্মগত। ফলে দেখতে-দেখতে জমে উঠল পরিচয়-এর উদ্যোগ পর্ব।

পরিচয়-এর নেপথ্যবিধানের খুঁটিনাটি খবর যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তার বেশিরভাগ গিরিজাবাবুর মুখ থেকে শোনা। সুতরাং পাঠকদের সুখবরদের জন্যে তাঁর মুখে এবার এই কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দেওয়া অসংগত হবে না।

সোসিয়েতে এঁ্যাদো-ল্যাতাঁ

গিরিজাবাবু শ্রাবণ সংখ্যার পরিচয় প'ড়ে বললেন, "যা লিখেছ তাতে তেমন ত্রুটি কিছু ঘটেছে মনে হয় না। সুধীন দত্তের সঙ্গে নীরেন রায়ের যোগাযোগ ঘটনের ঘটক ছিলাম আমি, আর এই যোগাযোগ না-হলে পরিচয় বের করা কঠিন হ'ত সন্দেহ নেই। কিন্তু নীরেন রায়ের সঙ্গে আরো দু'চারজনকে আমি জুটিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁদের সবিশেষ পরিচয় দেবার আগে সোসিয়েতে এঁ্যাদো-ল্যাতাঁর কথা একটু বলা প্রয়োজন।" সোসিয়েতে এঁ্যাদো-ল্যাতাঁর নাম শুনে ঘাবড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সে আবার কী ব্যাপার?" গিরিজাবাবু বললেন, "ভয় পাবার কিছু নেই। ইংরেজিতে যাকে বলে সোসাইটি ইন্দো-ল্যাটিন। এ-ক্ষেত্রে 'ল্যাটিন' মানে নিছক 'ফ্রেঞ্চ'। ফ্রান্স-এ গিয়ে প্রসাধনী প্রস্তুতির প্রকরণ আয়ত্ত ক'রে আমি দেশে ফিরেছিলাম এ-কথা তুমি লিখেছ। ফরাসি দেশ সত্যি বড় মজার দেশ। কিছুকাল সেখানে কাটালে মনে মৌতাত ধরে। এই মৌতাত জীইয়ে রাখার উদ্দেশে জনকয়েক ফ্রান্স-ফেরত পণ্ডিত মিলে এই সমিতিটি স্থাপন করেছিলেন—তাঁদের দলে একমাত্র অপণ্ডিত ছিলাম বোধহয় আমি, আমাদের পালের গোদা ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর ফরাসি সংস্কৃতি-প্রীতির কথা কে না-জানে?

"অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী। দু'জনেই ফরাসি দেশ থেকে উচ্চস্তরের গবেষণা-লব্ধ 'ডক্টর' ডিগ্রি সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন। সুবোধবাবু কিছুকাল অধ্যাপনার পর অডিট সার্ভিসের পরীক্ষায় পাস ক'রে মোটা মাইনের সরকারি চাকরিতে বহাল হয়েছিলেন। কিন্তু জীবিকা অর্জনের চেয়ে জ্ঞানার্জনের টান ছিল তাঁর অনেক প্রবল, তাই চাকরি থেকে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে তিনি ফ্রান্স-এ যান রসগ্রাহী ফরাসি

পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন ভারতীয় রসতত্ত্বের নবতম আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। প্রবোধ বাগচীকে তো তুমি ভালো ক'রেই জান।" আমি বললাম, "হ্যাঁ। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়ে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন প্রবোধ বাগচী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ও পরে চীন দেশ ঘুরে ফ্রান্স-এ গিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনার পর তিনি কিছুকাল হ'ল বিশ্বভারতীর গবেষণা বিভাগের ভার নিয়েছেন ও এই কাজের সূত্রে চীন দেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ আবার জ'মে উঠেছে।"

গিরিজাবাবু বললেন, "আমি যখনকার কথা বলছি তখন প্রবোধবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পদিন হ'ল অধ্যাপনা শুরু করেছেন। আমাদের ঐ-সমিতিটির অধিবেশন হ'ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই বাড়িতে। সত্যেন বোস ও নীরেনও এই দলে ছিল। নীরেন চিরকালই নেশাখোর; আমাদের নেশা জমাতে যেতে হয়েছিল ও-পারে, নীরেন কিন্তু কালাপানির এ-পারে ব'সেই শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে ফরাসি মৌতাতে একেবারে মশগুল হয়ে গিয়েছিল।" আমি বললাম, "মনে পড়ছে আনাতোল ফ্রাঁস মারা যাবার পর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ স্মৃতিসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব বলেছিলেন, 'Bengali students have a peculiar fondness for things French.' এর সরল অর্থ এই যে ফরাসি দেশের নামে বাঙালি ছাত্রেরা মূর্ছা যায়। অধ্যাপকরাই যদি পথ দেখান তাহলে ছাত্রদের আর কী দোষ? সুধীন দত্ত তো ফরাসি সাহিত্য প্রভূত অধ্যয়ন করেছেন—তিনিও কি ফরাসি দেশের নামে মূর্ছা ও পতনের পালায় আপনাদের সঙ্গী ছিলেন?"

"তাঁকে ওই সমিতির অধিবেশনে কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। তোমার মনে থাকতে পারে মাঝে-মাঝে পরিচয়-এর আড্ডায় রীতিমতো ফ্রাঙ্কো-জার্মান লড়াই বেধে যেত। যখনই প্রবোধ বাগচী ফ্রেঞ্চ কাল্‌চার বা স্কলারশিপ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন, সুধীনবাবু অমনি কড়া পাল্টা জবাব দিতেন জর্মানদের পক্ষ ধ'রে।"

"খুবই মনে আছে। কিন্তু এ-ও মনে পড়ে যে আধুনিক ফরাসি লেখকদের মধ্যে ভালেরি ও জিদ—এই দু'জনের কথা উঠলে সুধীন প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠত। পরিচয়-এর পাতায় তার সাক্ষ্য আছে। যাই হোক, আপনাদের ঐ-

এ্যাদো-ল্যাতাঁ কারবার আর আমাদের পরিচয়, এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্রটা কী তা বুঝলাম না।"

পরিচালকমণ্ডলী

গিরিজাবাবু বললেন, "তাহলে গোড়া থেকেই বলি।

"ড্যালহাউসি স্কোয়ারের পূর্বদিকে স্টিফেন্ হাউস ব'লে যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে তার দু'তলার দিকে তাকালে একসময় দেখা যেত দুটো মস্ত সাইনবোর্ড জ্বলজ্বল করছে: একটিতে লেখা 'এ্যাডেয়ার ডাট অ্যাণ্ড কম্পানি', আর-একটিতে 'দি লাইট অফ এশিয়া ইনসিওরেন্স কম্পানি'। ফ্রান্স থেকে ফিরে কিছুকাল সৌখীন প্রসাধনীর ব্যবসা করেছিলাম। কিন্তু ব্যবসাটাও বিশেষ সৌখীন হয়ে পড়াতে অবশেষে এ্যাডেয়ার ডাট-এ আশ্রয় নিতে হয়েছিল চাকরির উদ্দেশে। প্রায় পাশের ঘরেই ছিল 'লাইট অফ এশিয়া'র অফিস, তার সেক্রেটারি ছিলেন সুধীনবাবু। এই বীমা কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা তাঁর মামা রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক। স্বদেশীযুগে তিনি দেশজোড়া নাম কিনেছিলেন স্বদেশপ্রেমের বানে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলছি) তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মোটা অংশ ভাসিয়ে দিয়ে। এ্যাডেয়ার ডাট অর্থাৎ এ্যাডেয়ার ও দত্ত—নামেই পরিচয় যে প্রতিষ্ঠানটি আধা দেশী আধা বিদেশী: এদের কারবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে। এই সূত্রেই সুধীনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ জমে। তাঁর শখ ছিল ক্যামেরা কফি-পারকোলেটর্ প্রভৃতি সৌখীন যন্ত্রের আর এই বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণাদাতা হয়ে উঠেছিলাম আমি। ফলে তাঁর বাড়িতে যাতায়াত, সাহিত্যচর্চা, তাঁর অপ্রকাশিত কবিতা পাঠ ও তা ছাপাবার পরামর্শ ও অবশেষে পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প—এই হ'ল আমার সঙ্গে পরিচয়ের যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

"যখন নতুন পত্রিকা-প্রকাশের জল্পনা-কল্পনা বেশ জোর চলছে তখন সুধীনবাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই দেখা যেত তাঁর মেসোমশায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্তকে। তিনি তখন যাকে বলে 'অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ন'। বোম্বাই প্রদেশে কর্মজীবন কাটিয়ে তিনি কলকাতায় এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। এঁর যথাযথ পরিচয় আশা করি তুমি যথাসময়ে দেবে। আপাতত এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে চারুবাবুর উৎসাহ না-পেলে আমরা হয়তো এগোতে ভরসা পেতাম না।

"মোট কথা, কাগজ বের করার সিদ্ধান্ত একেবারে পাকাপাকি হয়ে গেলে চারুবাবু আমাকে বললেন, 'ম্যানেজারির ভার নিতে হবে আপনাকে।' আমি অমনি লেগে গেলাম আড়কাঠির কাজে অর্থাৎ লোকবল সংগ্রহে। নীরেনকে তো জানি ছেলেবেলা থেকে, তাছাড়া সোসিয়েতে এ্যাদো-ল্যাতাঁর থেকে জুটিয়ে আনলাম আমার প্রবাসের দুই বন্ধু সুবোধ মুখুজ্যে ও প্রবোধ বাগচীকে। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে যদি পরিচয়-এর কোন স্থান থাকে তাহলে সেই সূত্রে সোসিয়েতে এ্যাদো-ল্যাতাঁর নামও ছাপার অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় ওঠা অসংগত হবে না।"

"নিশ্চয়ই না। আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা—প্রাচীন ভারতের এই উদার বাণী আমরা বার-বার শুনেছি রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠে। পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় প্রথম রচনার ভাষা ভিন্ন হলেও তার মর্ম ঐ এক। সেকালের ভারতবর্ষ বা একালের ফ্রান্স বা চীন—পরিচয় উন্মুখ হয়ে গ্রহণ করেছে সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ দানকে। এই হ'ল তার ঐতিহ্য। অতএব আজ পরিচয়-এর ইতিহাস-রচয়িতা হিসাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাদের সোসিয়েতে এ্যাদো-ল্যাতাঁকে। ঐ-সমিতিটি ছিল ব'লেই অত সহজে আমরা পেয়েছিলাম সুবোধ মুখুজ্যে ও বিশেষ ক'রে প্রবোধ বাগচীকে—ভারতবর্ষ, ফ্রান্স ও চীন এই তিন দেশের সংস্কৃতির ত্রিধারায় অবগাহন ক'রে যিনি পুণ্য সঞ্চয় করেছেন।"

গিরিজাবাবু বললেন, "মনে রেখো পুণ্য সঞ্চয় যত সহজ, বিতরণ করা ততটা নয়। এই বিতরণের বাহন হিসাবেই পরিচয়-এর সার্থকতা।"

"তা জানি। সঞ্চয়ীর ভাণ্ডার জনসাধারণের ভোগে নিয়োগ করার তাগিদে পরিচয় প্রগতির পথে এগিয়ে চলবে এই আমার বিশ্বাস। এই শুভ-যাত্রার শুরুতে পরিচয়-এর যাঁরা পরিচালক ছিলেন তাঁরা আজ স্মরণীয়।"

পরিচালকমণ্ডলী

গিরিজাবাবু বললেন, "অবশ্য। অতএব আমার ভাণ্ডারে যা-তথ্য আছে তা উজাড় ক'রে দিই—শোনো।"

"নীরেনকে এনে জুড়ে দিলাম সুধীনবাবুর সঙ্গে সম্পাদকীয় জোয়ালে। কাজের ছেলে বটে। ছুটোছুটি, লেখালেখি, প্রুফ সংশোধন, সমালোচনার জন্যে পুস্তক-সংহরণ বা বলতে পারো দরকার হলে এখান-ওখান থেকে হরণ—সব কাজেই সে সমান দড়। সুধীনবাবুর প্রধান সমস্যার সমাধান হ'ল, আর

আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম নীরেনকে আমার আড়কাঠির কাজের সাবক ট্রাক্ট দিয়ে।

"তারপর ঠিক হ'ল একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করতে হবে ও এই মণ্ডলীর কাজ হবে কাগজটির আকৃতি-প্রকৃতি নির্ধারণ ও বিশেষভাবে ছাপার জন্যে লেখা নির্বাচন। আরো ঠিক হ'ল সম্পাদকমণ্ডলীর নিয়মিত অধিবেশন হবে সপ্তাহের নির্দিষ্ট এক দিনে। ক্রমে এই অধিবেশনই পরিণত হ'ল পরিচয়-গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠকে।"

"পরিচালকমণ্ডলীতে কে-কে ছিলেন আপনার কি মনে আছে? আমার মনে পড়ে ছোট্ট একটি বিজ্ঞপ্তিপত্রে ওঁদের নাম ছাপা হয়েছিল। কিন্তু আজ কোথাও তার খোঁজ পাচ্ছি না। সুধীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তারও ঠিক মনে নেই।"

গৃহিণীর সাথে পরামর্শ ক'রে গিরিজাবাবু আমাকে জানালেন, "সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন চারু দত্ত, সত্যেন বোস, সুবোধ মুখুজ্যে, প্রবোধ বাগচী, ধূর্জটি মুখুজ্যে, নীরেন রায়, সুধীন দত্ত ও আমি — যতদূর মনে পড়ে এই আটজন। বলতে পারো অষ্টদিক্‌পাল বা অষ্টদিগ্‌গজ।"

আমি বললাম, "পরিচয়-এর ভাবনা ও রচনাতে যদি অনেকে অষ্টাবক্রত্ব আরোপ ক'রে থাকে তা খুব অকারণ নয়।"

আমার কথায় কান না-দিয়ে গিরিজাবাবু বললেন, "ধূর্জটি আমার বাল্যবন্ধু। তাকেও জুটিয়ে দিয়েছিলাম আমি। আমাদের দলে একমাত্র সেই ছিল প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক। বাদ-বাকি সকলেরই হাতে-খড়ি হয় পরিচয়-এ। পরিচয়-এর লেখকগোষ্ঠীর আরো অনেকের সম্বন্ধে এ-কথা খাটে।

"লক্ষ্ণৌ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটিতে ধূর্জটি ও সত্যেন দু'জনেই তখন কলকাতায় থাকাতে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। এদের দু'জনেরই লেখা বেরিয়েছিল প্রথম সংখ্যায়। ধূর্জটি লিখেছিল 'প্রেমপত্র' ব'লে একটি গল্প। চাইবার আগেই তার লেখা পাওয়া যায়; পত্রিকা-সম্পাদকের কাছে এর চাইতে বড় গুণ আর কি হতে পারে?

"মুস্কিল হয়েছিল সত্যেনকে নিয়ে। আমাদের জেদ চেপেছিল প্রথম সংখ্যায় আর-একটি প্রবন্ধ ছাপাতেই হবে। সাধ্যসাধনায় যখন সিদ্ধিলাভ হ'ল না, তখন বাধ্য হয়ে প্রয়োগ করতে হ'ল বিশুদ্ধ ফ্যাসিস্ট রীতি। বাইরে থেকে শিকল দিয়ে ঘর বন্ধ ক'রে তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল প্রবন্ধ লেখা না-হলে

অব্যাহতি নেই। সত্যেন জাত বৈজ্ঞানিক। সমূহ ব্যক্তিগত সংকটের চাপে তার মাথা থেকে বেরোল 'বিজ্ঞানের সংকট' নামে নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধ। পরিচয়-এ ঐ ওর প্রথম ও শেষ লেখা। কলকাতায় এলেই পরিচয়-এর আড্ডায় আসতে সত্যেনের কখনো কসুর হয় নি। কিন্তু ওর কাছে দ্বিতীয় প্রবন্ধ আদায় করার শক্তি আমাদের ছিল না।

"আমার কথা এখানেই ফুরোল, আর এর পর পরিচয় বেরোল। আশা করি অন্তত প্রথম সংখ্যার বিবরণ তুমি ফলাও ক'রে লিখবে। একটা কথা মনে রেখো — 'পরিচয়' নামটি দেওয়া নীরেনের। এই নামকরণের বিশদ ব্যাখ্যা সে নিজেই করেছে প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনায়। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ তাকে করতে হয়েছে কিন্তু আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা — এই বাণীর প্রেরণায় তার কলম বিচলিত হয়েছিল কিনা বলতে পারি না।

"আর-একটি দুঃখের কথা না-ব'লে পারছি না। মলাটের উপর বহুদিন ধ'রে পরিচয়-এর নাম ছাপা হ'ত যে-বর্ণলিপিতে তা আমারই হাতের রচনা। অনেক মেহনত ক'রে লেখা। আমারই হাতের টিপ প'রে পরিচয়-এর আবির্ভাব হয়েছিল এ-কথা ভুলতে পারি না। কী দোষে জানি না ঐ-টিপ আজ বরখাস্ত হয়েছে।"

আমি বললাম, "কপালদোষে। কর্তৃপক্ষকে জানাব। আপাতত যদি কোন তথ্য বাদ প'ড়ে থাকে এই বেলা জানিয়ে দিন, নইলে ইতিহাসের হিসাবে ঘাটতি পড়বে।"

গিরিজাবাবু বললেন, "প্রথম সংখ্যায় আমার একটি সমালোচনাও ছাপা হয়েছিল। সেটি লেখার পরই আমি ঘায়েল হলাম ছুঁচোর কামড়ে। তারপর দীর্ঘকাল ভুগে-ভুগে যখন প্রায় অন্তিম অবস্থায় পৌঁচেছি তখন আমার দাদা ডাক্তার ও সাহিত্যিক পশুপতি ভট্টাচার্য — প্রথম সংখ্যায় তাঁর লেখা একটি সমালোচনা বেরিয়েছিল — অনেক পুঁথি ঘেঁটে আবিষ্কার করলেন ছুঁচোর বিষের প্রতিষেধক। তাই কোনরকমে সে-যাত্রা রক্ষা পেলাম। কিন্তু সে আর-এক কাহিনী, তার যোগ্য বাহন পরিচয় নয় — সত্যেনের 'জ্ঞানবিজ্ঞান' পত্রিকা।"

আমি না-ব'লে পারলাম না, "সুরভি সৃষ্টিতে আপনি একসময়ে ছুঁচোদের প্রতিযোগিতা করেছিলেন ব'লে আপনার ওপর তাদের আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক। ব্যাপারটা লেখার মতন বটে। বাইরে করলেন মলাটের পত্তন

নিপুণ হাতের সাজসজ্জায়, আর ভিতরে নেপথ্যবিধান সাঙ্গ হবার আগেই দিলেন
রণে ভঙ্গ ছুঁচোর কীর্তনে না হোক কর্তনে অর্ধকুম্ভ (hors de combat)
হয়ে। আপনি ফরাসিবিৎ, তাই একটু ফরাসি বুলি প্রয়োগ করলাম। ও-
ভাষার উচ্চারণ আমার জিভে গড়ায় না। আপনি অভ্যস্ত রসনায় তা সংশোধন
ক'রে নেবেন।"

"বাংলা দেশে ছুঁচোর অভাব নেই, তালকানা সাহিত্যিকের সংখ্যাও কম
নয়। সুতরাং ছুঁচোর বিষের প্রক্রিয়া ও প্রতিষেধক সম্বন্ধে বাংলা ভাষায়
গবেষণামূলক আলোচনা হওয়া দরকার, আর এই আলোচনার যোগ্যতম বাহন
হবে পরিচয় নয়, জ্ঞানবিজ্ঞান পত্রিকা, তাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু বাংলা দেশ
যেন এ-কথা না-ভোলে যে, জ্ঞানবিজ্ঞান পত্রিকা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের
মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলন ও প্রচারে যিনি আজ পথনায়ক সেই
সত্যেন বোস বাঙালি পাঠকদের জন্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব প্রথম
পরিবেশন করেছিলেন পরিচয়-এর পাতায়।"

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি যেই আঁকুক সে শুধু ছবিই আঁকে ; আর ছবি
যে কখনো যথাযথ হয় না, স্বয়ং ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথ তা প্রচার করেছেন।
অতএব এই ইতিকথায় মাঝে-মাঝে ভুলচুক হলে আশা করি পাঠকেরা তার
জন্যে কথকের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন না। কথকের বিবেক এ-কথা
বলে যে, এইজাতীয় ইতিকথায় যাথার্থ্য সম্ভব না-হলেও বাঞ্ছনীয়। সুতরাং
সুযোগ পেলেই নিজের ভুল কবুল করতে তিনি প্রস্তুত।

খুলে বলি, এর আগের লেখায় গিরিজাবাবুর মুখের কথায় প্রকাশ পেয়েছে
সত্যেন বোসকে ধ'রে-বেঁধে পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যার জন্য যে-প্রবন্ধ লেখানো
হয়েছিল, পরিচয়-এ ঐ তাঁর প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ। পুরনো পরিচয়-এর পাতা
ওল্টাতে-ওল্টাতে চোখে পড়ল সত্যেন বোসের লেখা আর-একটি প্রবন্ধ :
বিষয়টি তাঁরই উপযুক্ত – 'আইনস্টাইন'।

কিন্তু সে অনেকদিন পরের কথা। আপাতত প্রথম সংখ্যার পরিচয়-এর
আবির্ভাব আর বিলম্বিত হলে পাঠকদের আসরে উদ্যোগপর্বেই হয়তো ভাঙন
ধরবে। গিরিজাবাবু বলেছিলেন প্রথম সংখ্যার কথা একটু ফলাও ক'রে লিখতে,
এবার সেই চেষ্টা করা যাক।

পরিচালকমণ্ডলী – বা প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক তাঁর একক বিবেচনায় – এই সার
কথা বুঝেছিলেন যে বাংলা দেশের মতন দেশে সংবৎসরে চারবারের বেশি যে-
পত্রিকা ছাপা হয়, কুলের ও শীলের অর্থাৎ বহরের ও বক্তব্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন
রেখে সে-পত্রিকাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। পরিচয়-কে যে সত্যি-
কারের মর্যাদাবান পত্রিকা করতে হবে এ-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল না; অতএব
স্থির হয়েছিল যে পরিচয় হবে ত্রৈমাসিক।

বাংলা ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে এই ত্রৈমাসিকের অভ্যুদয় ঘটেছিল।
ঘটনাটি পৌরাণিক নয়, ঐতিহাসিক। তাই দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেন নি।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলেন উদার হস্তে, তার প্রমাণ
পাওয়া যায় দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই। আর স্বর্গে দুন্দুভিনাদের বদলে এখনকার
প্রথা হ'ল নিজের ঢাক নিজে পিটানো। নীরেন রায়ের কথাবার্তায় পরিচালক-
মণ্ডলী বুঝে নিয়েছিলেন যে তিনি জবরদস্ত ঢাকি, অতএব জবরদস্তভাবে
ঢাক পিটানোর ভার দেওয়া হ'ল তাঁর ওপর। সাবেগ ও সজোর কলরবে নীরেন
রায় ঘোষণা করলেন :

"সভ্যতাবৃদ্ধির অনুপাতে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় কি-না, এ-প্রশ্ন আজিও
তর্কাধীন, কিন্তু জটিলতা যে বাড়ে সে-বিষয়ে পণ্ডিতেরাও একমত। পাণ্ডিত্য
বাদ দিয়াও দেখা যায়, এক পরিচয়-প্রথাই সভ্যসমাজে কত রকম ছোট-বড়
জটিলতার সৃষ্টি করে।... পরিচয়ের অভাবে এক-গাড়ী লোক পরস্পরের দৃষ্টি
এড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে চলিয়াছে – এ দৃশ্য এ দেশেও নিতান্ত বিরল নয়।

"কিন্তু সভ্যতার আদবকায়দার কড়াকড়ি সত্ত্বেও মানুষের আদিম পরিচয়-
স্পৃহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না।... সঙ্গলোভী মানুষ অন্যের সংস্পর্শ পাইয়া
নিজেকে সম্পূর্ণতর বোধ করে।

"এই সঙ্গলোভই মানুষকে দিয়া সমাজ গড়ায়, শিল্প রচায়, সাহিত্যসৃষ্টি
করায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের স্মৃতি-সভার অভিভাষণে
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনে হয়, সাহিত্য কথাটার মূলে আছে
'সহিত'।[১] যে-মানুষ কাহারও সহিত বাস করে না, সাহিত্যসৃষ্টির কোনো

১ রবীন্দ্রনাথ এই সভার বহু পূর্বে প্রকাশিত তাঁর সাহিত্য বইয়ের গোড়াতেই এ-কথা
বলেছিলেন।

তাগিদ সে অনুভব করে কি-না সন্দেহ। সাহিত্যের বাহন যে ভাষা, তাহা সমূহের সৃষ্টি। একা-মানুষের ভাষার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়। হয়ত এমন জ্ঞান আছে যাহা একান্ত নির্জ্জন সাধনাসাপেক্ষ ;... কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ সে-জ্ঞানের সাধক নয়। নিজেকে জানিবার, নিজের পরিচয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম তীব্র নয় ; সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, এই আত্মপরিচয় লাভই তাহার উদ্দেশ্য ;...তাই সে অপরের সান্নিধ্য চায়, তাই সে সাহিত্য চায়। কারণ, সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে-পরিচয়, তাহা চাক্ষুষ পরিচয়ের চেয়েও প্রত্যক্ষ। দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সাহিত্যজগতেই সমধর্ম্মী মন পরস্পরের সহিত করকম্পন[১] করে,... এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ – ভাষা-সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগসঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন-পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণ-চিত্ততার বক্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ।"

ভাবগঙ্গা

এই ভাবাবেগের পর তাল সামলে নীরেন পরিচয়-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা লিখেছিল তার সারমর্ম যে আয়ত্ত সর্বতঃ স্বাহা তা আগেই লিখেছি। সম্পূর্ণ স্বকীয় ভাষাতে নীরেন বলেছিল :

"প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী,... এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে।... 'পরিচয়' জানে যে তার সাধ যত, সাধ্য তার বহু পশ্চাতে। কিন্তু তাহার একান্ত বিশ্বাস, তাহার এই স্বীকৃত অক্ষমতাই দেশের সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে,... এই বিশ্বাসই তাহার দুরারোহিণী আশার মূলে জলসেচন করিয়া আজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছে। এখন ইহাকে লালনের ভার পড়িল তাঁহাদের উপর – বাংলা ভাষার অতীতকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, বর্ত্তমানকে দরদ দিয়া দেখেন ও ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশ্বাস অকুণ্ঠ।"

১ প্রচলিত 'করমর্দন' শব্দের বদলে 'করকম্পন' শব্দটি শুধু অভিনব নয়, ব্যাকরণবিরোধী, তা পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন।

"পরিচয়" নামের তকমা আঁটা শিরোপার নিচে ছাপা এই রচনাটিতে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না। কেননা, এটি প্রকাশ করা হয়েছিল নিছক সম্পাদকীয় মুখবন্ধ হিসাবে। লেখক নীরেন রায়ের নাম সম্পাদক হিসাবে মলাটে ছাপা না-হলেও, পরিচয়-এর প্রারম্ভিকযুগে সুধীনের ও নীরেনের আত্মিক অভিন্নতার নিদর্শন ভাবগঙ্গার এই অবতরণিকা। এই অভিন্নতা খুব বেশিদিন টেকে নি। কেননা যে নীরেন রায় একদিন দেশের সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এইজাতীয় ইস্তাহার জাহির করেছিলেন নির্দ্বন্দ্ব উল্লাসে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রভাব তাঁকে ক্রমশ টেনে নিয়ে গেছে ঐ-সুধীবৃন্দের থেকে দূরে।

অবশ্য সুধীবৃন্দেরও অনেকেরই মনে ঐ একই প্রভাবে রূপান্তর ঘটেছে ; কী-ভাবে ঘটেছে তার বিবরণ আশা করি এই ইতিহাসের মধ্যে খানিকটা ফুটবে। না-ফুটলে এর সার্থকতা কোথায় ? কিন্তু এখনকার মতন এই কথা মনে রাখা দরকার যে পরিচয় আত্মপ্রকাশ করেছিল উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের মুখ তাকিয়ে ও এই মধ্যবিত্ত তাঁদেরই সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী যাঁরা একদিন রাজনৈতিক চৈতন্যে দীক্ষা পেয়েছিলেন গোলদিঘিতে সুরেন বাঁড়ুজ্যের ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে।

এখন আর গোলদিঘিতে কুলায় না। কথায়-কথায় যেতে হয় গড়ের মাঠে মিছিল ক'রে শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক চৈতন্যের ব্যাপক প্রেরণায়। যখন গোলদিঘি ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র, কে ভাবত তখন সামাজিক চৈতন্যের কথা ? পরে ভাবতে হয়েছে, ও এই ভাবনার ছাপ পড়েছে পরিচয়-এ প্রায় গোড়ার থেকে। কিন্তু তখন এই ভাবনা ছিল শুধু বুদ্ধির বিলাস, অর্থাৎ নীরেন রায়ের ভাষায় 'ভাবগঙ্গার ধারা'।

অবশ্য পরিচয়-এর আবির্ভাবের এক শতাব্দীরও বেশি আগে বাংলা দেশে এই ভাবগঙ্গার আবির্ভাব হয়েছিল প্রধানত রামমোহন রায়ের কল্যাণে। পরিচয় যদি এ-ক্ষেত্রে ভগীরথবৃত্তি পালনের দাবি ক'রে থাকে তা শুধু ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারসূত্রে – বঙ্গদর্শন, সাধনা, ভারতীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে।

সুধীনের মুখে নীরেনের এই রচনাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি বার-বার, অতএব ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, এতে তার সম্পূর্ণ সায় ছিল। অথচ 'কাব্যের মুক্তি' নামে সুধীনের যে-প্রবন্ধ ঐ প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল তা একেবারে ভিন্ন সুরে বাঁধা। সুদূর অতীতের দিকে ফিরে সুধীন প্রবন্ধটির গোড়াপত্তন করেছিল "কাব্য অনাদি" এই আপ্তবাক্য উচ্চারণ ক'রে। ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ছেলেবেলা থেকে এই কথা শুনেছি, আর সংস্কৃত আলংকারিকদের রচনায় পড়েছি কাব্যের সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা। কিন্তু কাব্যের মুক্তির লেখক এই অনাদিত্বের যে-ব্যাখ্যা করেছেন তা আলংকারিক বা আধ্যাত্মিক নয়, ঐতিহাসিক। কেননা,

"অনাদি-শব্দটা যদি আমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে পীড়া দেয়, তাহ'লে বলা যেতে পারে যে আদিম মানুষ যবে বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিকে বিভিন্ন বস্তু ও আবেগের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধতে পারলে, সেই দিনই কাব্যের জন্মদিন।"

এরপর আছে আদি কাব্যের এই স্বরূপ-ব্যাখ্যা :

"প্রথম কবিতার আবির্ভাব হয়েছিলো কোনো ব্যক্তি-বিশেষের মনে নয়, একটা মানবসমষ্টির মনে ; প্রথম কবিতার প্রসার শুধু একটি মানুষের উপরে নয়, সমগ্র জীবনের উপরে ; প্রাথমিক কবিতার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ নয়, সঙ্কলন।"

ঐতিহাসিক গবেষণার এইখানেই শেষ। এরপর দার্শনিক তত্ত্ব।

"সেই দিন থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত কাব্যের সেই বিশ্বম্ভর-মূর্তি কেবল ক্ষয়ে গেছে। তার সেই নীহারিকার মতো আয়তন সৃষ্টির রীতিতে আজকে কবিরূপ উল্কাখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ। ফলে অনেকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছেন, কাব্যের বিকাশধারার কি তবে এইখানেই শেষ। আমার তাই বিশ্বাস। আমি মনে করি, এই ধরণের একটা পর্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে ; এর পরেও আবার যদি কাব্যের মধ্যে একটা তীব্র জ্যোতি দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে সে-জ্যোতি পথচ্যুত উল্কার চিতাগ্নি মাত্র।"

কোথায় 'ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার' আর কোথায় 'পথচ্যুত উল্কার চিতাগ্নি'! বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে-সংঘাত দেখা দিয়েছিল আরো অন্তত দশ বছর পরে, পরিচয়-এ তা প্রকাশ পেয়েছিল একেবারে প্রথম থেকে। কিন্তু তখনো এই সংঘাতের অর্থ মননশীল বাঙালির আত্মনিবিষ্ট মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

কেমন ক'রে হবে? কেননা, অবাস্তবতার মেরু থেকে মেরুতে আমাদের মন ছিল দোদুল্যমান।

'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধের আলোচনায় ফেরা যাক। সমাজতন্ত্রের উপকরণ এতে যথেষ্ট আছে। তার ওপর আছে লেখকের নিবিড় রসবোধের পরিচয়। ছন্দ সম্বন্ধে লেখক বলছেন :

"ছন্দ আর আবেগ হয়তো যমজ ভাই, তাদের টান হয়তো নাড়ীর টান। এখানে একটা বিষয় অবশ্য দ্রষ্টব্য — আবেগ আর বেগ এক কথা নয়, আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরামই বেশী ; অর্থাৎ আবেগ যখন মুখর হ'য়ে ওঠে তখন তার ভাষা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়য় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে। এই ধ্বনি ও যতির সুব্যবস্থিত নক্সাই বোধ হয় ছন্দ।"

এরপর গদ্য ও পদ্য যে অভেদাত্মা তার প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের লিপিকা থেকে 'এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল?' এই সমগ্র রচনাটি উদ্ধার ক'রে সুধীন মন্তব্য করেছে :

"যদি কুসংস্কার বর্জন করে শোনা যায়, তাহ'লে আমাদের কান ওই লাইন-ক'টার মধ্যে একটা অন্তর্ভৌম ছন্দের ঝঙ্কার পাবে। এই গূঢ় শৃঙ্খলার মূলে কোনো রকমের তান্ত্রিক চাতুরী নেই ; কেবল উপমা আর ভাবের বৈকল্পিক বিন্যাসেই এই প্রতিসাম্য এসেছে। নিক্তির একদিকে সন্ধ্যার ভার যেই রজনীগন্ধার সহযোগে এলিয়ে পড়তে চায়, তখুনি কনকচাঁপা সূর্যের সমর্থনে ছুটে এসে তাদের নির্ভর হ'য়ে দাঁড়ায় ; 'জাগলো কে' — প্রশ্নটা যেমন উতল হ'য়ে ওঠে, দীপের আরতি আর ফুলের অর্ঘ্য অমনি তাকে শান্ত ক'রে দেয় ; হাওয়ায় ভরা পালের চালনে অর্গলিত ঘরের স্থবির নিদ্রা কোথায় উধাও হয়ে যায়, কে জানে?"

মননশীলতা ও রসগ্রাহিতার সম্মিলিত রসায়নে এর আগে বা পরে এমন ক'রে বাংলা ভাষায় কাব্যের রস আর কে ফুটিয়েছে? এরপর আছে মহৎ কাব্যের এই উজ্জ্বল বর্ণনা :

"... কাব্য যখন মহত্ত্বের কোঠায় পৌঁছয় তখন তার সঙ্গে আর সংখ্যার কোনো সম্পর্ক থাকে না, তখন তার ভিতরে পাওয়া যায় শুধু একটা বিরাট সহজতা। কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দও তেমনি অকৃত্রিমতার পদধ্বনি।"

কিন্তু সামনের দিকে চাইতে লেখক নারাজ, কেননা :

"বাস্তবিক পক্ষে কোনো সাত্ত্বিক আধুনিক কবি নবীনতার বড়াই করে না ; "বাস্তবিক পক্ষে কোনো সাত্ত্বিক আধুনিক কবি নবীনতার বড়াই করে না ;

"বাস্তবিক পক্ষে কোনো সাত্ত্বিক আধুনিক কবি নবীনতার বড়াই করে না ; সাহিত্যকে নব সম্পদে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চিরদিনই উপহাস্য ; তাই সে জানে, সাহিত্যকে নব সম্পদে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চিরদিনই উপহাস্য ; তাই সে শুধু আবিষ্করণে মন দিয়েছে। প্রথার অন্ধকূপ থেকে কণ্ঠাগত-প্রাণ ঐতিহ্যকে মুক্ত করাই তার উদ্দেশ্য ; তার ব্রত, কাব্যকে আদিম স্বাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।"

দুঃখের কথা এই যে এই আদিম স্বাধিকারের সন্ধানে আজ পৃথিবীর একাধিক প্রমত্ত কবি বিমুখ হয়েছে ভবিষ্যতের প্রতি, আশ্রয় খুঁজেছে সেই ঐতিহ্যে যা একান্তভাবে অতীতে বিলীন। আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে সুধীন দত্তের মতামত উদ্ধৃতির যোগ্য :

"দুরূহতার দুটো দিক্ আছে, একটা পাঠকের দিক্, অন্যটা লেখকের। যে-দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তার জন্যে কবিকে দোষী করা যায় না। দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতকে বাদ দিলেও কলার অন্যান্য বিভাগে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে যে-আগ্রহ অভিনিবেশ ও অনুশীলন আবশ্যক, কবি যদি তার নিজের কলার পক্ষে সেই পরিমাণের শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা চায়, তাহ'লে তার দাবি নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যে-দুরূহতার উৎপত্তি অনুকম্পার অভাবে, যার মূল কবির নিজের দ্বিধা, তার কতকটার দায় যুগসন্ধির স্কন্ধে চাপানো গেলেও বেশীর ভাগটা বইতে হবে কবিকেই।"

এ-কথা কি পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত ? যুগসন্ধির দ্বিধা কি এত সহজে গা থেকে ঝেড়ে ফেলার জিনিস ? সেদিনকার দ্বিধা থেকে মুক্ত হয়ে আজ যাঁরা 'নিত্য প্রলয়ের উদ্বেল উতরোলের মাঝখানেও নিরপেক্ষ স্থিতির অবিনশ্বর শান্তি' লাভের কামনায় সংগ্রামকে পাশ কাটিয়ে বিপ্লবকে বিদ্রূপ করছেন, কাব্যের চরম সার্থকতার সন্ধানে তাঁরাই কি পথনায়ক ? সুধীন দত্তের মতে ঐ অবিনশ্বর শান্তিকে পায় নি ব'লেই আধুনিক কাব্য (অর্থাৎ তখনকার দিনের) হার স্বীকার করেছে। কিন্তু

"তবু সে চলেছে, নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেয়নি, উপশন্ন বিপদের আশঙ্কা রাখেনি, ফিরে দেখেনি তার প্রত্যাবর্তনের পথ পদে পদে খসে যাচ্ছে।"

তারপর ?

"ইতিমধ্যে মণ্ডলাকার প্রগতির পরিক্রমা হয়তো তার শেষ হয়েছে, আর অগ্রগমনের স্থান নেই, এর পরেই হয়তো মৃত্যু, তবুও তার গতিবেগ থামতে চাইছে না, এখনো তার উদ্যমের অন্ত নেই, শ্রান্তি নেই তার চরণে। এই

অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের পারিতোষিক-স্বরূপ সে যেন কেবল এইটুকুই বুঝতে চায় যে শূন্যগর্ভ মায়ার মধ্যে তার সৃষ্টি আরো শূন্যময়।"

পাঠকদের মনে থাকতে পারে আমি সুধীন সম্বন্ধে একেবারে গোড়াতেই লিখেছিলাম যে বিদেশী ছাঁচে-ঢালা মনের ওপর বৈদেশিক সংস্কৃতির পালিশ লাগিয়ে সে দেশে ফিরেছিল প্রবাসে দেহমনের রোগ কাটিয়ে। এ-কথা আজ ফিরিয়ে নিচ্ছি। নীরেনের করকম্পনের চেয়ে অনেক বেশি জটিল ব্যাধি সুধীন বাধিয়েছিল সম্ভবত এ-দেশে ব'সেই। কেননা এই ব্যাধির জন্ম দেশের বা বিদেশের মাটিতে নয়—যারা মাটিকে মানে নি ও মানুষকে দেখেও দেখে নি, যুগসন্ধির সেইসব বাস্তুহারা সাহিত্যিকদের মনে। নইলে কোথা হতে আসে এই শূন্যতাবোধ, এই জীবন-বিমুখতা ?

এই বাস্তুহারা সাহিত্যের অবাস্তবতার মধ্যেও ছিল প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ —সমাজের সঙ্গে শিল্পীর বিরোধের বিরুদ্ধে। এইটুকুই এর সার্থকতা। সুধীনের গদ্য বা পদ্য রচনায় এই বিরোধের উপলব্ধি থাকলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তার রচনায় কোনদিন পুরোপুরি ফুটে ওঠে নি, উঠলে আজকের বাংলা সাহিত্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ হ'ত। কিন্তু বাংলা গদ্যকে মোড় ফেরাবার চেষ্টার নমুনা হিসাবে সুধীনের 'কাব্যের মুক্তি' ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। এর ভাষা জমাট ও জলজলে। এর চরম সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য হলেও এর অনেক যুক্তি আজ প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মুখে বাঁধা বুলির মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব যুক্তিতে সুধীনের মৌলিক মৌরুসিপাট্টা না-থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এর আগে এ-সব কথা আর কেউ বলে নি। আর এরকম আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষায় সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনাই বা আজ পর্যন্ত অন্য কোন্ লেখক করেছেন ?

মরণমুখী মনোবৃত্তির নিরেট দেওয়ালে মাথা ঠুকে সুধীন দত্ত যখন সন্ধান করছিলেন আধুনিক কাব্যের মুক্তির পথ, তখনো বাংলা দেশের প্রগতিশীল কবিরা তন্ময় ছিলেন বিগত যুগের বিদেশী রোম্যান্টিক কাব্যের তলানির নেশায়। এই তলানিতেও অবশ্য যথেষ্ট রস ছিল, আর বেশ ঝাঁঝালোভাবেই তা ফুটেছিল পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' নামের কবিতায় :

আজ মাঝ-রাতে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটিবে যখন,
ঘুম ফেলে' দিয়ে তুমি চলে' এসো এখানে ;—কেমন ?
মুখোমুখি বসে' কবিতা পড়্‌বো আমরা দু'জন।

ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজ কবি ড্যান্টে গেব্রিয়েল রসেটির 'ট্রয় টাউন' থেকে উপকরণ ও 'সকল কালের সব পুরুষের' সম্মিলিত বাসনা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ ক'রে বুদ্ধদেব বসু এরপর লিখেছিলেন শাশ্বত নারী হেলেনের বুকের সোনার বাটির কথা—একেবারে কামিনীকাঞ্চনযোগ :

উতল বাতাস, মাতাল বাতাস, রাতের বাতাস,
বাতাসের ভাষা শুন্‌বে পাতারা, শুন্‌বে আকাশ ;
পুরোনো প্রেমের কবিতা পড়্‌বো আমরা দু'জন।
('আমার বুকের ছাঁচে গড়া এই সোনার বাটি
বাসনার রসে আনিয়াছি ভরে' সব পুরুষের।'
—গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'লো ট্রয়!)

তারপর :

বই থেকে চোখ তুলে' মাঝে-মাঝে তাকাবো তোমার
আলো-ছায়া ভরা চুলে আর চোখে—চোখের তারার
গভীর কালোয় ; তুমি মুখ তুলে' হাস্‌বে—কেমন?
('ছাখো, মোর বুকে দু'টি পাকা ফল ভরেছে রসে—
বাসনার রসে সকল কালের সব পুরুষের।'
—পুড়ে' খাক্ হ'লো ট্রয়!)

... ...

পূবের সবুজে সাদা হ'য়ে ফোটে ভোরের আকাশ,
রাতের, দিনের মাঝখানে এসে ঝিমায় বাতাস।
বই শেষ করে' চুপচাপ বসে' আমরা দু'জন।
(কোথায় ভিনাস! কোথায় বা সেই বুকের বাটি!
বিশাল বাসনা বুকে জ্বলে তবু সব পুরুষের—
পোড়ে লাখো-লাখো ট্রয়!)

লাখো-লাখো ট্রয়ের দহনজ্বালার উত্তাপে একদিন বাংলা দেশের তরুণ লেখকের দল সৃষ্টি করেছিল কল্লোল-এর যুগের সাহিত্য। সেই উত্তাপের খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় এই কবিতাটিতে।

রবীন্দ্রনাথকে টেক্কা দিয়ে কল্লোল-এর লেখকগোষ্ঠী চেয়েছিলেন উত্তর-রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করতে—রবীন্দ্রনাথ যাকে ঠাট্টা করতেন 'ধুত্তোর রবীন্দ্র' সাহিত্য ব'লে। কিন্তু রোম্যান্টিসিজম্-এর ঘেরাটোপের মধ্যে যাঁদের আজন্ম

বাস ও বিহার—রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে কতদূর আর তাঁরা যাবেন? ঐ-যুগেরই একজন কবি, অন্নদাশঙ্কর রায়, পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় ছাপা 'সমাপ্তি' কবিতায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে :

আমাদের প্রেমে ফুরালো কথার পালা,
মন জানাজানি কিছু না রহিলো বাকী।
বাসনার দীপে নিবিলো নিবিড় জ্বালা,
বাসর-শয়নে নীরবে নমিলো আঁখি।...
এবার প্রেমেরে সহজ করিয়া আনা,
অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোলা।
এবার প্রেমেরে মনের আড়ালে মানা,
চির চেতনার চির বেদনারে ভোলা।
আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি,
এতখনে হলো উদ্দামতার ক্ষান্তি।

কল্লোল-এর যুগের সমাপ্তি এই মৌন গভীর শান্তিতে। কিন্তু ঐ-যুগের অর্বাচীনতম কবি বিষ্ণু দে এই শান্তিকে উপেক্ষা ক'রে লিখেছিলেন :

—দোলরাত্রি নহে, নহে কোজাগরী যামিনী জাগর,
খরসূর্য্য চক্ষে মোর, রসহীন শাণিত বাতাস
পেশীরূঢ় বাহু দিয়া ভেদি' চলি পর্ব্বতের 'পর।

['অর্দ্ধনারীশ্বর']

এরপর বজ্রপাণির কঠিন প্রহরণে ট্রয় নয়—তরুণ বাংলার কাব্যকুঞ্জ চুরমার হওয়াই স্বাভাবিক :

সুগঠিত প্রেম, বাসনাবিলাস, উপবনপূর্ণিমা
দূর করে' দিলে ঘোর ঝঞ্ঝায় চূর্ণ চূর্ণ করি',
যে ভুবনে মোরে নিয়ে' এলে—কোথা নারীদেহরঙ্গিমা?
তোমারে আমার বন্ধু করিয়া কি লাভ, বজ্রপাণি?

['বজ্রপাণি']

ভাবগঙ্গার জলতরঙ্গে শোনা গেল আগামী যুগের বজ্রনির্ঘোষের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি—বাংলা কাব্যে নতুন এক সুরের সামান্য একটু আমেজ।

বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগ সৃষ্টির দাবি পরিচয় কোনদিন করে নি। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ভাবগঙ্গার প্রশস্ত বাহন হওয়া। এই উদ্দেশ্য পালনের জন্যে

পরিচয়

প্রতি সংখ্যা ১৲
বার্ষিক ৪৷৹

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৮

বিষয় সূচী

সম্পাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

যে পরিচালকবর্গ আয়োজনের ত্রুটি করেন নি তার প্রমাণ প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র (আগের পাতায় প্রতিলিপি মুদ্রিত হ'ল)।

মোটা এ্যান্টিক কাগজে ছাপা রয়্যাল সাইজের ১৫৪ পাতা পত্রিকা ত্রৈমাসিকের পক্ষেও আকারে যথেষ্ট প্রশস্ত, এ-কথা স্বীকার করতে হবে। এর মধ্যে প্রথম ১১৩ পাতা প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ছাপা হয়েছিল পাইকা টাইপে। বাকি ৪১ পাতার মধ্যে 'পাঠকগোষ্ঠী' বিভাগের ৫ পাতা বীরবলের পত্র বাদে বাকি ৩৬ পাতা স্মল পাইকায় ছাপা 'পুস্তক-পরিচয়'।

পরিচয় যে একেবারে প্রথম থেকে বিশিষ্ট পত্রিকা ব'লে খ্যাতি পেয়েছিল তা প্রধানত এই 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগের জন্যে। এর আগে বাংলা দেশের কোন পত্রিকা সমালোচনা-সাহিত্যকে এতটা সম্মানের আসন দেয় নি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনী-লেখক এডওয়ার্ড টমসন-এর উক্তি। কথায়-কথায় একদিন তাঁর মুখে শুনেছিলাম যে বাংলা সাহিত্যে দুটি জিনিসের অভাব : নাটক ও সমালোচনা। এই প্রসঙ্গটি বিস্তার ক'রে টমসন বলেছিলেন যে মতভেদ সত্ত্বেও ইংরেজি সাহিত্যের নামজাদা লেখকদের আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে ইংরেজ পাঠকদের মনে একটা ধারণা আছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কোন স্ট্যাণ্ডার্ডই নেই।

আমি প্রায় দশ বছর আগেকার কথা বলছি। পরিচয়-এর আবির্ভাব হয় এর প্রায় দশ বছর পরে। এই দশ বছরের মধ্যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য বিশেষ-কিছু এগোয় নি। লোকের মুখে-মুখে, সাহিত্যিকদের আড্ডায়, অধ্যাপক-ছাত্রদের আলাপ-আলোচনায় সাহিত্য-বিচার হ'ত অত্যন্ত এলো-মেলোভাবে। এর কারণ ছিল খানিকটা বাঙালির মনের স্বাভাবিক জড়তা আর অনেকটা সুযোগের অভাব। এই অভাব মোচন করল পরিচয়। মনের ও কলমের জড়তা কাটিয়ে একদল মননশীল লেখক পরিচয়-এর পাতায় সাহসের সঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন সমসাময়িক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণে।

পুস্তক-পরিচয় : 'শেষ প্রশ্ন'

এই সাহসী লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় নীরেন রায়ের নাম, কেননা তার হাতের রচনা দিয়ে শুরু হয় পরিচয়-এর পাতায় সমসাময়িক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণের অভিযান। এ-ক্ষেত্রে 'অভিযান' কথাটি একেবারে অভিধানসিদ্ধ। কেননা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের আসরে নীরেন প্রবেশ

করেছিল শরৎচন্দ্রের সদ্য-প্রকাশিত ‘শেষ প্রশ্ন’ বইকে সহংকার আক্রমণ ক'রে।

“পদের সুমিতপ্রয়োগে, বাক্যের সুবিন্যস্ত গতিতে, বক্তব্যের সুসীম নিশ্চয়তায়, চিত্রিত চরিত্রের সুনির্দ্দিষ্ট স্পষ্টতায়” শরৎচন্দ্রের — অর্থাৎ আগেকার শরৎচন্দ্রের — উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতির পর নীরেন লিখেছিল:

“কিন্তু চারিশত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গল্পটী পড়িতে পড়িতে সন্দেহ হইল — শরৎবাবু কি থামিতে ভুলিলেন? তিনি কি ভুলিয়া গেলেন শিল্পসৃষ্টি হয় শুধু সৃজনেরই তাড়নায়, অন্য যে-কোন উদ্দেশ্য সৃজনের পক্ষে শুধু অবান্তর নয়, অন্তরায়? কারণ, ‘শেষ প্রশ্নে’ তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় নাই বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহার মধ্যে এমন একটি চরিত্র বা ঘটনা নাই, যাহা তাঁহার শিল্পী-মনকে উদ্বোধিত করিয়াছে।”

এরপর আছে ঘটনার সারমর্ম — অতি সংক্ষেপে মাত্র এইটুকু:

“আশুবাবুর কন্যা মনোরমাকে কমলের তথাকথিত স্বামী শিবনাথ ভুলাইয়া লইলেন, আর মনোরমার দয়িত অজিতকে শিবনাথের ‘শিবানী’ ছিনাইয়া লইলেন — একান্ত বিশেষত্ব-বর্জ্জিত সুপরিচিত অদল-বদলের কাহিনী।”

কোন নাম-করা লেখকের চারশো পাতার একটি বইয়ের গোটা প্লটের সার বা অসার নির্যাস মাত্র চার লাইনের চুম্বকে পাঠকদের পাতে পরিবেশন করাকে সঙ্গত সমালোচনা বলা চলে না — এতে লেখকের প্রতি অবিচার না-হলেও পাঠকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কড়া কথা বলার প্রয়োজন ছিল, আর নীরেন বিশেষ কড়াভাবেই তা বলেছিল। আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

“এই কমলই হইতেছে ‘শেষ-প্রশ্নের’ মুকুটিত কীর্ত্তি — অথবা অপকীর্ত্তি। সমস্ত আখ্যায়িকাটী তাহারই চারিপাশে ঘুরিতেছে, — আগ্রার প্রবাসী-বাঙ্গালী-পতঙ্গের দল তাহার বিজাতীয় রূপবহ্নির চারিপাশে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইত। ঘটনাগুলি ঘটান হইতেছে এমনভাবে যাহাতে কমলের সুযোগ হয়, হয় কড়াকড়া কথা কহিবার, না-হয় অভাবিত চমকপ্রদ কোনকিছু করিবার। অধিকাংশ ঘটনাই আকস্মিক, অসুস্থ আকস্মিকতার অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত গল্পটীকে কলুষিত করিয়া দিয়াছে।... একই দেহে বিভিন্ন অবয়বের মত, একই গল্পে বিভিন্ন ঘটনা, প্রত্যেকে, বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া পরস্পরকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে — ইহাই হইল কথাশিল্পীর আদর্শ। সে-আদর্শকে তুচ্ছ করিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতিভা এক কদাকার monstrosity-র জননী হইয়া বসিয়াছে।”

এইজাতীয় মন্তব্য অবশ্য সমালোচকের স্বাধিকার-বহির্ভূত না, কিন্তু ‘কদাকার monstrosity-র জননী’কে monstrosity ছাড়া আর কী বলা যায়? ‘পদের সুমিতপ্রয়োগে, বাক্যের সুবিন্যস্ত গতিতে’ নীরেনের ভাষা সবসময়ে আদর্শ না-হলেও, ‘বক্তব্যের সুসীম নিশ্চয়তায়’ তার রচনা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। এই নিশ্চয়তার চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ‘শেষ প্রশ্ন’ প্রসঙ্গের শেষ ছত্রে:

“আসল কথা, আমাদের দেশের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা শরৎচন্দ্রের ভাবপ্রবণ অন্তরকে পীড়িত করিয়াছে — ‘শেষ প্রশ্ন’ এই পীড়নের তীব্র প্রতিঘাত; শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় ইহা রচিত নহে। তাই শরৎচন্দ্রের দেশপ্রীতিকে শ্রদ্ধা করিয়াও বলা যায়, যে-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্রষ্টা না হইয়া সংস্কারক হইয়া ওঠেন, সৃজনের অপেক্ষা লোকশিক্ষাকে বড় করিয়া দেখেন, রূপকারের বৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া উপকারে প্রবৃত্ত হন, হে ভগবান, সে-সাহিত্যের ভবিষ্যতের প্রতি তুমি দৃষ্টি রাখিয়ো!”

নীরেন রায়ের মূল্যবিচারের মাপকাঠি আজ অনেক বদলে গেছে। অবশ্য তার ফলে ‘শেষ প্রশ্ন’ তার বিচারে যে মূল্যবান হয়ে উঠেছে তা মনে করার কোন হেতু নেই। কিন্তু এ-কথা বোধহয় ‘সুসীম নিশ্চয়তা’র সঙ্গেই বলা চলে যে, যে-ভগবানকে দোহাই মেনে একদিন নীরেন ঐ-জাতীয় মতামত প্রচার করেছিল, সেই ভগবানে বিশ্বাসের সঙ্গে ঐ-জাতীয় মতামতকে সে আজ জলাঞ্জলি দিয়েছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দুর্নিবার স্রোতে। মতামত ও ভাষার কথা বাদ দিয়ে এই সমালোচনাটির ধরন ও ভঙ্গি সম্বন্ধেও যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। নীরেন বরাবরই কঠিন কথা কঠোর সুরে শুনিয়ে দেবার পক্ষপাতী, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রায় সুলভ নাটকীয় কর্কশতায় পৌঁচেছে। এর পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে বক্তৃতামঞ্চের আস্ফালন — সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে যা অপাঙ্‌ক্তেয়।

আর-একটি কথা একালের তরুণ পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ‘শেষ প্রশ্ন’ লেখার বহুদিন আগেই শিল্পী শরৎচন্দ্রের গুরুতর স্খলন ঘটেছিল; সুতরাং নীরেনের আবিষ্কার একটু বিলম্বিত। ‘শরৎবাবু কি থামিতে ভুলিলেন’ নীরেন রায়ের এই সন্দেহ সেকালের অনেক পাঠকের মনেই সুসীম নিশ্চয়তায় দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছিল ‘শেষ প্রশ্ন’ পড়ার বহুদিন আগে শরৎবাবুর বিরাট ‘চরিত্রহীন’ উপন্যাস প'ড়ে। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন ‘চরিত্রহীন’ সত্যিই চরিত্র-হীন।

কিন্তু এ-সব কথা হ'ল, সাহিত্যিক আড্ডার কথা, খোশগল্পের কথা ; অতএব বিশুদ্ধ কিংবদন্তী। ছাপা হরফে শরৎচন্দ্রের মূল্যনিরূপণের চেষ্টার, যতদূর জানি, প্রথম দৃষ্টান্ত নীরেন রায়ের এই সমালোচনা। গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও এই রচনাটি স্মরণীয়। এর মূল বক্তব্য এখনকার প্রগতিবাদীদের বিচারেও অবশ্য-গ্রাহ্য। মেকি জিনিস—আমি সাহিত্যের কথা বলছি—সহজে নীরেন রায়ের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। এ-ক্ষেত্রে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের শিল্প-সৃষ্টিতে মেকি মালের সন্ধান পেয়ে নীরেনের উচ্ছ্বাসপ্রবণ কলম একটু বাড়াবাড়ি করলেও তার শরসন্ধান যে অব্যর্থ হয়েছিল এ-কথা মানতে আমরা বাধ্য।

আমাদের থেকেও বেশি বাধ্য হয়েছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। নীরেনের সঙ্গে তাঁর একসময়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল দিলীপ রায়ের বাড়ির গানের আড্ডায়। ঐ-আড্ডাতেই কোন-এক বিখ্যাত ওস্তাদ সম্বন্ধে শরৎবাবু দিলীপ রায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "গায় তো ভালো, কিন্তু থামে তো?" ঘটনাটির উল্লেখ আছে নীরেনের সমালোচনার একেবারে প্রথমেই। যিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন তিনি নিজেই থামবার কৌশল গেলেন ভুলে, তাঁর প্রিয় শিষ্য নীরেনের কলম মারফত এই নির্মম সত্যের প্রচার তাঁর পক্ষে বরদাস্ত করা সহজ ছিল না।

মনে পড়ে, পরিচয় যখন বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তখন শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তাঁর পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন মল্লিকদা (বসন্তকুমার মল্লিক—এঁর বিস্তারিত পরিচয় এই রচনাপ্রসঙ্গে পরে দেব)। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার মধ্যে বহুবার শুনতে হয়েছিল পরিচয় সম্বন্ধে তাঁর তীব্র অভিযোগ আর তাঁর 'বিশেষ স্নেহের পাত্র' নীরেনের তাঁকে 'অহেতুক' আক্রমণ করার জন্য আক্ষেপ। পরিচয়-এর একেবারে আদিপর্বেই এইভাবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যে-বিরোধের সৃষ্টি হয়, তা কোনদিন ঘোচে নি। কেন জানি না, শরৎবাবুর মনে ধারণা হয়েছিল যে পরিচয়-এর পাতায় তাঁর প্রতি যে-অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়েছিল হয়তো তার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। ঠিক স্পষ্ট ভাষায় এ-কথা না-বললেও, এ-ধারণা আমার মনে হয়েছিল তাঁর কথার ভাবে।

•

কল্লোল-সম্প্রদায় : বিকার ও বিচার

প্রথম সংখ্যার পরিচয়-এ মোট বাইশটি বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছিল ; তার মধ্যে মাত্র ছ'টি ছিল বাংলা, বাকি ষোলটি বিদেশী বই।

বাংলা বইগুলির মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয়, অভিনয় নয়' ও 'বন্দীর বন্দনা' সমালোচনা করেছিলেন গিরিজাবাবু। প্রথম বইটি বুদ্ধদেববাবুর প্রথম প্রকাশিত গল্পের বই। আমার হাতের কাছে বইটি এখন নেই, কিন্তু মনে আছে এর প্রথম সংস্করণের মলাটের ওপরকার প্রচারপত্রে বিশেষ জোর দিয়ে এই দাবি করা হয়েছিল যে, 'রবীন্দ্রনাথ থেকে মণীন্দ্রলাল বসু পর্যন্ত ঝুড়ি-ঝুড়ি' (যতদূর মনে হয় এইধরনের কথাই ব্যবহার করা হয়েছিল) রোম্যান্টিক সাহিত্যের পর বাংলা সাহিত্যে নতুন একদল লেখক (অর্থাৎ 'কল্লোল'-পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী) যে নতুন বাস্তবতাবোধের স্রোত এনেছেন, তারই নিদর্শন এই গল্পগুলি। গিরিজাবাবু ঐ-প্রচারপত্রের ভাষা উদ্ধার না-করলেও এর কথা উল্লেখ ক'রে লিখেছিলেন বইটির প্রথম গল্প 'প্রথম ও শেষ' সম্বন্ধে :

"মিছে এ কথা বলা যে, এ গল্প রিয়ালিষ্টিক্। তা' যদি হয় তবে বঙ্কিমকে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌-এর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, অন্ততঃ তাঁর 'বিষবৃক্ষ'কে নয়। কেননা সুন্দরী যুবতী প্রেমপরায়ণা স্ত্রী থাকতে বিধবা পরস্ত্রীর (অর্থাৎ একে বিধবা তদুপরি পরস্ত্রী—কল্পনা করা একটু কঠিন) প্রতি ধাবমান হওয়ার চেয়ে সেরা রিয়ালিজ্‌ম্ আর কি আছে?… বেশীদিন আগের কথা নয়, আমাদের সাহিত্য-রসিক বন্ধু-মহলে শরৎবাবুকে নিয়ে ঠিক এই তর্কই উঠত ; একপক্ষ বলতেন, শরৎবাবু বাঙলা সাহিত্যে রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রবর্ত্তক, প্রতিপক্ষ বলতেন কখনই না। এখন সে তর্ক আর ওঠে না, এখন সকলেই স্বীকার করেন, শরৎবাবু রবীন্দ্রযুগেরই অন্তর্গত। বুদ্ধদেবও এই যুগেরই অন্তর্গত, নূতন যুগকার বাঙলা সাহিত্যে এখনও আবির্ভূত হন নি।"

'বিধবা-পরস্ত্রী' ঘটিত বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই হ'ল রীতিমতো সাহিত্য-সমালোচনা। বাংলা দেশে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সাহিত্যবিচারের এই চেষ্টা পরিচয়-এর আগে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এইজাতীয় লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধকল সইতে হয়েছিল সম্পূর্ণ তাঁদের নিজেদের। 'ভাণ্ডার', 'ভারতী', 'সাধনা' পত্রিকায় যে-সব জলজলে লেখা ছাপা হ'ত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা রবীন্দ্রনাথ আমূল সংশোধন ক'রে দিতেন। এমন-কি, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের শুধু প্রভাব নয়, কলমের আঁচড় প্রায় সর্বাঙ্গে ছড়ানো।

পরিচয়-গোষ্ঠীতে দিকপাল কেউ না-থাকাতেই সুবিধা হয়েছিল সত্যিকারের এক লেখকগোষ্ঠী গ'ড়ে তোলার। সুধীনের বাবা হীরেনবাবু ছাড়া এঁদের

মধ্যে তেমন মান্যগণ্য কেউ না-থাকলেও এঁরা সকলেই ছিলেন মননশীল। সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারে আনকোরা আগন্তুক ব'লেই এঁদের কোন দাবি ছিল না (কল্লোল-গোষ্ঠীর মতন); তাই সাহিত্যিক মূল্যবিচারে ব্যক্তিগত অভিমান এঁদের বিচার-পদ্ধতিকে আচ্ছন্ন করে নি। আরো একটি সুবিধা ছিল এই যে পরিচয়-এ যাঁদের প্রথম সাহিত্যিক রচনায় হাতে-খড়ি হয়, তাঁরা কেউই 'তরুণ' সাহিত্যিকদের মতন বয়সে তরুণ ছিলেন না। তাই সাহিত্য-বিচারে পরিণত বুদ্ধির প্রয়োগ করা তাঁদের পক্ষে অনেক সহজ হয়েছিল।

পরিচয় বেরোনোর আগে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার না ছিল নির্দিষ্ট মান, না ছিল সঙ্গত প্রকরণ। এই কথা উল্লেখ ক'রেই আমি আগের কিস্তিতে লিখেছিলাম যে 'লোকের মুখে-মুখে, সাহিত্যকদের আড্ডায়, অধ্যাপক-ছাত্রদের আলাপ-আলোচনায় সাহিত্য-বিচার হ'ত অত্যন্ত এলোমেলোভাবে।' গিরিজাবাবুর উপরের উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ আছে শরৎবাবু রিয়ালিজম্-এর প্রবর্তক কিনা এই নিয়ে বন্ধুমহলে তর্কবিতর্কের কথা। বাঙালির মুখে এইজাতীয় তর্কবিতর্ক থামায় কার সাধ্য? কিন্তু এইসব এলোমেলো কথাকে জিভের ডগা থেকে কলমের ডগা মারফত ছাপার হরফে পরিণত ক'রে বহু অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট আকার দেবার সুযোগ যে পরিচয় সৃষ্টি করেছিল এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য। আর এর ফলে বাংলা দেশে যে আজ সাহিত্য-সমালোচনার স্ট্যাণ্ডার্ড অনেকটা এগিয়ে গেছে, আশা করি লোকে তা অস্বীকার করবে না।

এই স্ট্যাণ্ডার্ড সৃষ্টির প্রয়াসে পরিচয় প্রবৃত্ত হয়েছিল সমসাময়িক সাহিত্যের নিরপেক্ষ বিচারে। তাই গিরিজাবাবু বুদ্ধদেব বসুর রিয়ালিজম্-এর দাবি অস্বীকার করলেও তাঁর উক্ত গল্পটিকে 'সর্বাঙ্গসুন্দর' বলতে দ্বিধা করেন নি; 'বন্দীর বন্দনা'র কবি যে একদিন কবিমণ্ডলীর মধ্যে 'অতি সম্মানের আসন' পাবেন এই ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করেছিলেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ গিরিজাবাবুকে বলেছিলেন বৌদ্ধ। বুদ্ধদেব বসুর রচনা সম্বন্ধে গিরিজাবাবুর একটু দুর্বলতা হয়তো ছিল, কিন্তু তবু এ-কথা মানতে হবে সমালোচকের কলম হাতে নিয়ে নিজের এই দুর্বলতাকে তিনি বিশেষ প্রশ্রয় দেন নি। তার চেয়ে 'পথে-প্রবাসে'র সমালোচনায় সুধীরকুমার চৌধুরী যে অনেক বেশি দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায় সম্বন্ধে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে নিচের এই উদ্ধৃতি:

"এই তরুণ লেখকের মনটি আশ্চর্য্যরকমের সজাগ। ইহার বুদ্ধির উপর জড়তা বা সংস্কারের আবরণ অল্প। নিজের পরিপূর্ণ চেতনার আলোয় সব-কিছুকে আলোকিত করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, এবং যতখানিকে দেখিয়াছেন, তরুণ-মনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন; প্রকাশ-ভঙ্গীতেও কোনো জড়তা নাই।—এইটুকু বলিলে বইটির দোষগুণ দুইই প্রায় একসঙ্গে বলা হইয়া যায়।"

এর মধ্যে দোষের উল্লেখ কোথায়? এর পরেও বিশেষ নেই। একটি জায়গায় অবশ্য সুধীরবাবু বলেছিলেন, "অন্নদাশঙ্করের মতামতের সবগুলিই সুপরিণত নয়।" কিন্তু তার পরেই আছে, "এ-সমস্ত সত্ত্বেও তাঁহার মতামতের পশ্চাতে যে-একটি সুন্দর সত্যনিষ্ঠ, সত্যানুসন্ধিৎসু, জীবন্ত এবং জাগ্রত মনের পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাই এগুলিকে মূল্যবান্ করিয়াছে।" সুধীরবাবুর সমালোচনা পড়লে আর সন্দেহ থাকে না যে এই জাগ্রত মনটি পুরোপুরি রোম্যান্টিক। বুদ্ধদেব বসুও চিরকালই রোম্যান্টিক; কিন্তু কল্লোল-এর যুগে এই অন্তর্নিহিত রোম্যান্টিক ভাবকে অস্বীকার করার উৎকট প্রয়াসের ফলে তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের লেখায় দেখা দিয়েছিল গুরুতর অসুস্থতা।

গিরিজাবাবু বুদ্ধদেব বসুর যে নারীবিদ্বেষের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা অসুস্থতা ছাড়া আর কি? "কবির কাছে নারী শুধু চর্ম্মের আবরণে ঢাকা রক্তমাংসময় মদনানলের ইন্ধন মাত্র।" এর সঙ্গে তুলনীয়, সুধীরবাবুর ভাষায়, "নারীজাতি-সম্বন্ধে লেখকের (অর্থাৎ অন্নদাশঙ্করের) সহজ প্রাণবান্ সহানুভূতি।" কল্লোল-এর যুগে যে বয়ঃসন্ধির বিকার দেখা দিয়েছিল অত্যন্ত অশোভনভাবে, তা শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছিল রোম্যান্টিসিজম্-এর সহজ প্রাণবান অনুভূতিতে। কিন্তু এইখানেই তার শেষ। এরপরও যে মোড় ফেরার দরকার ছিল, কল্লোল-এর যুগের লেখকদের মধ্যে সে-উপলব্ধির বালাই বিশেষ ছিল না।

বর্বরতা, সভ্যতা ও সোভিয়েটতন্ত্র

পরিচয়ের জন্ম উত্তর-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের এই মোড় ফেরাবার সময়ে। সমসাময়িক ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও এইসময়ে প্রতিফলিত হয়েছিল সভ্য মানুষের মোড় ফেরার ব্যগ্র প্রয়াস। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফোকোনিয়ে, মালরো, জীদ প্রভৃতি খ্যাতনামা ফরাসি লেখকদের সদ্যঃপ্রকাশিত উপন্যাসগুলির পরিচয়-প্রসঙ্গে। প্রথমোক্ত দুটি লেখকের তুলনা ক'রে সুধীন দত্ত লিখেছিলেন:

"ফোকোনিয়ের সাধনা হচ্ছে বর্ব্বরতার সাহায্যে নির্বীর্য্য সভ্যতার শক্তিবৃদ্ধি করা; মালরোর চেষ্টা বর্ব্বরতার পৃষ্ঠপোষণে মুমূর্ষু সভ্যতাকে জগৎ থেকে অব্যাহতি দেওয়া। উভয়েরই যাত্রাস্থল এক,—জীবনকে স্বাস্থ্যবান ও সবল ক'রে তোলা; এবং দুজনেই স্থির করেছেন যে সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থা অসহ্য; বর্ব্বরতাই যে এ-রোগের একমাত্র প্রতিকার এ-সম্বন্ধেও দুজনের মতদ্বৈধ নেই। তবে এক পক্ষ বলেন, কানা মামার চেয়ে মামা না-থাকাই ভালো; অন্য পক্ষের বিশ্বাস, মাতুলের অন্ধতা স্বপ্নলব্ধ ঔষধের কল্যাণে সারলেও বা সারতে পারে।... আমার নিজের পক্ষপাত মালরোর দিকে।"

সম্পাদকীয় পরিভাষা খুব পরিষ্কার নয়, তাই সম্পাদকীয় সূত্র ধ'রে ঐ-যুগের মালরোর রচনা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আশা হয়তো সঙ্গত হবে না। কিন্তু এই উদ্ধৃতির লাইনগুলির ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি মারছে ফ্যাসিবাদের যে বীভৎস মূর্তি, আজকের পাঠকের চোখে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। সুধীন দত্ত জ্ঞাতসারে ফ্যাসিবাদ অবলম্বন না-করলেও, যে-মনোবৃত্তি থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। পরিচয়-এর ভাবগঙ্গায় শুধু সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালির চিত্তের নয়, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ও চিন্তাধারার তরঙ্গকল্লোল সুস্পষ্ট স্বরেই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। এর মধ্যে যেমন ছিল ফ্যাসিজম্-এর কর্কশ আওয়াজ, তেমন আর-একদিকে ছিল আগামী সুদিনের আগমনী গান রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে ও ডিউই, ড্রাইজার ও বারবুস এই তিন মার্কিন ও ফরাসি লেখকের সোভিয়েট রাশিয়া-বিষয়ক বইগুলিতে। ধূর্জটিবাবুর উপর ভার পড়েছিল এই বইগুলির আলোচনার।

ডিউই-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা ক'রে ধূর্জটিবাবু লিখেছিলেন: "তাঁর অভিজ্ঞতার ঘাতপ্রতিঘাতে এবং আদান-প্রদানে যে মতগুলি বইএতে ফুটেছে সেগুলির সঙ্গে অন্য একটি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের—আমাদের কবির মতেরও মিল রয়েছে। দুজনেই শিক্ষক, দুজনেরই অনুরাগ এক, দুজনেরই সিদ্ধান্ত এক।" ড্রাইজার ও বারবুস এই দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির তফাত একটিমাত্র বাক্যে ধূর্জটিবাবু পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়েছেন, "একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন, অন্য ব্যক্তি সাধারণেরই একজন হ'য়েই দেখেছেন।" এই প্রসঙ্গে ধূর্জটিবাবুর শেষ কয়টি কথা উদ্ধারযোগ্য: "আর একটি কথা মনে ওঠে। ভারতবর্ষে কম্যুনিজম সম্ভব কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর জ্যোতিষী দিতে

পারেন, অন্যে পারে না। তবে রাশিয়া-সম্বন্ধে কোন ভাল বই পড়লে মনে হয়, 'দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ'।"

আরো একটি বাংলা বইয়ের হিসাব বাকি থাকল; সেটি একেবারে ভিন্ন জাতের, বাংলা দেশের নব্য বেদান্তের প্রচারক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতীর (ষোড়শ শতাব্দীর) বিখ্যাত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' পুস্তকের বাংলা অনুবাদ। এই সমালোচনাটি লিখেছিলেন অশোকনাথ বেদান্ততীর্থ। তখনো অশোক শাস্ত্রী নামে তিনি পরিচিত হন নি। বাদ-বাকি বিদেশী বইগুলির নামোল্লেখের আর প্রয়োজন দেখছি না। শুধু আর-একটিমাত্র উদ্ধৃতি দিয়ে এবারকার প্রসঙ্গে ইস্তফা দিতে চাই। প্রথম সংখ্যার পত্রিকার সর্বশেষে ছাপা হয়েছিল 'বীরবলের পত্র'। বীরবল ঐ-পত্রের এক জায়গায় লিখেছিলেন:

"যখন এদেশে স্বরাজ হবে, আর তা হ'তে শুনছি আর বড় বেশী দেরী নেই, তখনও কি দেশের লোক, বিলেতের উক্তির শুধু পুনরুক্তিই করবে?... স্বরাট হওয়ার অর্থ কি, মনোজগতে অপরের ষোল-আনা দাসত্ব অস্বীকার করা—না পরমতের নির্ভুল নকল করা? মনোরাজ্যে 'কিং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে'—ধমক ইউরোপ যেদিন ভারতবর্ষকে দেবে, সেইদিনই আমার মতে ভারতবর্ষের যথার্থ সুদিন হবে। যেমন আজ রাশিয়ায় হয়েছে।"

সংঘং শরণং গচ্ছামি

নীরেন আমাকে কারণে-অকারণে প্রায়ই মনে করিয়ে দেয় যে পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যা আমি কিনে পড়েছিলাম, অর্থাৎ পরিচয়-এর প্রস্তুতিপর্বে নেপথ্য বিধায়কদের দলে আমি ছিলাম না। নিমন্ত্রণ অবশ্য পেয়েছিলাম, নীরেনেরই মারফত। কিন্তু কার্যসূত্রে কিছুদিনের জন্যে আমাকে যেতে হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে; ফিরে শুনলাম, ভাবগঙ্গার বিচিত্র কলরোল। তারপর একদিন আমার ওস্তাদজি নীরেন রায়ের হাত ধ'রে ঝাঁপ দিলাম এর খরস্রোতে।

নীরেন রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এই ঘটনার বছর দশেক আগে। সে আর-এক কাহিনী হলেও এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ খুব অশোভন হবে না। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তখন চেষ্টা করছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'ছাত্রসমাজ' প্রতিষ্ঠানটিকে ব্রাহ্ম গোঁড়ামির আওতা থেকে উদ্ধার ক'রে একটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার। এই বিষয়ে তাঁর বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন সুকুমার রায়। বাঙালি চিরদিন

মুক্তির সন্ধান করেছে আড্ডার অনির্দিষ্ট পথে। প্রশান্ত মহলানবিশ আড্ডার মর্ম বুঝতেন, তাই সিভিলাভের উদ্দেশ্যে তিনিও ব্রাহ্ম ও অ-ব্রাহ্ম একদল যুবকদের জড়ো ক'রে ব্রাহ্মসমাজ পাড়ায় বেশ-একটি আড্ডার ব্যবস্থা করেছিলেন। সীতা দেবী ও শান্তা দেবী এই আড্ডায় নিয়মিত আসতেন আর ব্রাহ্ম যুবকদের মধ্যে ছিলাম হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার ও আমি। প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী (জংলিদা নামে যিনি সমধিক পরিচিত) অন্য আড্ডার টান না-থাকলে মাঝে-মাঝে আমাদের আড্ডায় যোগ দিতেন। অ-ব্রাহ্ম যুবকদের মধ্যে ছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু ও সুধীরকুমার চৌধুরী। সুধীরবাবু তখন 'প্রবাসী'র অন্যতম সহকারী সম্পাদক।

কী ক'রে ও কার টানে নীরেন এসে এই আড্ডায় জুটল তা বলতে পারি না। মাঝখানে দু'এক অধিবেশনে যাই নি, তারপর সুশোভনের মুখে খবর পেলাম নীরেন রায় নামে সদ্য এম. এ. পাস গৌরবর্ণ একটি যুবক আমাদের দলে ভর্তি হয়েছেন শেক্সপীয়রের 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা' বলতে যিনি প্রায় অজ্ঞান। 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা' নাটক সম্বন্ধে আমারও সজ্ঞান উচ্ছ্বাসের অবধি ছিল না, তাই এই জ্ঞানমার্গে অতি সহজেই আমাদের দু'জনের অন্তরঙ্গতা জ'মে উঠল রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজি কাব্য ও আরো নানাবিধ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয় অবলম্বন ক'রে।

নীরেন তখন বঙ্গবাসী কলেজের তরুণ অধ্যাপক; কিন্তু ইতিমধ্যেই আলাপ-আলোচনায় ও বিশেষ ক'রে অন্য লোকের কথায় খুঁত ধরতে সে বেশ দড় হয়ে উঠেছিল। মাঝে-মাঝে কথার ফাঁকে-ফাঁকে নরনারীনির্বিশেষে সে এমন-সব গরম-গরম প্রগতিবাদী মত আওড়াত, সাধারণ শ্রোতার পক্ষে যা নিতান্তই গুরুপাক। তখনকার দিনে প্রগতিবাদী মতামত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল নরনারীর পরস্পর-সম্পর্কঘটিত। এই বিষয়ে নীরেনের লেখা একটি গল্প তার মুখে শুনে ঐ-আড্ডায় বেশ-একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রশান্তবাবু সহজে চঞ্চল হন না, হলেও দেখান না; কিন্তু এই গল্পটি শুনে তাঁরও ভ্রূ যথেষ্ট কুঞ্চিত হয়েছিল মনে আছে। গল্পটি পরিচয়-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল 'অকৃতজ্ঞ' নামে। প'ড়ে জনৈক গ্রাহক অত্যন্ত রূঢ় একটি চিঠি লিখে পরিচয়-এর সঙ্গে নতুন-পাতানো সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। ঘটনাটি আমার মনে থাকার একটি কারণ এই যে ঐ গণ্যমান্য গ্রাহক মহোদয়কে সংগ্রহ করেছিলাম আমি নিজে।

দ্বিতীয় সংখ্যার কথা যখন এসে পড়েছে তখন প্রশান্তবাবুর আড্ডা ছেড়ে আবার দশ বছর এগিয়ে আসা যাক।

নীরেনের অভিভাবকত্বে একদিন হাজির হলাম পরিচয়-এর অধিবেশনে। তখন দ্বিতীয় সংখ্যার আয়োজন চলছে। আগে বলেছি—আর-একবার পাঠকদের মনে করিয়ে দিই—ঐ-অধিবেশন প্রথম-প্রথম হ'ত আগামী সংখ্যার জন্য লেখা বিচার, বাছাই ও জোগাড়ের উদ্দেশ্যে। তারপর ক্রমশ এই কার্যকরী অধিবেশন পরিণত হ'ল নিছক আড্ডায়; বিচার ও বাছাইয়ের কাজ পড়ল সম্পাদক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীর উপর।

নীরেনের অনুমোদিত ছোট্ট একটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ নিয়ে আমি ঐ-অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছিলাম। বাদ-বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ মনে পড়ে অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁর স্ত্রীকে। আমার ঐ-রচনাটি এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য ও আরো দু'চারটি লেখা বাছাই হ'ল, তার সঙ্গে হ'ল অল্পকিছু আড্ডা আর চা-সহযোগে প্রচুর জলযোগ। তারপর নিয়মিত ঐ-অধিবেশনে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ সংগ্রহ ক'রে বাড়ি ফিরলাম পরিচয়-সঙ্ঘের দীক্ষিত সদস্য হয়ে।

গুহা ও গুহাতীত

গত মহাযুদ্ধের সময় কলকাতায় প্রথম ক'টি জাপানী বোমার একটি পড়েছিল হাতিবাগানের বাজারে। এই বাজারটির ঠিক সামনের বাড়িটি ১৩৯ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট—কলকাতার অনেক লোকেরই পরিচিত। দুই কারণে, প্রথমত, কলকাতার নাম-করা পণ্ডিত ও অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ি ব'লে। দ্বিতীয়ত, বাড়িটির ঠিক সামনে রেলিঙের ধারে একসার সেকেলে বিলিতি কুর্তা-পায়জামা-পরা বেঁটে-বেঁটে মানুষ অহর্নিশি পথিকদের সেলাম ঠুকছে। মানুষগুলি অবশ্য রক্তমাংসের নয়, মাটির। এইজাতীয় দৃশ্য চোখে না-প'ড়ে উপায় কি? সাহেদ সুরাওয়ার্দি এই পুতুলগুলি দেখে বিহ্বল হয়ে সুধীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এতগুলি স্যার ওয়ালটার র‍্যালে (Sir Walter Raleigh) কী উপায়ে তার দুই পুরুষেরা আমদানি করেছিলেন?

বাড়িটির ভিতরে ঢুকেই চোখে পড়ে চক্-মিলানো দালান। উঠোনের চারপাশে হীরেনবাবু ও তাঁর পুত্রদের আলাদা-আলাদা কোঠা। সবচাইতে বড়ো ঘরটি দক্ষিণে, এটি তখন ছিল স্বয়ং কর্তার। বেদবেদান্ত ও থিয়োসফির অসংখ্য

মৌলিক গ্রন্থে ও ভাষ্যে ঘরজোড়া সেল্‌ফ্‌গুলি ভর্তি থাকত। সেকালের পরিচয়-এ সংখ্যার পর সংখ্যা ধ'রে বহন করেছে এইসব বই থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি। এ ছাড়া আসবাব যা ছিল তা অতি সামান্য ও চাকচিক্যহীন—যে-কোন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পণ্ডিত গৃহস্থের ঘরেরই আসবাবের মতন। পরিচয়-এর সূচনার বহু আগে হীরেনবাবু সক্রিয় পলিটিক্‌স্‌ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। স্বদেশীযুগের পলিটিক্যাল মিটিং চালনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকসময়ে বলতেন। ১৯১৭ সালে যখন অ্যানি বেসান্তকে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি করার প্রস্তাব নিয়ে নরম-গরম দলে তুমুল বিতণ্ডা বাধে তখন গরম দলের অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন হীরেনবাবু। তারপর, যতদূর মনে পড়ে, পলিটিক্‌স্‌-এর আসরে তাঁর আর আনাগোনা ছিল না। কিন্তু থিয়োসফি-চর্চা তাঁর চিরদিন অব্যাহত ছিল; মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন ভারতীয় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

কোর্ট থেকে ফিরে নিজের ঘরে হীরেনবাবু করতেন শাস্ত্রচর্চা। এ-বিষয়ে পিতা ও জ্যেষ্ঠপুত্রের—অর্থাৎ সুধীনের রুচির যথেষ্ট মিল ছিল। তবে ব্যক্তি-ভেদে শাস্ত্রও ছিল ভিন্ন জাতের। বিগত যুগের উৎসাহী পলিটিক্যাল নেতা ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় আগমনিগমের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা। ইয়োরোপীয় কাব্যদর্শনের, বিশেষ ক'রে শেক্সপীয়রের অনুশীলন তিনি একসময়ে যথেষ্ট ক'রেছিলেন: বহুকাল আগেকার একাধিক বাংলা পত্রিকায় তার সাক্ষ্য আছে। পুত্রের ঝোঁক ছিল ইয়োরোপীয় সাহিত্যের, প্রধানত আধুনিক অর্থাৎ তৎকালীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যের দিকে। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলাম, কেননা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে সে-যুগের (এ-যুগের কথা ঠিক জানি না) কোন বাঙালি ছেলে যদি সাহিত্যচর্চা ক'রে থাকে সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নয়, কল্পনারও অগোচর।

পিতাপুত্রের রুচিভেদ সহজেই চোখে পড়ত গৃহসজ্জায়। পুব-দক্ষিণ কোণের দুটি ছোটো ঘর ছিল সুধীনের এলাকা। একটি বসবার ঘর, আর-একটি পড়ার। এমনকিছু আসবাবপত্র ছিল না, কিন্তু যে-ক'টি ছিল তা বৈশিষ্ট্যময়। বসবার ঘরের একটি দরজা দিয়ে চোখে পড়ত সুধীনের তপস্যার গুহা—লাইব্রেরি ঘর। প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলাম ঘরটির জৌলুসে—ঐশ্বর্যের নয়, রুচির। অবশ্য পুরোপুরি বিদেশী রুচি।

বন্ধ জানলার বাইরে ছিল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের কলরোল, বহু মানুষের

আনাগোনার বিচিত্র আওয়াজ। এই নিরন্তর কোলাহলের মধ্যে অবিচলিত অন্তরে সুধীন করত সাহিত্যসাধনা। আর সখের চর্চা হিসাবে করত ফোটোগ্রাফি। ক্রমে সখের সিঁড়ি উচ্চতম ধাপে উঠে ক্যামেরা ছেড়ে ওড়াল পত্রিকার নিশান; তারই নিচে জুটলাম আমরা সকলে। সুধীনের ঐ-ঘরদুটি আমাদের পীঠস্থান হয়ে উঠল। অধ্যয়নের মাধ্যমে না-হ'লেও আব-হাওয়ার প্রভাবে তার সাংস্কৃতিক তপস্যার ছোঁয়াচ লাগল অল্পবিস্তর আমাদের সকলেরই মনে। আমাকে তো নীরেন আগে থেকেই তাতিয়ে রেখেছিল।

তপস্যার গুহা থেকে বেরিয়ে সুধীন আমাদের সঙ্গে যোগ দিল গুহাতীতের সন্ধানে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ শুক্রবারের অধিবেশনে চলল এই সন্ধান। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের কলরোলকে ছাপিয়ে উঠল আমাদের কণ্ঠস্বর। বচনের ভঙ্গিতে ও পরদায় সকলকে হার মানাল সুধীন। এ-বিষয়ে তার ধরনধারণ ছিল মোটেই অ্যাংলো-স্যাক্সন নয়, একেবারে ল্যাটিন।

রবীন্দ্রনাথ ও নীরেন রায়: লঘু ও গুরু

প্রথম সংখ্যা বের হবার আগে সঙ্কল্প করা হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখার জন্যে হাত পাতা হবে না। কিন্তু রবীন্দ্র-বর্জিত প্রথম সংখ্যা দেখে রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের উৎসাহ দিলেন, তখন আমরা বুঝলাম যে পরিচয় সম্পূর্ণ স্বকীয় শক্তিতে সমুত্থ, অতএব রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা দাবি করতে আর কোন দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না। এই দাবি রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ করলেন বাংলা পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে একটি চিঠি লিখে। 'পত্রিকা' নামে দ্বিতীয় সংখ্যার গোড়াতে এই চিঠি ছাপা হয়েছিল। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

"শুনেচি তরুণেরা বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি অনেক নূতন কীর্ত্তি ক'রেচেন ব'লে গৌরব করেন কিন্তু ভাষায় নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে-উদ্যোগ প্রমথ ক'রেছেন তা'র চেয়ে ইদানীং আর কী উদ্ভাবিত আমি জানিনে। এটা জানা আছে প্রমথকে বয়স খতিয়ে তরুণ বলবার জো নেই।"

তারপর,

"দুঃসাহসে ভর ক'রে তুমি 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক বের ক'রেচ।"

দুঃসাহসের ব্রতে এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের রীতিমতো উৎসাহদাতা হলেন শুধু মুখে নয়—কলমে।

পরিচয়-এর প্রথম দশ বছর মিলে যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকের সঙ্গে। কিন্তু এই দশ বছর শুধু পরিচয়-এর পাতাতেই তাঁর যে-ক'টি লেখা বেরিয়েছিল তাতে প্রমাণ হয় যে আয়ুর সীমান্তে পৌঁছেও তাঁর মন ছিল যেমন সতেজ, তেমনি সমর্থ ছিল তাঁর কলম। এই কলমের জোরে পরিচয়-এর স্বকীয়তাতে আরো বৈশিষ্ট্য দেবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার প্রমাণ দ্বিতীয় সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে ছাপা জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' উপন্যাসের সমালোচনা। কিছু-কিছু উদ্ধৃতি এর থেকে দেওয়া হ'ল যাতে পাঠকেরা সমালোচনার লঘুগুরু দৃষ্টান্ত হিসাবে মিলিয়ে দেখতে পারেন নীরেনের লেখা 'শেষ প্রশ্ন'র সমালোচনার সঙ্গে।

"লেখক আমাদের কাছে তাঁর বক্তব্য দাখিল করেচেন কিন্তু তার যথেষ্ট সমর্থনের জোগাড় করতে পারেননি। যেটা দেখাতে চেয়েচেন, তিনি নিজে তার সবটাই যে দেখেচেন এমন লক্ষণ অন্তত লেখা থেকে পাওয়া যাচ্চে না।

"গল্পের প্রথম নায়ক বিশ্বম্ভর তার ভগিনীপতি লালমোহনকে নিয়ে দেখা দিলে। লেখকের কাছ থেকে কোনো একটা বিশেষ অভিজ্ঞানপত্র নিয়ে আসে নি। তার থেকে ঠিক করে নিলুম আমাদের দেশে সচরাচর যাদের ভদ্রলোক ব'লে থাকে, দেখা হলেই যাদের ব'লে থাকি, এই যে মশাই, ভালো আছেন তো, এও তাদেরই দলের। অতএব চৌকিটা এগিয়ে দেবার পূর্ব্বে প্রশ্ন করবার দরকার নেই।

"আরো খানিকটা গিয়ে যে পরিচয়টুকু পেলুম তাতে জানা গেল, মদের আসরের উপকরণ জোগাতে আলস্য করেছিল ব'লে বিশ্বম্ভর তাড়া করাতে তার অসুস্থ গর্ভিনী স্ত্রী পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাতে মারা যায়। যাদের আমরা চৌকি এগিয়ে দিই তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ করেচে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অতএব বিশ্বম্ভরকে ভদ্দর শ্রেণীর লোক ব'লে মেনে নিতে এখনো সন্দেহের কারণ ঘটল না।

"তারপরে হঠাৎ শুনি বিশ্বম্ভর খেয়া পার হবার সময় 'উত্তম' নামধারিনী এক বেশ্যাকে দেখে মুগ্ধ হোলো। এটাও ভদ্দর লোকের লক্ষণে বাধে না। কিন্তু বেশ্যাকে যখন নিজের শিশু মেয়ের বিমাতা পরিচয় দিয়ে ঘরে তুলে নিলে এবং পাড়ার মেয়েরা প্রথমটা ছি ছি করেও অবশেষে একদিন সয়ে গেল তখন মনে ভাবনা এল এই যে, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ অপরাধ ভদ্দরলোকের পক্ষে মার্জ্জনীয় বটে তবু বেশ্যাবিবাহের মতো সমাজবিরুদ্ধ অপরাধ তো তেমন

চুপেচাপে সমাজে পার হয় না। তখন মনে হোলো, যে, নায়কের যে-পরিচয়ে এটা সম্ভব মনে হতে পারত গল্পের গোড়া থেকেই সেই বিশেষ পরিচয়টা সাজিয়ে রাখা উচিত ছিল। সেটা না হওয়াতে মানুষটার প্রতি নেহাৎ অবিচার করা হয়েচে। হয় তো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে লোকটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য – তবু আমরা যে ওকে কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারলুম বিশ্বম্ভরের দোহাই মেনে সেই তার প্রতি সন্দেহের সম্ভাবনাটুকু চুকিয়ে রাখা উচিত ছিল।"

পাঠকেরা লক্ষ ক'রে থাকবেন প্রায় এক কথার চুম্বকে নীরেন 'শেষ প্রশ্ন'র প্লটকে যেভাবে উড়িয়ে দিয়েছিল তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি সুবিচার করেছেন 'লঘুগুরু' সম্বন্ধে। আধুনিক সাহিত্যে রিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত উল্লেখযোগ্য :

"সাধুতাকে ভাবরসের বর্ণবাহুল্যে অতিমাত্রায় রাঙিয়ে তোলায় যত বড়ো অবাস্তবতা, লোকে যেটাকে অসাধু বলে তাকে সেন্টিমেন্টের রসপ্রলেপে অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল করে তুললে অবাস্তবতা তার চেয়ে বেশি বই কম হয় না। অথচ শেষোক্তটাকে রিয়ালিজ্‌মের নাম দিয়ে একালের সৌখীন আধুনিকতাকে খুসি করা অত্যন্ত সহজ। যেটা সহজ সেইতো আর্টের বিপদ ঘটায়। দেশাভিমানকে রচনায় প্রশ্রয় দিয়ে কালবিশেষে মোহ উৎপাদন করা সহজ এই জন্যেই দেশাভিমানী কাব্যে গল্পে আর্ট জিনিষটা প্রায়ই বেকার হয়ে থাকে। দুঃখে অপমানে উত্তমের প্রায়শ্চিত্তই এই আখ্যানের প্রধান বস্তু [।] এইজন্যেই উত্তমের চরিত্রকে সুস্পষ্ট সপ্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। বেশ্যাবৃত্তিতে যে-মেয়ে অভ্যস্ত সেও একদা যে-কোনো ঘরে ঢুকেই সদ্‌গৃহিনীর জায়গা নিতে পারে এই কথাটাকে স্বীকার করিয়ে নেবার ভার লেখক নিয়েচেন, কিন্তু ধরেই নিয়েচেন আমরা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করব। তারো কারণ আধুনিক রিয়ালিজ্‌মের সেন্টিমেন্টালিটিতে এই কথাটির বাজার দাম বাঁধা হয়ে গেছে।"

অনুবাদ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা : সদর ও খিড়কি

দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আরো একটি রচনা ছাপা হয়েছিল, এর একটু ইতিহাস আছে।

পরিচয়-এর জন্মকাহিনীতে একেবারে গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ দেখে নীরেন আমাকে কথায়-কথায় একদিন শুনিয়ে দিয়েছে যে,

রবীন্দ্রনাথকে জোর ক'রে টেনে আনা হয়েছে এই প্রসঙ্গে। এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, জোর আমার নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ তাঁকে ঠেকিয়ে রাখার মতন জোর পরিচয়-এর ছিল না। কিন্তু মজা এই যে পরিচয়-এর দ্বিতীয় সংখ্যার আসরে সদর দরজা দিয়ে দু'দু'বার তাঁকে টেনে আনার পরও নীরেনের মন উঠল না। তাই এমন একটি ষড়যন্ত্র সে পাকাল যার ফলে আর-একবার তাঁকে আসতে হ'ল খিড়কি দিয়ে।

ব্যাপারটি এই : শেলির 'ওয়ান ওয়ার্ড ইজ টু অফেন প্রোফেনড' কবিতাটির একটি বাংলা অনুবাদ ক'রে নীরেন পাঠিয়েছিল কবির কাছে তাঁর মন্তব্যের ও প্রয়োজনমতো সংশোধনের জন্যে ; রবীন্দ্রনাথ ক'রে পাঠালেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি অনুবাদ ; তাঁর মন্তব্য ও নীরেনের অনুবাদের সঙ্গে সেটি নিচে দেওয়া গেল :

নীরেন্দ্রনাথ রায়ের অনুবাদ

একটি কথা লোকে এত করে কলুষিত,
আমি তাহা করিব না আর ;
একটি অনুভূতি এত বৃথাই হেলিত,
তারে হেলা অযোগ্য তোমার ;
একটি আশা নিরাশার এ-হেন আত্মীয়,
বিবেচনা রোধে না ক তায় ;
তব অনুকম্পা মোর তারো চেয়ে প্রিয়,
প্রেম যদি দেয় অপরায়।

লোকে যারে প্রেম বলে নাহি দিব আমি,
করিবেনা তুমি কি গ্রহণ—
হৃদয়ের যে-অর্চনা ঊর্দ্ধলোকগামী,
দেবতাও করে না বর্জ্জন ;
দূর তারকার লাগি পতঙ্গের তৃষা,
ঊষা লাগি নিশার কামনা,
বেদনিত বিশ্ব হতে বহু দূরে মিশা
যে-মাধুরী তার আরাধনা ?

...রেলগাড়িতে বসে নাড়া খেতে খেতে শেলির সেই তর্জ্জমাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করচি। তুমি যে লাইন কটি দিয়েছিলে তার উপর ভূমিকম্প হয়ে গেল—তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেম কিন্তু তার ছন্দটির বহর খাটো বলে তার মধ্যে পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া গেল না। মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না। তাই প্রতিরূপ না হয়ে কতকটা অনুরূপ হয়েচে। মূল কবিতার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, এটা যে তারা জলের মতো বুঝবে এমন আশা নেই, কিন্তু সে জন্যে আমি বাংলা ভাষাই যে একমাত্র দায়ী তা মানতে পারিনে। বস্তুত প্রথম শ্লোকের শেষ দুটো লাইন ঠিক যেন জায়গা পায়নি—যেন আরেকজনের কেদারার হাতার উপরে বসেচে।—সময় আয়ত্তে নেই অতএব ইতি জুলাই ২০ (?) ১৯৩১।

একটি কথা বারেবারেই পেয়েছে লাঘবতা,
তাহারে লঘু করিবনাকো আর।
দিনে দিনেই সয়েছে হেলা একটি মনোব্যথা,
অবমাননা কোরোনা তুমি তার।
একটি আশা নৈরাশেরি নিকট আত্মীয়,
তারেও দলি' করিবে খান্‌খান্‌ ?
তোমার অনুকম্পাটুকু যেমন মোর প্রিয়,
তেমন নহে আর কাহারো দান।

প্রেমের নামে লোকে যা দেয় দিব না তাহা আমি,
লবে না কিগো আমার নিবেদন—
নিম্ন হতে যে-অর্চনা ঊর্দ্ধলোকগামী—
দেবতা যারে করেনা বর্জ্জন ;
তারার লাগি পতঙ্গ যে-আশায় মরে ঘুরে,
ঊষার লাগি নিশার যে-সাধনা—
পীড়িত এই মর্ত্ত্য হতে যা আছে বহুদূরে
তাহারি লাগি যে-পূজা আরাধনা ?

ঐ-সংখ্যায় শান্তিনিকেতনের এক তরুণ কবি 'কবি-পরিচয়' কবিতায় লিখে-ছিলেন :

শিথিল শেফালি ক্ষণে ক্ষণে ঝরি
সাজিখানি মোর দেয় ভরি' ভরি'
তোমার ছন্দে ঢালা
মনের কামনা বনের বাসনা কুড়ায়ে গেঁথেছি মালা।

কবিতাটিতে নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর স্বাক্ষরের পিছনে রবীন্দ্রনাথের শুধু প্রভাব নয়, হাত অত্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যায়।

মহারথী রথী ও পদাতি

দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩৩৮ সনের কার্তিক মাসের পরিচয় বেরিয়েছিল পুজোর প্রাক্কালে, তাই পরিচালকবর্গ চেষ্টা করেছিলেন 'বিশেষ' সংখ্যার মতো সাজিয়ে এটিকে পাঠকদের হাতে দিতে। তাঁদের চেষ্টা যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ প্রথম সংখ্যার প্রায় দেড়া বহরে আলোচ্য সংখ্যাটিতে এমন-সব বিশিষ্ট রচনার সমাবেশ তাঁরা করতে পেরেছিলেন, বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে এর আগে বা পরে যার তুলনা বিরল। পরিচয়-এর লেখকগোষ্ঠীতে এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হয়েছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত (রীতিবিচার: প্রবন্ধ), অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ভারতের ভাস্কর্য: সচিত্র প্রবন্ধ) ও দিলীপকুমার রায় (কবিতা ও পাঠকগোষ্ঠী)। প্রথম সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর কাছে পাওয়া গিয়েছিল শুধু একটি বীরবলী পত্র; দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'নীললোহিতের স্বয়ম্বর' গল্পটি বেরিয়েছিল তাঁর নিজের নামে। পুস্তক-পরিচয় বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু। এ ছাড়া ছিলেন পরিচয়-গোষ্ঠীর নিয়মিত লেখকেরা প্রায় সকলেই আর চারুচন্দ্র দত্ত। চারুবাবুর 'পুরানো কথা' আরম্ভ হয় এই সংখ্যা থেকে।

পরিচয়-এর এই সংখ্যায় আরেকটি নতুন লেখক হাতে-খড়ি করেন; তিনি ধূর্জটিবাবুর ছোটো ভাই বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিমলা তখন সবে পাস ক'রে বেরিয়েছে, কিন্তু বাংলা গদ্য রচনায় এখন তার যে-হাতযশ হয়েছে তার বেশ আভাস পাওয়া যায় 'প্রাচীন ভারতে নাগরক জীবন' নামে যে-প্রবন্ধটি ঐ-সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তাতে। বিমলাপ্রসাদের সঙ্গে ঐ-সব রথী মহারথীদের পিছু-পিছু সামান্য পদাতি হিসাবে আমিও প্রবেশ করেছিলাম

পরিচয়-এর লেখকগোষ্ঠীতে দুটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ ও একটি সমালোচনা লিখে। সমালোচ্য বইটি ছিল 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ'। সমালোচনার জন্যে বইটি আমরা প্রকাশকের কাছে পাই নি, নীরেনের পরামর্শে এটি কেনা হয়েছিল। এইরকম বই কিনে সমালোচনা আমরা প্রায়ই করতাম; নইলে নতুন কাগজকে বই জোগাবে কে?

তর্কে-বিতর্কে ব্যাঘ্রসংহারে হাত পাকালেও কাগজে-কলমে ঐরকম দুঃসাধ্য ব্যাপারে অগ্রসর হতে আমি যথেষ্ট আশঙ্কা বোধ করেছিলাম। নীরেনকে এই কথা জানিয়ে বললাম, "বইটির বিষয় গুরুতর, সুতরাং আমার মতন কম পড়াশোনা করা লোকের পক্ষে এ-বই হাতে নেওয়া ঠিক হবে না।" নীরেন অভয় দিয়ে বলল, "তাতে কি হয়েছে, তোমার রসবোধ আছে; তুমি একেবারে ফার্স্ট প্রিনসিপল্‌স্ থেকে লিখবে।" অভয় পেয়ে আমি লিখলাম:

"কোনো শিল্প সৃষ্টিকে বুঝিতে হইলে তাহাকে দেশকালের গণ্ডী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্তার মধ্যেই তাহার স্বরূপের সন্ধান করিতে হইবে।"

ফার্স্ট প্রিন্‌সিপল্‌স্-এর দৌড় আর কতদূর হবে? অতএব যার কাছে আমার এই প্রথম সাহিত্যিক রচনার প্রেরণা পেয়েছিলাম, তাকেই আজ এটি উপহার দিচ্ছি আমার স্বকীয় অধিকারের দাবি একেবারে লুপ্ত ক'রে। এই আটপাতা-ব্যাপী রচনাটিতে ভালোমন্দ আরো অনেক-কিছু লিখেছিলাম। আমার মোট বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার ছিল আমার একেবারে শেষ কথায়:

"সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ অতি দুঃসাহসিক কাজ। এই কাজে সাফল্যের জন্য যে-দুর্লভ শক্তির প্রয়োজন, বিশ্বপতিবাবুর রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায় না।... তাই তাঁহার লেখা পড়িবার সময় বারম্বার মনে হয় যেন গলদ্‌ঘর্ম গুরুমহাশয় নির্ব্বোধ ছাত্রগণকে দুরূহ পাঠ্য বুঝাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।"

রসচক্র

এইজাতীয় মধুর মন্তব্য প'ড়ে লেখক বা তাঁর বন্ধুবর্গের বিশেষ খুশি হওয়ার কথা নয়। বিশ্বপতিবাবু ও তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের তখন রসচক্র নামে একটি আড্ডা ছিল; এর দলপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কবিশেখর কালিদাস রায়ও ছিলেন ঐ-দলে। সমালোচনাটি ছাপা হবার অল্পদিন পরেই কবিশেখরের

লেখা একটি প্রতিবাদ পৌঁছল পরিচয়-সম্পাদকের হাতে। ছোটখাটো সাহিত্যিক রচনায় কবিশেখরের হাত পাকা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর বহুল প্রশংসা শুনেছি। এই প্রতিবাদটিও ছিল সুলিখিত ও মোটের উপর যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সমালোচনার সমালোচনা হিসাবে এটি একটু দীর্ঘ হয়ে পড়েছিল। তাই সম্পাদক তাঁকে অনুরোধ জানালেন লেখাটি কেটেছেঁটে খাটো ক'রে দিতে। কবিশেখর তা না-ক'রে অন্য-একটি কাগজে প্রতিবাদটি ছাপিয়েছিলেন।

রসচক্রের সঙ্গে পরিচয়-এর আর-একবার সংঘর্ষ ঘটেছিল কিছুকাল পরে। এই সংঘর্ষের দ্বৈত নায়ক ছিলেন একদিকে রসচক্রের গোষ্ঠীপতি সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অপরদিকে তরুণ লেখক নির্মলচন্দ্র মৈত্র। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নির্মল মৈত্রের আবির্ভাব হয়েছিল অল্পকালের জন্যে, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁর ধারাল কলমে পাঠকদের চমক লাগিয়েছিল। এখন তিনি সরকারি চাকরিতে ও বিচিত্র বিদ্যার অনুশীলনে এমনি বিজড়িত হয়েছেন যে শত চেষ্টাতেও তাঁর কাছে দু'লাইন লেখা আদায় করা অসম্ভব। নির্মল মৈত্রের লেখা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'রবি-দীপিতা' বইটির সমালোচনা ছাপা হয়েছিল চতুর্থ বর্ষের পরিচয়-এর চতুর্থ সংখ্যায়। ঐ-সমালোচনাটির দুটি অংশ এখানে উদ্ধার ক'রে দিচ্ছি। সুধীন দত্তের গুরুগম্ভীর বাক্য সংযোজনের সঙ্গে নির্মল মৈত্রের ক্ষুরধার ভাষা মিলিয়ে দেখলে পাঠকেরা বুঝবেন পরিচয়-এর সমালোচনা-নীতি ছিল কতখানি ব্যাপক। 'বলাকা'-প্রসঙ্গে 'রবি-দীপিতা'র লেখকের প্রকৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের ওপর সমালোচকের মন্তব্য :

"ভাষা এবং ভাবের এই অপ্রত্যাশিত উৎপাতে বিশৃঙ্খলবাক্ গ্রন্থকারের প্রকৃতিস্থতা বিষয়েই পাঠকের সন্দেহ জন্মে; সুতরাং প্রকৃতির অপ্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে ভাবিবার সময় অতি অল্পই থাকে।"

'রবি-দীপিতা'র সমালোচকের চরম মন্তব্য :

"'রবি-দীপিতা' শেষ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি আখ্যান মনে পড়িল। নীলাচলে থাকিবার সময় মহাপ্রভুকে কিছুকাল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্তব্যাখ্যা শুনিতে হইয়াছিল। সাতদিন শুনিয়াও তিনি ভালমন্দ কিছু বলেন নাই, ইহাতে বিস্মিত হইয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে :–

প্রভু কহে, 'মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি ;
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি।'...
প্রভু কহে 'সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল ;
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল।
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া ;
ভাষ্য কহ তুমি 'সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান ;
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন।'

–শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

"আমাদের কথাও তাই। আমরা ৺মোহিতচন্দ্র সেন, ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ্, ডক্টর টম্‌সন্, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সকলের রবীন্দ্র-ভাষ্যই কোনোরকমে বুঝিতে পারি, চেষ্টা করিলে হয়ত বা রবীন্দ্র-সূত্রও বুঝিতে পারি, কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভাষ্য আমাদের সাক্ষরতা সম্বন্ধেই সন্দেহ, চিত্তে বৈকল্য আনিয়া দেয়। প্রকাশকের তাগিদ্ ব্যতীত এ বই প্রকাশিত হইতে পারিতনা ইহাই সান্ত্বনা, সুতরাং প্রকাশকের 'নিবেদন' সার্থক।"

পরিচয়-এর পুস্তক-পরিচয় বিভাগে শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের লাঞ্ছনা এই প্রথম নয়। এর আগে প্রথম বৎসরের শেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'কবি-পরিচিতি' পুস্তকে অধ্যাপক মহাশয়ের 'বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের হাত থেকে বেরিয়েছিল :

"অধ্যাপক মহাশয় কাব্য-রসিক তাহাতে সন্দেহ নাই–শুধু দুঃখ হয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূতের বোঝা তিনি নামাইতে পারেন নাই। [প্রমথ] চৌধুরী মহাশয়ের মতো পাণ্ডিত্যের সহিত বৈদগ্ধ্যের সহজ সম্মিলন তিনি করিতে পারেন নাই, তাই প্রবন্ধটির পূর্ব্ব-অংশ সাহিত্য হিসাবে অপাঠ্য, এবং উত্তর-অংশ উপভোগ্য হইয়াছে অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তব্যের আকর্ষণে নয়–উদ্ধৃতাংশসমূহ ও তাহাদের অনুবাদের জন্য।"

ইংরাজিতে যাকে বলে ডিবাংকিং সেই কাজে তরুণ পরিচয় প্রবৃত্ত হয়েছিল অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে ও বেপরোয়াভাবে।

দল ও মত-নির্বিচারে বাংলা দেশের প্রবীণ ও নবীন, উদিত, উদীয়মান ও অনুদিত সকল লেখককে লেখকগোষ্ঠীতে টানবার চেষ্টা করেছিল পরিচয় ; এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক না-হওয়ার কারণ প্রথম থেকেই পরিচয়-এর সঙ্গে একাধিক নাম-করা লেখক ও তার ভক্তবৃন্দের ঐ-জাতীয় সংঘর্ষ।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়-এর বিরোধ কীভাবে হ'ল এর আগেই তার বিবরণ দিয়েছি। প্রথম সংখ্যায় নীরেনের 'শেষ প্রশ্ন' সমালোচনার ফলে যে-বিরোধের সূত্রপাত, দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যায় 'তরুণের বিদ্রোহ' ও 'স্বদেশ ও সাহিত্য' এই দুটি বইয়ের সমালোচনা ক'রে তা তীব্রতর করলেন জীবনময় রায়। এই দুটি প্রবন্ধের বইয়ের কথা আজ প্রায় লোকে ভুলে গিয়েছে। শরৎবাবু বইদুটিতে তাঁর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মতামত অসংকোচে ব্যক্ত করেছিলেন ; অসংকোচের মাত্রা একটু বেশিই হয়েছিল, ফলে অনেক সারবান কথার সঙ্গে তিনি এমন অনেক কথা না-ব'লে পারেন নি যা এখনকার এবং তখনকারও বিচারে অচল। জীবনবাবু এইসব সদুক্তি-কদুক্তি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যও যে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে করেছিলেন তার প্রমাণ নিচের এই উদ্ধৃতি :

"শরৎবাবুর মত লোকে যে তথ্য এবং তত্ত্ব, 'ফ্যাক্ট' এবং 'ট্রুথ'-এর গোলমাল করেছেন, দেখ্‌লে আশ্চর্য্য লাগে। আসল কথা রাগ হলে লোকের আর যুক্তি থাকে না—বিশেষতঃ রাগ প্রকাশের জায়গাটা যদি এমন মাটিতে হয় যেখানে লোকে যুক্তি বা ন্যায়ের চেয়ে বা সত্যের চেয়ে একঠা নাটকোচিত স্বদেশিয়ানার জন্য বাহবা দিয়ে থাকে। কতকগুলি অদ্ভুত কথার উপর ভিত্তি করে শরৎবাবু এই বিতণ্ডাটি প্রাণপণে খাড়া করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।"

কথাগুলির লক্ষ্য শরৎবাবুর 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি শরৎবাবু লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের প্রতিবাদে। ব্যাপারটির ইতিহাস এই : গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন যখন চরমে পৌঁচেছে তখন রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপ থেকে দেশে ফিরলেন তাঁর সার্বভৌম সহযোগিতার বাণী প্রচার ক'রে ; গান্ধিজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তীব্র মতবিরোধ প্রকাশ পেল রবীন্দ্রনাথের ঐ-সময়কার 'সত্যের আহ্বান', 'চরকা', 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি প্রবন্ধে। গান্ধিজী দেশবাসীকে বলেছিলেন বিদেশী শিক্ষাদীক্ষা বর্জন করতে।

তাই ভারতবর্ষময় 'বিদ্যাপীঠ' স্থাপন ক'রে চেষ্টা হয়েছিল জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচলনের। এই কাজে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন একসময়ে অগ্রণী, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এই প্রচেষ্টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার পরিচয় পেয়ে তার প্রতিবাদ না-ক'রে পারেন নি। এই প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর দিলেন শরৎচন্দ্র—'শিক্ষার মিলন'-এর উত্তর রচিত হ'ল তাঁর 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প না-ব'লে পারছি না। কলকাতায় ঐ-সময়ে যে-'বিদ্যাপীঠ' স্থাপিত হয় তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন কিরণশঙ্কর রায়। এই কাজে আশীর্বাদপ্রার্থী কিরণশঙ্করকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'নামটি ভালোই হয়েছে। বিদ্যাকে তোমরা সত্যি পিঠ প্রদর্শন করেছ।'

শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ'-এ প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মনের অন্তর্নিহিত রবীন্দ্র-বিরোধ। এই বিরোধ কয়েক বৎসর পরে একবার প্রকাশ পেয়েছিল 'তরুণ সাহিত্য' প্রসঙ্গে। তরুণ সাহিত্যে আদিরসের ছড়াছড়ি দেখে রবীন্দ্রনাথ দু'চারটি কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। নরেশবাবুর ক্ষিপ্ত হবার কারণ ছিল ; এই কারণ ভূরি-ভূরি পাওয়া যায় তাঁর তখনকার একাধিক নভেলে। শরৎবাবু একরকম অকারণেই নিজের গায়ে পেতে নিলেন তরুণদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। এ হ'ল একদিক। আর-একদিকে নিজের চোখে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎবাবুর ভক্তির প্রাবল্যের একাধিক নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত আবেগ রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে ছিল বিরল।

মোট কথা, পরিচয় একাধিক দলের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি না-ক'রে পারে নি। যে-পত্রিকার প্রধান অঙ্গ সমালোচনা, সে-পত্রিকার পক্ষে এইজাতীয় বিরোধ এড়িয়ে চলা একরকম অসম্ভব ছিল। পরিচালকদলের সাধ্যমতো চেষ্টা ছিল পরিচয়-এর সমালোচনা যাতে একেবারে পক্ষপাতশূন্য হয়। এ-বিষয়ে লেখকদের ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, নির্বাচিত রচনায় সম্পাদক কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করতেন। আমাদের সকলেরই মত ছিল দরকার হলে কাউকেই ছেড়ে কথা বলব না। এই নীতির একটিমাত্র ব্যতিক্রম আমরা মেনে নিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে : Others abide our question, thou art free। আসল কথা, জলে বাস ক'রে কুমিরের সঙ্গে কলহটা খুব সমীচীন হয় না। নীরেন নির্ভীক, তাই এই নীতির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল

সে একলা। নিরপেক্ষ সমালোচনা-নীতির অনুসরণ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল প্রায় ঘরোয়া ঝগড়া।

নতুন লেখকের সন্ধানে পরিচয়-এর পরিচালকদের উৎসাহের অন্ত ছিল না, তেমনি অক্লান্ত উদ্যমে তাঁরা চেষ্টা করতেন নাম-করা লেখকদের টেনে এনে পরিচয়-এর আসর গরম করতে। যথাক্রমে আমাদের আড্ডায় আবির্ভাব হ'ল বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কল্লোল-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের। প্রথম সংখ্যাতেই বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা যে ছাপা হয়েছিল তা আগেই লিখেছি। বুদ্ধদেব বসুর দুটি বইয়ের সমালোচনা ক'রে গিরিজাবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে বৌদ্ধ খেতাব লাভ করলেন। পরিচয়-এর পরিচালকমহলে তাঁকে ধ'রে নেওয়া হ'ল বৌদ্ধ (রবীন্দ্রনাথের অর্থে)-সাহিত্যবিশেষজ্ঞ ব'লে। সুতরাং ঐ-গোষ্ঠীর অন্যান্য বইয়ের সমালোচনার ভার একাধিকবার গিরিজা-বাবুকে দেওয়া হয়েছিল। পুরনো পরিচয় উল্টে দেখছি প্রথম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় গিরিজাবাবু সমালোচনা করেছিলেন তিনটি বইয়ের: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'অসমাপিকা' ও বুদ্ধদেব বসুর 'অকর্মণ্য'।

এরপর চতুর্থ সংখ্যায় বোধহয় পাঠকদের মুখবদলের জন্য বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই চারজন লেখকের 'রেখাচিত্র', 'ইতি', 'পুতুল ও প্রতিমা' ও 'বধূবরণ' যথাক্রমে এই চারটি বইয়ের সমালোচনা করলেন সুধীরকুমার চৌধুরী। তারপর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় দেখছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'র সমালোচনার নিচে আবার 'গিরিজাপতি ভট্টাচার্য' স্বাক্ষর। "কে কবে পৃথিবীকে সূর্য্যের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল আর তাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—সেই থেকে ব্যর্থতা সর্ব্বময়;—এই হ'ল প্রথমার নিদারুণ বিলাপের প্রধান কারণ।...কিন্তু হাসানো যেমন সোজা কাঁদানো তেমন নয়; কেননা কাঁদাতে হ'লে মানুষের অন্তঃস্থলে পৌঁছাতে হয়। প্রথমার কবিতা সেই অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যায় নি..." এইজাতীয় সমালোচনা প'ড়ে লেখকের বা তাঁর বন্ধুদের খুশি হবার কথা নয়। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটেছিল এই সমালোচনাটি ছাপা হবার আগেই।

ব্যাপারটি সংক্ষেপে হ'ল এই। বুদ্ধদেববাবু সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এই 'প্রথমা' কিংবা তাঁদের গোষ্ঠীর কোন লেখকের লেখা অপর কোন একটি বইয়ের সমালোচনার ভার তাঁদেরই একজনের ওপর দিতে। যতদূর মনে পড়ে, ঐ-বইটি 'প্রথমা'। সম্পাদক স্বভাবতই তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, অন্য যোগ্য সমালোচক না-থাকলে হয়তো এ-অনুরোধ তিনি রাখতে পারতেন, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে লোকাভাব ঘটে নি সে-ক্ষেত্রে দলের লোকের হাতে লেখা নিজেদের বইয়ের সমালোচনা নিরপেক্ষ হলেও সুশোভন হবে না। এ নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি। এরপর পরিচয়-এর আড্ডা ও লেখকগোষ্ঠী এই উভয় আসর থেকে বুদ্ধদেববাবু সবান্ধবে প্রস্থান করলেন।

এই বিরোধ ঘটবার আগেই প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩৩৯ সালের বৈশাখের পরিচয়-এ ছাপা হয় তাঁর 'স্বপ্নদূত' কবিতাটি।

হে স্বপ্নের নীরব দেবতা!
চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন নেপথ্যের অভিনয় করো প্রযোজন।
আঁধার-রহস্য-'পরে তুমি ফেলো আলোকের শিখা,
নিরুদ্ধ বাসনা সব মায়া-স্পর্শে করো উন্মোচন;
যখন মনের কথা বলিতে হৃদয়ে লাগে ব্যথা,
তীব্র আত্ম-নিপীড়নে যন্ত্রণায় কাটে জাগরণ—
তুমি আন মুক্তির বারতা।

আজি মোর তোমার সকাশে
একটি প্রার্থনা আছে। রজনীর অন্তিম প্রহরে,
অনেক চেষ্টায় যবে তন্দ্রায় জড়াবে আঁখি তা'র—
মোর মূর্তি ধরে' তুমি যাবে তার শয়ন-শিয়রে,
দেখিবে সন্ধান করে তার অন্তরের অন্ধকার।
—রাত্রি ভোর হ'য়ে আসে; চুলগুলি চঞ্চল বাতাসে
এলোমেলো হ'য়ে যায়, নড়ে' ওঠে ঠোঁটের কিনার।
তুমি গিয়া দাঁড়াইয়ো পাশে।

কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয় ডি. জি. রসেটির 'Love's Nocturne'। বুদ্ধদেববাবু অনুবাদ করেন নি, তবে সম্ভবত রসেটির ঐ-কবিতাই তাঁর 'স্বপ্নদূত' কবিতার প্রেরণা।

সদল বুদ্ধদেব বসুর প্রস্থানে পরিচয়-এর ক্ষতি হয়েছিল কিনা সে-কথা আলোচনা ক'রে আজ লাভ নেই। তবে বুদ্ধদেববাবুরা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই খুশি হতাম। যাই হোক, পরিচয়-এর আসর তখন বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে; আমাদের শুক্রবারের আড্ডা বসছে মাসে একবার ক'রে বালিগঞ্জে প্রবোধ বাগচীর নতুন বাড়িতে। দু-একবার আমার বাড়িতেও বসেছে। চারুবাবুর নিমন্ত্রণে আমরা যেতাম তাঁর হাজরা রোডের বাড়িতে। মুখের কথায় বা লেখায় মজলিশ জমাতে তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। পরিচয় যেমন কাউকে ছেড়ে কথা কয় নি, তেমনি বাংলা দেশের পাঠক ও সমালোচকেরা পরিচয়কে ছেড়ে কথা বলেন নি। এর ব্যতিক্রম ছিল কেবল চারুবাবুর 'পুরানো কথা'। সম্প্রতি মাত্র উনআশি বছর বয়সে পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে চারুবাবুর দেহাবসানের সঙ্গে মনে হয় যেন বাংলার মজলিশী যুগের অবসান ঘটল। পাঁচজনের সভা জমাতে যিনি ওস্তাদ ছিলেন তিনি পাঁচজনের সঙ্গে না-জড়িয়ে স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবি রাখেন। এই পরিচয় তাই মুলতুবি রইল আগামী সংখ্যার জন্য।

সেকালের ইংরেজিনবিশ সমাজে প্রচলিত বচন ছিল "সিভিলিয়ানস্ আর সিভিল ভিলেনস্ অ্যাণ্ড লইয়ারস্ আর লায়ারস্" (সিভিলিয়ানরা সব ভদ্রবেশী শয়তান আর আইনজীবী মাত্রেই মিথ্যাবাদী)। কিন্তু তবু সিভিলিয়ানদের খাতিরের অন্ত ছিল না, কেননা তাঁরাই ছিলেন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তা। দেশী লোক সিভিলিয়ান হলে তাঁরা প্রায় সাহেবজাতের সমকক্ষ গণ্য হতেন আর খাতিরও পেতেন সেই অনুপাতে। কিন্তু তাঁদের কেউ শয়তান মনে করত না; দেশের লোক সত্যিই তাঁদের শ্রদ্ধা করত একেবারে অন্তর থেকে; তার কারণ, সেকালের দেশী সিভিলিয়ান প্রত্যেকেই প্রায় ছিলেন সত্যিকারের শ্রদ্ধেয় লোক।

কর্মজীবনে চারুচন্দ্র দত্ত ছিলেন সেই পুরনো ঐতিহ্যের অধিকারী। সিভিলিয়ানগিরি করেছিলেন তিনি পুরো সিভিলিয়ানী রীতিতেই, কিন্তু নিজের মনুষ্যত্বের মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ না-ক'রে; সামান্য মানুষ যারা, তাদের সামান্য মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ শুষে নেয় চাকরি। চারুবাবু অসামান্য ছিলেন, চাকরিকে ছাড়িয়ে তাঁর ব্যাপক মনুষ্যত্ব অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই চাকরির গোড়ার দিকেই অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন তখনকার বিপ্লবী দলে। সরকারি চাকরির ছদ্মবেশে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের বিপ্লবী প্রচেষ্টার তিনি

হলেন যোগসূত্র। এরপর মানিকতলার বাগানবাড়িতে যখন সদল অরবিন্দ ধরা পড়লেন, তখন সাক্ষাৎ প্রমাণাভাবে পুলিসের কবল থেকে বাঁচলেও তাঁর চাকরি নিয়ে হ'ল বিষম টানাটানি। বছর-কয়েক ঝুলে থাকার পর অতিকষ্টে তিনি আবার সিভিলিয়ানী পদে বাহাল হয়েছিলেন। কিন্তু খুঁটিনাটি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর নটখটির অন্ত ছিল না। এইসব ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর 'পুরানো কথা'য়। বাংলায় এইরকম সার্থক আত্মজীবনী বিরল। পাঠকসমাজে পরিচয়-এর কদর অনেকখানি বাড়িয়েছিল চারুবাবুর 'পুরানো কথা'। এমন স্বচ্ছন্দ, সবল ও সরস চলতি বাংলা চারুবাবুর আগে বা পরে ক'জনই-বা লিখেছেন? 'পুরানো কথা'র প্রথম কিস্তি বেরিয়েছিল পরিচয়-এর দ্বিতীয় সংখ্যায়, আগেই তা বলেছি। মুগ্ধ হয়ে আমরা পড়লাম:

"উত্তরাধিকার সূত্রে আমি বর্দ্ধমান জেলার লোক।… এই বিখ্যাত জেলার এক প্রান্তে দামোদর পারে অতি ক্ষুদ্র এক গ্রামে আমার বাড়ী।… পিতামহ নিরীহ লোক ছিলেন, তবে পুরানো বাড়ীর দেউড়ীর চালায় লুকান খানেক মরচে-পড়া সড়কীর মাথা একবার ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। এক সময় সেগুলো ব্যবহারে লাগত মনে করলে দোষ হয় না। আমরা শাক্তবংশ বটে কিন্তু সড়কী দিয়ে ত আর পাঁঠাবলি হয় না।"

পিতৃকুলের সঙ্গে টেক্কা দিত মাতৃকুল।

"আমার মামার বাড়ী রায়না। গ্রামটা এক সময়ে সকলেই জানত, তবে ডাকাত রায়না এই নামে। বাঙ্গলা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ডাকাইতে-জমীদারে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। ভব্য শিষ্ট আমরা একথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই; কিন্তু কথাটা সত্য। আমার মাতামহকে ছেলেবেলায় দেখেছি। সে কালের গ্রাম্য জমীদারের দোষগুণ সবই তাঁ'তে ছিল, কিন্তু মানুষের মত মানুষ ছিলেন। …দাদামশায়ের প্রধান কাজ ছিল প্রতিবেশী জমীদারদের সঙ্গে দাঙ্গা করা।… এই রকম কোনও শুভলগ্নে তাঁর কুকরীদেবীর নররক্ত পান ঘটে থাকবে। একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি যে আমার মাতুলকুল বৈষ্ণব। কিন্তু তা'তে কাজ বাধত না। বৌদ্ধ হিন্দু, শাক্ত বৈষ্ণব, আর্য্য অনার্য্যের মহা সমন্বয়ের ক্ষেত্র এই বাঙ্গলা দেশ।"

চারুবাবুর বাবা কালিকাদাস দত্ত ডেপুটি চাকরিতে ছিলেন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, নবীন সেন প্রভৃতির সহযোগী। কৃতিত্বের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে চাকরি ক'রে তিনি পুরস্কার পেলেন কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ানি। চারুচন্দ্রের জন্ম ঐ-রাজ্যেই।

"আর দেশের কথা বলব না। ক্রমশঃ প্যাক্স্ ব্রিটানিকা ও ম্যালেরিয়া দেশে জমী নিয়ে বসল। আমার বাবা গ্রাম ছেড়ে ইংরেজী শিক্ষা ও চাকরীর পথে বাহির হ'য়ে পড়লেন। আমারও দেশে জন্ম নেওয়া হ'ল না।... জন্মালেম গিয়ে সুদূর উত্তরে হিমালয়ের কোলে এক স্বাধীন রাজ্যের মন্ত্রী-মহাশয়ের ঘরে। স্বাধীন রাজ্য শুনে কেউ হাসবেন না যেন। স্বাধীনতা জিনিসটা আপেক্ষিক। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভাও দুই মধুপানের পর মনিবে গোলামে কোনও তফাৎ থাকে না, দুজনেই সমান স্বাধীন।"

এই খেলাঘরের রাজ্যের তখনকার রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ সম্বন্ধে চারুবাবুর অপরিসীম শ্রদ্ধা যে পরিণত বয়সেও অক্ষুণ্ণ ছিল 'পুরানো কথা'য় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ আমাদের মহারাজকে দেখলে স্বতঃই মনে হ'ত সেকালের কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, কোশলের রাজাদের কথা।" এই মহারাজ নাকি গর্ব ক'রে বলতেন "আমি কোচ, আমি অনার্য, আমার আর্য্য ব'লে গণ্য হবার কোনো সাধ্য নেই।" এই কথা উল্লেখ ক'রে চারুবাবু লিখেছেন:

"ভাই বাঙ্গালী, তুমি আর্য্য নও, তুমি অনার্য্য, তোমার দেশে এলে আর্য্যদের জাত যেত। তুমি কুরুপাণ্ডবদের বংশধর ব'লে নিজেকে জাহির ক'রে হাস্যাস্পদ হয়ো না। তোমার পূর্ব্বপুরুষ নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত যারা সমুদ্রগর্ভ হ'তে দক্ষিণবঙ্গ উদ্ধার ক'রে তোমার দেশের শস্যশ্যামলা নাম সার্থক ক'রেছে। তোমার পূর্ব্বজ গারো, কোচ, মেচ, যারা গভীর জঙ্গল কেটে উত্তরবঙ্গ মানুষের বাসের উপযোগী ক'রেছে। তোমার ডিঙ্গা, ময়ূরপঙ্খী নাও নিয়ে তোমার যে মাল্লারা সাগরে পাড়ি দিত তারা তোমার পূর্ব্বপুরুষ, ভীম অর্জ্জুন নয়। সত্যি বল্‌তে কি, তোমার অতীতের দিকে চাওয়া বিড়ম্বনা, তোমার ইতিহাস বর্ত্তমানে ও সম্মুখে। রাজা রামমোহনের শতাব্দীতে তুমি দেখিয়েছ তোমার কদর। এই শতাব্দী আরও তোমার কত কীর্ত্তি দেখবে। ভয় নেই। পাজীপুঁথিগুলো ছিঁড়ে ফেলে কেবল এগিয়ে চল।"

চারুবাবুর মন ছিল প্রায় পুরোপুরি রোম্যান্টিক, কিন্তু উপরের ঐ-উদ্ধৃতিতে আভাস পাওয়া যায় তাঁর বলিষ্ঠ বাস্তবতা বোধের। চারুবাবুর কথায় যাঁরা সায় দেবেন না, তাঁদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাঁর উক্তি:

"কেন যে এই গরীব বাঙ্গলা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন মন্দিরের শোভা আমাদের চোখে পড়ে না, কেন যে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলার কোন গুণই আমরা

দেখ্‌তে পাই না, কি বুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে আজ আমরা মাথায় সাদা টুপী প'রে, হিন্দী বল্‌তে বল্‌তে, দেশ উদ্ধার কর্‌তে সকলের পেছনে চলেছি, তা বোঝা ভারী শক্ত।"

দেশ উদ্ধারের পালা শেষ হয়েছে, কিন্তু হিন্দীর ধুম চলেছে বেড়ে। অবশ্য হিন্দী ভাষা চারুবাবুর জিভে আটকাত না। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় প্রায় সাত-আটটি ভাষায় তিনি ছিলেন দক্ষ। বোম্বাই প্রদেশে হাকিমির কাজে অনেকসময়ে স্থানীয় উপভাষায় তাঁকে সাক্ষ্য নিতে হ'ত। এ-সব ক্ষেত্রে দোভাষীর সাহায্য নেওয়াই প্রচলিত বিধান। কিন্তু চারুবাবু অল্পক্ষণের মধ্যেই নতুন-নতুন উপভাষা আয়ত্ত ক'রে ফেলতেন ব'লে দোভাষীর ওপর কদাচিৎ তাঁকে নির্ভর করতে হ'ত।

চারুবাবু নিজে যেমন মেধাবী ছিলেন তেমনি তাঁর জুটেছিল মেধাবী সতীর্থ। এঁদের মধ্যে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে সহপাঠী ছিলেন: ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, চারুচন্দ্র ঘোষ, প্রভাস-চন্দ্র মিত্র, জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী। জ্ঞানবাবু ছাড়া এঁরা সকলেই 'স্যার' উপাধি লাভ করেছিলেন। এঁরা সবাই গত হয়েছেন, কিন্তু দলের তিনটি রত্ন এখনো জীবিত, ডক্টর দ্বারকানাথ মিত্র, ডাক্তার মণীন্দ্রনাথ বসু (বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ) ও শ্রীযুক্ত সি. কে. সরকার।

কুচবিহারে বাল্যকাল কাটানোর ফলে চারুবাবু অতি অল্পবয়সেই ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্পর্শে আসেন, কেননা ঐ-মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ের বিয়ের ফলে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছেছিল এই প্রাচীন কোচ রাজ্যে। চারুচন্দ্রের বাবা পৌত্তলিকতা বর্জন করেছিলেন। পিতার প্রভাব পুত্রের ওপর কতটা বর্তেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে:

"একদিনকার কথা মনে আছে, কলিকাতা থেকে এক সুগায়ক এসেছিলেন, মজলিশ ক'রে সবাই গান শুনতে বসেছিলেন, বড় ভাল লাগছিল। হঠাৎ তিনি গান ধরলেন, 'এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজায়ে বাঁশরী'। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে গেলাম। সংস্কার এই রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।"

এই ব্রাহ্ম প্রভাবের পাশাপাশি ও খানিকটা প্রতি-প্রভাব হিসাবে ছিল জাতীয় গৌরব। তার জোর ছিল আরো অনেক বেশি।

"সেই সামান্য অস্পষ্ট আগুনের ফিন্‌কি একদিন ভীষণ দাবানল হ'য়ে কৈলাসে বুড়ো শিবের জটা গলিয়ে দেশের সপ্তসিন্ধুকে বানে ভাসাবে, তা তখন

কে জানত? একটা বিষয়ে আমাদের মনে বড় ধোঁকা লেগেছিল। এই ঋষিতুল্য কেশবচন্দ্র, যিনি একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে দেন, তাঁর সমাজ-মন্দির খৃষ্টানি গির্জের মত কেন গড়া হ'ল, ভেতরের পূজা-পদ্ধতিই বা মোটামুটি খৃষ্টানি চালের কেন করা হ'ল? মহর্ষির 'খৃষ্ট বিভীষিকা'র কথা তখন জানতাম না, কিন্তু জিনিসটা ঠিক হজম হ'ল না।"

ব্রাহ্মসমাজের এত কাছে এসেও চারুবাবু ও সেইসময়কার উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আরো অনেকে কেন ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি, তার কারণ তখনকার ব্রাহ্মসমাজের এই বিজাতীয়তা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই ত্রুটি অনেকটা শুধরে নিয়েছিল, কিন্তু মধ্যবিত্তের মন জাতীয় গৌরবের প্রভাবে তখন অনেকটা আচ্ছন্ন হয়েছে নব্য হিন্দুয়ানিতে। জাতীয় আন্দোলনে ব্রাহ্ম নেতারা যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সমগ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে তাঁরা টানতে পারেন নি সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের প্রচেষ্টায়। পরাধীন দেশের নানা পরস্পর-বিরোধী প্রভাবের সমন্বয় করার মতন মতবাদের জন্ম তখনো হয় নি, ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় হ'ল দিশাহারা।

"কলকাতা বাঙ্গালী সমাজ তখন বঙ্গবাসীর দল আর সঞ্জীবনীর দল, এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আর এঁদের পরস্পরের বিদ্বেষের দরুন কলকাতায় প্রায় সকল কাজই পণ্ড হত। এই ঝগড়ার বিষ কলেজে মেসে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বেনেটোলার এক মেসে দোলের দিন মাথা কাটাকাটি পর্য্যন্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতনী আর হিউগেনোদের অনেক কাটাকাটি হয়ে যাওয়ার পরে যেমন এক পলিতিক দল উঠে আস্তে আস্তে দুরকমেরই গোঁড়াদের হটিয়ে দিলে, আমাদের কলকাতাতেও তেমনি এক পলিতিক দল হিতবাদী কাগজ বের করলেন। তাঁরা অবতীর্ণ হলেন দুই গোঁড়া দলকেই 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ' শোনাবার জন্যে। ক্রমে এই পলিতিক দলই বাঙ্গলার আকাশ ছেয়ে ফেললে। তাঁদের সামনে গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ দুই রণে ভঙ্গ দিলেন। অবশ্য তাঁরা তখন আর হিতবাদীর দল রইলেন না, কারণ হিতবাদী প্রথম দুই একজন সম্পাদকের পরেই সনাতনীর ধ্বজা উড়ালেন। যাকে বিপ্লবপন্থী বলা যায়, এরকম কেউ আমাদের সময়ে ছিল না। যারা ইংরেজকে শত্রু ভাবত তারাও বিক্টোরিয়াকে মহারাণী ব'লে মানত।... আমাদের ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক হাওয়া মৃদুমন্দ গতিতেই বইত। বিক্টোরীয় যুগের ভব্যতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যায় নেই।"

খাঁটি বাঙালি ছিলেন চারুবাবু মনে-মনে, কিন্তু তখনকার দিনের আরো অনেকের মতন ভিক্টোরীয় ভব্যতার প্রভাবে তিনি আচার-ব্যবহারে হয়েছিলেন প্রায় খাঁটি সাহেবের মতনই। এরপর বিলেতে গিয়ে সিভিলিয়ানের ছাপ পেয়ে ভিক্টোরীয় ভব্যতার প্রভাব আরো পাকা হ'ল। অবশ্য তিনি স্বেচ্ছায় সিভিলিয়ানী বরণ করেন নি — করেছিলেন অভিভাবকবর্গের চাপে। কিশোর চারুচন্দ্রের মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্রেজিল গিয়ে ব্রেজিলীয় সৈন্যবাহিনীর কর্নেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, কেননা তখন ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যদলে বাঙালির প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন ছিল অন্যরকম। চারুচন্দ্র সুরেশ বিশ্বাসের নামে চিঠি লিখলেন তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে ও বিলাত রওনা হবার সময় ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য যে-ক'টি টাকা পেয়েছিলেন তা সযত্নে বাঁচিয়ে রাখলেন ব্রেজিল পাড়ি দেবার পাথেয়-স্বরূপ। কিন্তু অল্পদিন পরে উত্তর এল সুরেশ বিশ্বাস আর ইহজগতে নেই। অভিভাবকদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। চারুবাবু মনোনিবেশ করলেন সিভিলিয়ানী পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নে। তারই পাশাপাশি চলল রাজনীতির চর্চা, স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায় প্রবলতর উৎসাহে। এইসময়ে নাম-করা ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ ঘটে। সার ডিনস ওয়াচ্চার সঙ্গে তখন বিলেতে গিয়েছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও গোখলে। বিলেত-প্রবাসী তরুণ ভারতীয় ছাত্রেরা উৎসাহে এঁদের অভ্যর্থনা করল।

"ওয়াচ্চা ও সুরেনবাবু ছিলেন বিচক্ষণ নেতা। তাঁরা আমাদের মতন অর্বাচীন বালকের দলকেও অবজ্ঞা হেনস্তা করেন নেই। কিন্তু গোখলে নিজে তখন ছেলেমানুষ, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাদিকে বিদ্রূপবাণে এমনই জর্জ্জরিত করেছিলেন যে আমরা আর বড় একটা তাঁর কাছে ঘেঁসি নেই। আমার সব চেয়ে খারাপ লেগেছিল তাঁর বাঙ্গালীর উপর, কি বলব, হিংসা না বিদ্বেষ? আমি ভুলি নেই। বহুকাল পরে যখন সুযোগ পেয়েছিলাম, নব ভারতের ঋণ পরিশোধ করেছিলাম।"

এই ঋণ-পরিশোধের বৃত্তান্ত ঠিক জানি না। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে-অধিবেশন হয়, তারই অভ্যর্থনা সমিতির অনুরোধে চারুবাবু 'কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন' সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি একশো পাতার বই লেখেন। অনুমান হয় গোখলে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই বইটিতে তিনি ব'লে গিয়েছেন। অনুমান — কেননা বইটি দেখার সুযোগ আমার হয় নি। সুতরাং

গোখলের ওপর চারুবাবুর রাগ সঙ্গত কি অসঙ্গত তা বলবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু পাঠকদের প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে লর্ড কার্জন যখন 'মনুমেন্টেল লায়ার' (বিপুল মিথ্যাবাদী) ব'লে বাঙালিদের গালি দিয়েছিলেন তখন ইম্পিরিয়্যাল কাউন্সিল-এ তার সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন এই গোখলে।

ভিক্টোরীয় ভব্যতা ইংরেজি-শেখা ভারতবাসীর শুধু আচার-ব্যবহারের ব্যাপার ছিল না, একেবারে অন্তরে প্রবেশ করেছিল। ১৮৯৭ সাল ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসবের বছর। লণ্ডনের ভারতসভার পক্ষ থেকে মহারানীকে মানপত্র দেবার আয়োজন চলছিল। সিভিল সার্ভিসের উমেদার তরুণ চারুচন্দ্র ও তাঁর লণ্ডন-প্রবাসী বন্ধুরা মিলে তাতে প্রবল আপত্তি জানালেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। দাদাভাই নৌরজি তখন লণ্ডনে ছিলেন, তিনি এই হঠকারী তরুণসংঘকে আমলই দিলেন না।

"এই সব ব্যাপারে মহাত্মা দাদাভাই যে আমাদের উপর সত্যি অসন্তুষ্ট হতেন তা আমরা মনে করতাম না। তবে তিনি কংগ্রেস দলের কর্তা, আর কংগ্রেসের ধর্ম ত ছিল ভিক্ষাবৃত্তি, তাই প্রকাশ্যে তিনি আমাদের কোন আস্কারা দিতেন না। একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলাম। আমাদের সমস্ত বক্তব্য তিনি শুনলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা আমাদের মতন দুটি অর্বাচীন বালককে নিয়ে তিনি কাটালেন। এক মুহূর্তের জন্যও হাসলেন না, ঠাট্টা করলেন না। আমরা মোহিত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। এটা স্থির বুঝে এলাম যে তিনি যথার্থ সারা ভারতের নেতা, একা কংগ্রেসের নয়।"

সুরেন বাঁড়ুজ্যে তো "স্পষ্টই আদেশ দিয়ে এসেছিলেন যেন আমরা দেশে ফিরে একটা Extremist (গরম) দল গড়ে তুলি।" সেইসঙ্গে সুরেনবাবু এই কথাও বলেছিলেন প্রকাশ্যে তিনি ওদের গালাগাল দেবেন। দেশে ফেরার আগেই পরবর্তী ভারতীয় গরম দলের এই তরুণ অগ্রদূতেরা একটা ছোট-খাটো গরম দল গ'ড়ে তার নাম দিলেন 'নবভারত সভা'। এই দলের মুরুব্বিদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত আইরিশ সিন ফেন দলের নেতা হাতকাটা, দশবছর জেল-খাটা মাইকেল ডেভিট্, সোশ্যালিস্টদের নায়ক হাইণ্ডম্যান, মজুর-আন্দোলনের পুরোধা দুর্দ্ধান্ত টম্ ম্যান্। ডেভিট্ প্রস্তাব করলেন যে বছরে আট লাখ টাকা পেলে বিলিতি পার্লামেন্টের আটটা আইরিশ আসনে

তাঁরা আটজন ভারতবাসীকে বসাতে রাজি, কেননা আইরিশ দলের অর্থাভাব ছিল দারুণ। এতে আইরিশ নেতা জন রেডমণ্ড পর্যন্ত নাকি সায় দিয়েছিলেন এই শর্তে যে যা-কিছু বিলিতি ব্যাপার তাতে এই আটজন ভারতীয় প্রতিনিধি আইরিশ পার্টির হুকুম মেনে চলবেন, কিন্তু ভারত-সংক্রান্ত সব বিষয়ে তাঁরা হাত তুলবেন ভারতীয়দের পক্ষে। "এ কথায় কিন্তু দাদাভাই কানই দিলেন না। বললেন, 'ও রকম কূটনীতিতে ভারতের উপকার হবে না।' বোধ হয় অভদ্রও বলেছিলেন। তখন বিক্টোরীয় ইংলণ্ডের ভব্যতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকেছে কি না!"

অন্তরে এই ভব্যতা ও বাইরে সিভিলিয়ানীর ভেক ধারণ ক'রে যুবক চারুচন্দ্র দেশে ফিরলেন ১৮৯৯ সালে। 'পুরানো কথা' বই হয়ে বেরিয়েছে-এই পর্যন্ত। এর পরেও 'পুরানো কথা' পরিচয়-এ অনেকদিন ছাপা হয়েছিল। শেষ কিস্তি বেরোয় ১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাসে।

সিভিলিয়ান হওয়া ছিল কপালের লিখন, তাই প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বাপের সুপুত্তুর হয়ে চারুবাবু দেশে ফিরে চাকরি শুরু করলেন। তিনি শিথিল প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তাই রাজকার্যে শৈথিল্য ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তবু সরকারের সুপুত্তুর যে তিনি হতে পারেন নি, সে-কথা আগেই লিখেছি।—'পুরানো কথা'র উত্তর-অংশে তাঁর সিভিলিয়ানী ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কাহিনী আছে। পেনসন অর্জনের জন্যে যতখানি দরকার তার একদিন বেশি চাকরি তিনি করেন নি। ১৯২৫ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। এইসময়ে তাঁর ভাই ও তার অল্পদিন পরে একমাত্র কন্যা মারা যান। দারুণ পারিবারিক শোকের ধাক্কায় তিনি কাবু হলেও একেবারে নুয়ে পড়েন নি। ক্রমে এই ধাক্কা সামলে নিয়ে তিনি শুরু করলেন তাঁর সাহিত্যজীবন। পরিচয়-এ 'পুরানো কথা' ছাড়া তাঁর কয়েকটি সমালোচনা ও দু'একটি গল্প বেরিয়েছিল। তাঁর ছাপা বই বেরিয়েছিল চারটি—'কৃষ্ণরাও', 'মায়া', 'দে'বাবু', 'দুনিয়াদারী'। পরিচয় দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ অর্থাৎ ১৩৪০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'কৃষ্ণরাও' বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"বাংলার কথা-সাহিত্য দেখলেই বোঝা যায় বাঙালীর 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ'।

"এমন সময় চারুচন্দ্র দত্তের 'কৃষ্ণরাও' বইখানা হাতে এল। লেখক মজলিষি

মানুষ, তার উপরে দূরপ্রদেশের অভিজ্ঞতায় তাঁর স্মৃতি-ভাণ্ডার ভরা। যা দেহে-মনে তার মধ্যে সমস্ত মন দিয়ে প্রবেশ করেছেন। বোঝা যায় মারাঠায় তিনি ঘরের লোক ছিলেন। এই ঘরের লোক হবার শক্তি সকলের নেই। যাদের আছে তাদের কথা বলবার শক্তি কম। চারু বাবু বিদেশের লোক-সমাজের রস পেয়েছেন এবং গল্পে সেই রস দিয়েছেন ঢেলে। তাঁর এই কথাগুলিতে দূর দেশ ও দূর-কালের স্বাদ চমৎকার মিলে গেছে। এ'কেই বলে খাঁটি গল্প। এই রকম গল্প পথিকদের কাছে শোনা যেতে পারে পথের ধারের আসরে। এ'কে গল্পগুজব বলে না যেটা চণ্ডীমণ্ডপে বসে পাড়ার লোককে নিয়ে কানাকানি।"

চারুবাবুর পরিচয় এর চেয়ে ভালোভাবে আর কে দিতে পারবে?

পরিচয় ও বাংলা ছন্দ

ধারাবাহিক রচনার পক্ষে ত্রৈমাসিক পত্রিকা মোটেই উপযোগী নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও চারুবাবুর 'পুরানো কথা' সংখ্যার পর সংখ্যা ধ'রে পরিচয়-এর পাঠকদের আনন্দের খোরাক জুগিয়েছিল। বিতর্ক ব্যাপারটাও ত্রৈমাসিকে জমানো কঠিন, কেননা তিন মাসের ব্যবধানে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধার যেমন ভোঁতা হয়ে আসে, তেমনি মিইয়ে যায় পাঠকের আগ্রহ। কিন্তু তবু পরিচয়-এর পাতায় এমন একটি বিতর্ক জমেছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যা স্মরণীয়।

এই বিতর্কের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল সবুজপত্র-এ। রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল বাংলা ছন্দ। ঐ-যুগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বেশ বিস্তার ক'রেই বলেছিলেন 'ছন্দ-সরস্বতী' নামক সরস প্রবন্ধে; যতদূর মনে পড়ে ঐ-প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়।

এরপর ছন্দ নিয়ে বাংলায় যাঁরা রীতিমতো মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন, তাঁদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বছর পনেরো পরে সবুজপত্র-এর রচনার জের টেনে রবীন্দ্রনাথকে আসরে নামতে হ'ল একরকম বাধ্য হয়ে ছন্দ-আলোচনার আসরে। বাধ্য হয়ে এইজন্য যে, আধুনিক বাংলা ছন্দের যিনি স্রষ্টা, ছন্দ সম্বন্ধে অর্বাচীন মন্তব্য শুনে চুপ ক'রে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বৈকি, বিশেষ ক'রে এই মন্তব্যের লক্ষ্য যখন তিনি স্বয়ং।

আর-একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। পরিচয়-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় শেলির 'ওয়ান ওয়ার্ড ইজ টু অফেন প্রোফেন্‌ড' কবিতাটির দুটি অনুবাদ বেরিয়েছিল: একটি নীরেন রায়ের আর-একটি রবীন্দ্রনাথের। আনুপূর্বিক ইতিহাসসুদ্ধ এই দুটি অনুবাদই আমার এই আখ্যায়িকার গোড়ার দিকে উদ্ধৃত হয়েছিল। নীরেন রায়ের অনুবাদটির গোড়ার লাইন 'একটি কথা এতবার হয় কলুষিত'। 'একটি' শব্দটিকে এখানে লেখক দিয়েছেন দুই মাত্রা; রবীন্দ্রনাথও তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। অথচ 'একেকটি' শব্দটিকে কবি তাঁর নিজেরই রচনায় দিয়েছেন চার মাত্রার ওজন, এই নজির দেখিয়ে দিলীপ রায় আপত্তি জানিয়েছিলেন 'উত্তরা' কাগজে। এরই উত্তরে ১৩৩৮ সালের মাঘ মাসের পরিচয়-এ ছাপা হ'ল 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে কবি ব্যাখ্যা করলেন পয়ার-জাতীয় সমমাত্রার ছন্দের স্থিতিস্থাপকতার রহস্য দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত রচনা ক'রে। যেমন,

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খা'বি, জ্বর আট্‌কে যাবে কাল।

এর ওপর কবির মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য: "বলে রাখা ভালো এটা ভিষক-ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ নয়, সাহিত্য-ডাক্তারের বানানো ছড়া, ছন্দ-সম্বন্ধে মত-সংশয় নিবারণের উদ্দেশে,— এর থেকে অন্য কোনো রোগের প্রতিকার কেউ যেন আশা না করেন।"

নীরেন রায়ের 'একটি' কথার মতন, ওপরের ছড়ায় শব্দমধ্যস্থ হসন্তগুলি মাত্রার ওজনে বাদ পড়েছে। এর উল্টো দৃষ্টান্ত:

পাংলা করিয়া কাটো কাংলা মাছেরে,
উৎসুক নাংনি যে চা'হিয়া আছেরে।

এখানে 'ং'গুলি অখণ্ড মাত্রার গৌরবে বিরাজমান। মোটকথা কবি এই প্রবন্ধে বুঝিয়েছেন যে প্রাকৃত বাংলার স্বরবর্ণের সজীবতার জন্যেই প্রাক্-হসন্ত স্বর কখনো দীর্ঘ, কখনো লঘু ক'রে পড়া চলে। এই প্রবন্ধেই কবি তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করে" গানটি উল্লেখ ক'রে লিখেছিলেন:

"এখানে 'রূপ' আপন হসন্ত প-এর ঝোঁকে 'সাগরে'র সা-টাকে টেনে আপন ক'রে নিয়েচে, মাঝে ব্যবধান থাকতে দেয়নি। 'রূপ-সা' তাই আপনিই তিনমাত্রা হ'য়ে গেল। 'সাগরে'র বাকি টুকরো রইল 'গরে'। সে আপন

ওজন বাঁচাবার জন্যে ‘রে’-টাকে দিলে লম্বা ক’রে, তিনমাত্রা পুরল।… এমনি ক’রে আগাগোড়া তিনমাত্রা জমে উঠল।”

কবির বক্তব্য ছিল এই যে, “হসন্ত-প্রধান ভাষা সহজেই তিনমাত্রার দানা পাকায়।” দিলীপ রায় আবার আপত্তি জানালেন পরিচয়-এর পাঠকগোষ্ঠীতে (বৈশাখ ১৩৩৯)। ‘রূপসাগরে’ গানটির মাত্রাবিভাগ দিলীপবাবু করলেন এইরকম :

১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১
রূপ্ সাগরে	ডুব দিয়েছি	অ রূপ.র তন্	আশা করি

তারপর নাম ক’রে-ক’রে “মোহিতলাল, বুদ্ধদেব, যতীন্দ্রমোহন বাগ্চি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও কালিদাস রায়কে” পরিচয় মারফত প্রশ্ন জানালেন যে ‘রূপসাগরে’ গানটি তাঁরা পড়েন কোন্ ছন্দে, রবীন্দ্রনাথের মতন ত্রৈমাত্রিক, না তাঁর নিজের মতন প্রাকৃত অর্থাৎ স্বরবৃত্ত চতুর্মাত্রিক ছন্দে? দুঃখের বিষয়, ত্রৈমাসিকে স্থানাভাব ও তিন মাস অপেক্ষার ফলে তর্কের সূত্র হারিয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ ক’রে সম্পাদক জানালেন যে এ-আলোচনায় বাঙালি কবিদের নিমন্ত্রণ করতে তিনি অক্ষম।

সম্পাদকীয় নিষেধ যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল না তার প্রমাণ পরের সংখ্যার ‘ছন্দ-বিতর্ক’ প্রবন্ধ। ছন্দ সম্বন্ধে সবুজপত্র থেকে আরম্ভ ক’রে পরিচয়, পূর্বাশা, বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী ও উদয়ন প্রভৃতি কাগজে রবীন্দ্রনাথের যে-রচনাগুলি ছাপা হয়েছিল, তা সঙ্কলিত হয়ে ‘ছন্দ’ নামে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই তিন পাতার প্রবন্ধটি ঐ-বই থেকে বাদ পড়েছে। বাদ পড়া উচিত ছিল না। কেননা, এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কবি অল্পকথায় অতি পরিষ্কার ক’রে বুঝিয়েছেন যে ছন্দের রকমফের হয় শুধু মাত্রার ওজনে নয়, লয়ের বৈচিত্র্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবি ঐ ‘রূপসাগরে’ গানটির চতুর্মাত্রিক রূপান্তর দিলেন এইরকম :

রূপ রসে ডুব দিনু অরূপের আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ফিরিব না বেয়ে মোর ভাঙা তরী।

এর ওপর কবির মন্তব্য : “যদি কেউ বলেন দুটোর একই ছন্দ তাহলে এইটুকু বলে চুপ করব যে, আমার সঙ্গে মতে মিলল না। কেননা আমি ছন্দ গুণিনে আমি ছন্দ শুনি।”

গুণবান ছান্দসিকেরা যদি রবীন্দ্রনাথের ঐ-কথায় আগুন হয়ে থাকেন তো সে-আগুনের তাপ পরিচয়-এর পাতা পর্যন্ত পৌছয় নি। ওর পরের সংখ্যাতেই (কার্তিক ১৩৩৯) কবি লিখলেন ‘নবছন্দ’ ব’লে আর-একটি প্রবন্ধ। এর গোড়ার দিকে আছে হসন্ত-প্রসঙ্গ, তা মোটামুটি ‘ছন্দ’ বইটির ‘ছন্দের হসন্ত-হলন্ত’ প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য এই যে, ইচ্ছামতো মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়েও যতিস্থাপনের রকমফের ক’রে “বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করেনা।” এই কথা প্রমাণ করবার জন্য কবি বিভিন্ন লয়ে ও মাত্রায় যে-সব নমুনা রচনা করেছেন তার একটি নিচে দেওয়া গেল :

আলো এল যে দ্বারে তব
ওগো মাধবী বনছায়া।
দোঁহে মিলিয়া নব নব
তৃণ বিছায়ে গাঁথো মায়া॥
চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ফেরে বাতাস কাছে কাছে ;
আজি ফাগুনে একসাথে
দোলা লাগিয়ো নাচে নাচে॥
বধূ, তোমার দেহলিতে
বর আসিছে দেখিছ কি।
আজি তাহার বাঁশরিতে
হিয়া মিলায়ে দিয়ো সখি॥

এইরকম দৃষ্টান্ত জ্বল্জ্বল্ করছে ঐ-প্রবন্ধটি জুড়ে। এইগুলি রচনা করতে অসামান্য নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় কিনা বলা আমার অসাধ্য, কিন্তু বাংলা গীতিকাব্যের এগুলি যে অমূল্য রত্ন আশা করি এ-বিষয়ে মতভেদ হবে না। ছোটো-ছোটো নমুনাগুলি ‘স্ফুলিঙ্গ’ বইতে বিশ্বভারতী ছাপিয়েছেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়গুলি ‘ছন্দ’ বই ছাড়া আর-কোন সঙ্কলনে বেরিয়েছে ব’লে জানি না।

আমি ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসি নি। যাঁরা ছন্দ সম্বন্ধে উৎসুক তাঁরা ‘ছন্দ’ বইটি পড়ুন, এতে ছন্দ-প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও পাবেন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যের ও শ্রেষ্ঠ পদ্যের নমুনা। বেশিরভাগ পাঠকের কাছে

এই ফাউ পাওনাই অধিকতর মূল্যবান মনে হবে। বাংলার ছন্দতত্ত্ব জানতে হ'লে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র সেনের বইগুলিও অবশ্যপাঠ্য। আমি একালের পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সেকালের পরিচয়-এর পাঠকেরা এঁদের দু'জনেরই মতামত জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন এই ছন্দ-প্রসঙ্গে। ১৩৩৯ বৈশাখের পত্রিকায় প্রবোধবাবু লিখেছিলেন 'বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ'। এর বহুদিন পরে মাসিক পরিচয়-এ এক প্রবন্ধে তিনি 'পদাতিক' বই থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছিলেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দপ্রয়োগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ নৈপুণ্য।

অমূল্যবাবুর দুটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে। 'নবছন্দ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রার ছন্দের যে-উদাহরণ দিয়েছিলেন, অমূল্যবাবু তাতে আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেন 'নয় মাত্রার ছন্দ' (কার্তিক ১৩৪০)। তা ছাড়া আরো-একটি প্রবন্ধ তাঁর বেরিয়েছিল (মাঘ ১৩৩৯) বাংলা গদ্যছন্দ সম্বন্ধে। মোটকথা, ছন্দের আলোচনায় তখন বাংলা সাহিত্যের আসর সরগরম: নবজাত পরিচয় পত্রিকার পাতায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ যোগ না-দিলে বাংলা ছন্দের অনেক রহস্যই আমাদের কাছে আজও অস্পষ্ট থেকে যেত আর নাম-করা ছান্দসিকরা আজ যে-পথে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হচ্ছেন সে-পথে তাঁদের হোঁচট খাওয়ার অন্ত থাকত না।

ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ

অমূল্যবাবু তাঁর 'গদ্যের ছন্দ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে– পদ্যছন্দ ঐক্যপ্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্যপ্রধান।" উদাহরণস্বরূপ তিনি উদ্ধার করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রথম দৃশ্য ('সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ…')। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক কবিতাও যে ঐ-জাতীয় গদ্য-ঘেঁষা এ-কথার উল্লেখ তিনি করেন নি। ইতিমধ্যে বেরিয়েছিল 'পুনশ্চ'। এই নিয়ে ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ হ'ল চিঠিতে। ১৩৩৯ সালের দেওয়ালির দিনে ধূর্জটিবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ১৩৪০ সালের বৈশাখের পরিচয়-এ ছাপা হয়েছিল 'পুনশ্চ' নামেই। অমূল্যবাবুর কথায় সায় দিয়ে কবি তাতে লিখেছিলেন:

"কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে

সাহিত্য-সংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হাল্কা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়।"

ছন্দ বইটির পরিশিষ্ট অংশে এই বিষয় নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর-একটি চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে পূর্বাশা থেকে। তারিখ, ১৭ মে ১৯৩৫। রবীন্দ্রনাথ তাতে বলেছেন:

"আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না এটা শোচনীয়। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তাহলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন।"

এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে পরিচয়-সম্পাদকের বক্তব্য। 'পুনশ্চ' ও 'পরিশেষ' বইদুটির উল্লেখ ক'রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' (মাঘ ১৩৩৯) প্রবন্ধে লিখলেন:

"এমন মনে হওয়া অন্যায় নয় যে এই গ্রন্থ-দুখানিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ধ্বনি ও প্রসঙ্গের দিক দিয়ে যেখানে পৌঁছেছেন, তার পরে আর এগুনো অসম্ভব। সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিরোধ দূর করবার চেষ্টা করে এসেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হননি। এত দিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে-বিবাদের নিষ্পত্তি হলো। যে-বিচিত্রতার প্রয়োজনে মহাকাব্য গীতিকবিতার কাছে হার মেনেছিলো, তার সিদ্ধি হয়তো এইখানে। কারণ এই প্রকাশভঙ্গী জীবনের মতোই পরিবর্ত্তনশীল, এর বিশ্বব্যাপ্তি বায়ুর অনুকারী, ক্ষুধায় এ সর্ব্বভুক অগ্নির তুল্য। কিন্তু সেইজন্যেই তার আসঙ্গ নিরাপদ নয়; চিত্রল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষায় পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, যিনি অম্লান থাকেন, তিনি স্বয়ং বসুধার দুহিতা সীতা। স্বরাজ্য মজ্জাগত না-হয়ে গেলে নৈরাজ্য কেবল অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। তাই ভয় পাই, তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের হাতে তা সর্ব্বনাশে পরিণত হবেনা তো?"

ধূর্জটিবাবুকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে গদ্যকাব্য "নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্ব্বত্র।" দেখা যাচ্ছে কবির বক্তব্যের সঙ্গে সুধীন দত্তের ও অমূল্য মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক মিল। আক্ষেপের বিষয় শুধু এই যে, এই প্রসঙ্গে কেউ নাম করল না দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের, যাঁরা ছন্দের গণ্ডীর মধ্যেই পদ্যকে দিতে চেয়েছিলেন গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্ত্রী-স্বাধীনতা নয়— যথার্থ পৌরুষ।

পৌরুষের সঙ্গে কমনীয়তা মিশলে যথার্থ গদ্যকাব্যের সৃষ্টি হবে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। তাই দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের অবতারণা। কিন্তু 'বসুধার দুহিতা সীতা'র প্রতি রবীন্দ্রনাথের টান যে কম ছিল না, তার প্রমাণ তাঁর ছন্দ-সংক্রান্ত রচনাগুলিতে ভালো ক'রেই পাওয়া যায়। বারবার তিনি জোর দিয়ে বলেছেন বাংলার মাটির ভাষার স্বকীয় ঐশ্বর্যের কথা। সেকালের প্রকৃত বাংলার মহৎ উত্তরাধিকারকে তিনি যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন একালের শিক্ষিত বাঙালির ভাষা ও সাহিত্যে, তা মাইকেল, বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল কেউই করেন নি। হেম-নবীন তো ও-পথ আদৌ মাড়ান নি।

অবশ্য সুধীন ঠিক কী অর্থে বসুধার দুহিতা সীতার উল্লেখ করেছিল তা বলা আমার অসাধ্য। তবে কথাটা এ-ক্ষেত্রে যে খুব মানানসই হয়েছে তা মানতেই হবে। কিন্তু মাটির প্রতি সুধীনের নিজেরও যে বিশেষ টান ছিল অন্তত তার কবিতায় তার আভাস পাওয়া যায় না। যে-কারণেই হোক গদ্যকবিতা সুধীন কোনদিন লেখে নি। সম্ভবত 'রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের পক্ষে তা সর্বনাশে পরিণত' হবার আশঙ্কায়।

এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় আমারও স্থূল-বুদ্ধিতে এই কথা একদা মনে হয়েছিল ও কয়েক বৎসর পরে মাসিক পরিচয়-এ রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' ও 'পত্রপুট' সমালোচনা উপলক্ষে অত্যন্ত স্থূল ভাষাতেই আমার মনের কথা আমি ব্যক্ত করেছিলাম। ভাষাটা বোধহয় একটু অসংগত মাত্রায় স্থূল হয়েছিল, কেননা যতদূর মনে পড়ে (সেই সংখ্যাটি এখন হাতের কাছে নেই) আমি বাংলা সাহিত্যে গদ্যকবিতার দ্রুতবিস্তারকে কচুরিপানার বংশবৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা ক'রে মন্তব্য করেছিলাম যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কলমে গদ্যকবিতা সাহিত্যিক উৎপাত হয়ে ওঠে নি। ঠিক এই ভাষা না-হলেও মোটামুটি ভাবটা ছিল এইরকম।

আমার ঐ-মন্তব্য প'ড়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বুদ্ধদেববাবু 'কবিতা' কাগজে যে-জবাব দিয়েছিলেন তাতে উল্লেখ ছিল 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস্'-এর। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে আমার নামের সঙ্গে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাভলোভ-এর নাম জড়িয়ে আমাকে তিনি গৌরবান্বিত করেছিলেন, কেননা পাভলোভ গবেষণা করেছিলেন কুকুর নিয়ে। 'হিজ মাস্টার' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে 'কবিতা'র এই

সংখ্যাটি যথাসময়ে পৌঁছেছিল ও এরপর আমার সঙ্গে দেখা হতেই এই ব্যাপারটির উল্লেখ ক'রে তিনি বললেন, "তোমার সময় দেখছি বড়ই খারাপ যাচ্ছে।" আমি উত্তর দিলাম, "আমার দুঃসময়ের সঙ্গী আপনি এই আমার পরম সান্ত্বনা।"

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সারমেয়ের আবির্ভাব এই প্রথম নয়। বহুদিন আগে 'প্রবাসী'র কোন সংখ্যা পাঠকদের হাতে পৌঁছলে দেখা গেল তার শেষ পাতার খানিকটা অংশের উপর সাদা কাগজ আঁটা। সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই অংশটির পাঠোদ্ধার ক'রে সাধারণ্যে প্রচার করলেন যে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটি চতুর্দশপদী কবিতা এইভাবে ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে ও ঐ-কবিতাটির শেষে আছে এই দুটি অপরূপ লাইন :

হে কুক্কুর ঘোষ, তব আক্রোশ নিষ্ফল,
অত ঊর্ধ্বে পৌঁছে কিগো কণ্ঠ ক্ষীণবল?

'অত ঊর্ধ্বে' এ-ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ। ঘোষ কুক্কুর যে কে সে-অনুমান পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিলাম। সুরেশ সমাজপতি এর উপর মন্তব্য করেছিলেন যে ঘোষ যাই হোন-না কেন, কবিতাটির লেখক ও প্রবাসীর সম্পাদক যে কী জাতীয় জীব তা জীবতত্ত্ববিৎ রামব্রহ্ম সান্যাল ব্যতীত আর কারো বলা অসাধ্য। আমি শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর ক'রে ঘটনাটির উল্লেখ করলাম। জীবতত্ত্ববিৎ রামব্রহ্ম সান্যাল আমার পিতামহ ছিলেন, তাই সাহিত্য-সম্পাদকের বক্তব্য আমার মনে রাখবার বিশেষ কারণ আছে। আমার পিতামহের মৃত্যু হয় ১৯০৮ সালে, সুতরাং ব্যাপারটি ঘটে তার আগে।

গদ্যকবিতা ও সারমেয়-প্রসঙ্গের উপসংহারে শুধু একটি কথা বলতে চাই। বুদ্ধদেববাবু মেজাজী লোক, তার উপর আশ্রিতবৎসল। কবিযশঃপ্রার্থী যে-সব গদ্যকবিদের তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায় তাদেরই পক্ষ অবলম্বন ক'রে তিনি আমার সমালোচনার প্রতিবাদ করেছিলেন অতটা উগ্রভাষায়। আমি যেভাবে খোঁচা দিয়েছিলাম তাতে ঐ-উগ্রতা মার্জনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যে তাঁর মনে স্থান পায় না, তার প্রমাণ 'কবিতা'র ঐ একই সংখ্যায় তিনি পরিচয়-এ প্রকাশিত শেলির 'রাত্রির প্রতি' কবিতাটির অনুবাদের প্রশংসা ক'রে লিখেছিলেন, "এ-রকম অনুবাদ কপালগুণে হয়।"

অনুবাদ করেছিলাম আমি। বুদ্ধদেববাবুর মতন সমঝদারের কাছে যে এরকম প্রশংসা আমি পেয়েছি সে-ও আমার কপালগুণে।

আধুনিক কাব্য

রবীন্দ্রনাথের অযাচিত অনুগ্রহে পরিচয় পরিপুষ্ট হয়েছিল এ-কথা আগে লিখেছি। পরিচয়ের আসরে তাঁকে নিমন্ত্রণ করার মতন সাহস আমাদের হয় নি কিন্তু গিরিজাবাবু, ধূর্জটিবাবু (কলকাতায় থাকলে), সুধীন ও আমি কবির সঙ্গে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ করেছি, ও হাত না-পেতেই পরিচয়-এর জন্য রচনা উপহার পেয়েছি।

কিন্তু একটি রচনা কবির উপর বিশেষ বরাত দিয়ে আদায় করা হয়েছিল। 'আধুনিক' ইংরেজি কবিতার কতকগুলি বই কবির হাতে দিয়ে আবদার করা হ'ল একটি প্রবন্ধের। তখনকার 'আধুনিক' ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে পরিচয়-গোষ্ঠীর কেউ-কেউ একটু ডগমগ ছিলেন। তাঁদের ও যাঁরা ছিলেন না তাঁদেরও মনে ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক যে এলিয়ট প্রভৃতি তখনকার নাম-করা ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে আমাদের কবির কী ধারণা। এই ধারণা যথাসময়ে আমাদের গোচর হ'ল ১৩৩৯ সালের বৈশাখ মাসের পরিচয়-এর 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ ঐ-প্রবন্ধে লিখলেন:

"কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলঙ্কারের উপর নয়। কেননা অলঙ্কারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।...

"এইজন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেচে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এই রকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়।"

ঐ-জাতীয় 'হালের কাব্য'কে যে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি, শুধু কাব্য নয়, আধুনিক ব'লেও, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই কথায়:

"কিন্তু আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায় তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ী তালঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করিনে।"

এরপর রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন:

"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদ্গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্তচিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখ্‌বে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।"

এই সঙ্গে তুলনীয় 'ঐতিহ্য ও টি-এস্ এলিয়ট্' প্রবন্ধে সুধীন দত্তের এই মন্তব্য:

"বিষয়নির্ব্বাচনে কবির স্বাধীনতা যদিও অনন্ত, তবু বিষয়ের বৈচিত্র্যে কবিতার মৌলিকতা বা সাফল্য নির্ভর করে না। কারণ কাব্যের মুখ্য সম্বল হচ্ছে আবেগ, এবং আমাদের আবেগ-সংখ্যা যেহেতু অত্যল্প, তাই প্রসঙ্গের দিক দিয়ে কবিতা যতই অপূর্ব হোক, ফলাফলের বিচারে তার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা দেখা যাবেই যাবে। এই ধারাবাহিকতার অনুসরণ করলে তথাকথিত সনাতন সত্যসমূহের সন্ধান মিলবে কিনা জানি না; কিন্তু একেই যদি পূর্ব্বোক্ত ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ব'লে মানা যায়, তবে নিশ্চয়ই কোনো সাংঘাতিক ভুল হবে না। এই প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বকীয় প্রণালীর সঙ্গমসাধনই অব্যক্তির মরুভূমিকে সুফলা করার একমাত্র উপায়। ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন অতিব্যক্তি আবেগের অন্তঃপ্রবেশে রসায়িত হয়ে ওঠে, তখনই তাকে রত্নগর্ভা বলা চলে, শুধু তখনই রূপের জন্ম সম্ভব।"

রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন দত্ত দু'জনে ঠিক এক কথা না-বললেও এঁদের দু'জনের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী নয়। সুধীন দত্ত ইতিহাস-সচেতন না-হয়েও ঐতিহ্যে আস্থাবান, কিন্তু যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধের কথা এখনকার বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই শোনা যায়, যদিও শিল্পসৃষ্টিতে তার স্ফুরণ অতি বিরল, রবীন্দ্রনাথ বা সুধীন দত্ত কারো রচনায় তার উপলব্ধি প্রকাশ পায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের আধুনিক কাব্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। সুধীন দত্ত যে তা পেরেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছি 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধ থেকে একাধিক উদ্ধৃতি দিয়ে।

আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গে এলিয়ট-এর নাম উঠতে বাধ্য। পরিচয়-এর বৈঠকে এলিয়টকে নিয়ে তর্কবিতর্কে নীরেন রায় যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করত তার মধ্যে ফুটে উঠত এখনকার বামপন্থী সমালোচনার পূর্বাভাস। অল্পদিন আগে 'সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসাইটি' পত্রিকায় রাসেল এম্‌স্ নামক এক লেখক বলেছেন এলিয়ট-এর কঠিনতম সমালোচকেরা তাঁকে কবিত্বের সম্মান যেটুকু দেন তাও তাঁর প্রাপ্য নয়। আর সুধীন দত্ত এলিয়ট-এর কাব্য 'এখনো তর্কাতীত উৎকর্ষে উঠতে পারেনি' এই কথা স্বীকার ক'রেও 'কাব্য জীবনের সমালোচনা' — আর্নল্ডের এই বিখ্যাত মন্তব্যের প্রতিবাদে এলিয়ট-এর 'অনেক হঠোক্তি'র উল্লেখ ক'রেও শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন :

"তাঁর গদ্যে পদ্যে যতখানি জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছি, তা আধুনিক কালে একান্ত দুর্লভ। হয়তো এইজন্যেই বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত, হয়তো এইজন্যেই তিনি ভবিষ্যতের স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

বিষ্ণু দে'ও প্রায় এইজাতীয় কথা লেখেন বছর-দশেক পরে 'টি. এস. এলিঅটের মহাপ্রস্থান' প্রবন্ধে (কার্তিক ১৩৫১)। "একালের কবিদের তাঁর [এলিয়টের] কাছে ঋণস্বীকার করতে হয় বারবার। খণ্ড-চৈতন্যের এমন একাগ্র উপলব্ধি ও এমন কাব্যসমৃদ্ধ রূপ এবং তার থেকে বর্ধমান নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কাব্যজগতে এলিঅটের দান। এ দান ভুললে এলিঅটোত্তর কাব্যের মুক্তির উৎসও ভুলতে হয়।" পরিচয়-এর বর্তমান পাঠকের অনেকেরই হয়তো ঐ-প্রবন্ধটির কথা মনে আছে। তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছি রাসেল এম্‌স্-এর উক্ত প্রবন্ধটি প'ড়ে দেখতে। এম্‌স্ বলেছেন :

"ভালো হোক, মন্দ হোক, আর্টের প্রভাব ব্যাপ্ত হয় মানুষের মনের ওপর, তাই আর্টের মূল্য নিরূপণে প্রধানত বিচার ক'রে দেখতে হবে কী পরিমাণে আর্টের সাহায্যে মানুষের মনের বিকাশ সম্ভব হয়েছে — অর্থাৎ আর্ট মানুষের মনে সঞ্চার করতে পেরেছে সাহস, শক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতা। যে-পরিমাণে আর্ট মানুষের মনকে খর্ব করে, মানুষের মনে এনে দেয় ভীরুতা, অস্পষ্টতা, ভ্রান্তি ও অসহায় ভাব — সেই পরিমাণে আর্ট মন্দ। আর্টের বাহ্য রূপ অবজ্ঞেয় নয়। যথার্থ রূপসৃষ্টিতে পাওয়া যায় শৃঙ্খলা ও যুক্তির সঙ্গতি। এলিয়ট ও এলিয়ট-এর মতন আরো সহস্র-সহস্র শিল্পী শিল্পরূপকে ভেঙে চুরমার ক'রে এমন এক শিল্পকলা সৃষ্টি করেছেন যা নিতান্তই হেয়, কেননা, যুক্তিকে তা বর্জন করেছে।"

এলিয়ট-প্রসঙ্গে 'ভবিষ্যতের পূজা'র এই হয়তো চরম নমুনা নয়। আশা

করি এই বিষয়ে আলোচনা হবে। আপাতত সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে ও আধুনিকতম বামপন্থী সমালোচকের মতামতের তুলনামূলক বিচারের ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু এই কথার উল্লেখ করতে চাই যে এলিয়ট সম্বন্ধে যদিও 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাসেল-এর মতন কোন সরাসরি মন্তব্য করেন নি, তবু ধ'রে নেওয়া যেতে পারে তৎকালীন অন্য কবিদের সম্বন্ধে তাঁর যা বক্তব্য তা খাটে এলিয়ট-এর বেলাতেও। কিন্তু এলিয়টকে তিনি যে একেবারে অবজ্ঞা করেন নি তার প্রমাণ এলিয়ট-এর 'জার্নি অফ দি মেজাই' গদ্যকবিতাটির অনুবাদ ক'রে তিনি পরিচয়-এ ছাপতে দিয়েছিলেন 'তীর্থযাত্রী' নামে। এই অনুবাদের খসড়া নাকি বিষ্ণু দে'র করা আর তারই ওপর কলম বুলিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যাই হোক, 'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে সম্মানের আসন দাবি করতে পারে।

'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধের মধ্যে টুকরো ও গোটা কবিতার অনুবাদ ছড়িয়ে আছে অনেকগুলি। এগুলির মধ্যে ইংরেজ মেয়ে কবি এমি লোয়েল-এর একটি কবিতার পুরো অনুবাদটি তুলে দেওয়ার মতন :

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি —
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজচে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েচে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে রাখা মাথাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো, —
তোমার ঐ মিলে-মিশে যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মন
ওঠে মেতে।

আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা
তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝকমকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

'তর্জ্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেথাপ হবে–চেষ্টাও সফল হবে না'– তর্জমাকারীর এই উক্তি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে 'তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্ত্তের / ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে' এই দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে আছে দুর্লভ মাধুরী। মূল কবিতাটি পড়ি নি তাই এই মাধুরীর স্রষ্টা কতটা মূল কবি ও কতটা অনুবাদক তা বলা আমার অসাধ্য।

আধুনিক কাব্য : উৎকর্ষের সংজ্ঞা

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি পরিচয়-এর পাঠক ও লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা তৎকালীন আধুনিকতায় আবিষ্ট ছিলেন তাঁদের কেমন লেগেছিল তা বলতে পারি না। 'আধুনিকতা'র মধ্যে যা নিতান্তই মেকি, রবীন্দ্রনাথ তা একরকম চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে বোধহয় কারো-কারো চোখ ফুটে থাকবে, কেননা কিছুকাল আগে তরুণ বাঙালি লেখক অমলেন্দু দাশগুপ্ত 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের বিদেশী সাহিত্যে যে-বিকার দেখা দিয়েছিল তার সংক্রমণ থেকে বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'স্যানিটি'। 'স্যানিটি' বলতে মানসিক স্বাস্থ্য বোঝায়, যদিও এর যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ কী তা বলা কঠিন।

যাই হোক, বাংলা দেশের লেখক ও পাঠক-সম্প্রদায়ের মানসিক স্বাস্থ্যকে যদি-বা বিদেশী সংক্রমণ স্পর্শ ক'রে থাকে তা যে ব্যাপকভাবে করে নি, পরিচয়-এর পাতাতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়–প্রবন্ধে, সমালোচনায়, কবিতায়। তর্কবিতর্কে এলিয়ট সম্বন্ধে নীরেনের প্রতিবাদের কথা আগেই লিখেছি। 'আধুনিক' ইংরেজি কবিতা সম্বন্ধে তার তীব্র প্রতিবাদের– নীরেনের প্রতিবাদ বা সমর্থন সবসময়েই তীব্র হ'ত–আর-একটি নমুনা দিচ্ছি। 'রিসেণ্ট পোয়েট্রি ১৯২৩-১৯৩৩' সমালোচনা-প্রসঙ্গে নীরেন লিখেছিল :

"বইখানি আগাগোড়া পড়িবার পর আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে মনে যে অনুভূতি জাগিয়া ওঠে তাহাতে আনন্দ অপেক্ষা চমকই বেশী। ভাবব্যঞ্জনা, বচনভঙ্গী, ছন্দচালনা, ছেদবিভাগ ও পংক্তি-বিন্যাসের উদ্ভট দুঃসাহসিকতায় যত রকমে পাঠককে তাক লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার কোনটি বোধ হয় এই কবিদের চোখ এড়ায় নাই।"

তারপর আছে :

"ইহাদের চরম গৌরব দুর্ব্বোধ্যতায়–যেন পাঠকে বুঝিতে পারিলে ইহাদের জাতি যাইবে।... দুর্ব্বোধ্যতার এ অভিযোগ কেবল আমার মতো বিদেশী পাঠকের মনে উদিত হইলে তাহার কোন মূল্য থাকিত না। কিন্তু এ প্রশ্ন যে ওদেশের সুধী পাঠকমণ্ডলীকেও বিচলিত করিতেছে। অবশ্য কবিদের স্বপক্ষের ব্যাখ্যাকর্ত্তারও অভাব নাই। কী যে সাহিত্যিক কুরুক্ষেত্রের আয়োজন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়, ইষ্টম্যান, এলিয়ট, রিচার্ডস্‌, লীভিস্‌, স্প্যারো, রবার্ট্‌স্‌, ষ্টোনিয়ের, ইত্যাদির অস্ত্র সঞ্চালনের সংবাদ রাখিলে; ...এই মসীযুদ্ধ সহজে নিবৃত্ত হইবে, এ আশা করা বৃথা। কারণ, উৎকর্ষের সংজ্ঞা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই, কোনোদিন হইবে কি না সন্দেহ। তবে যে-ধারা আজ ইংরাজী সাহিত্যে চলিতেছে তাহা যদি আরও কিছুকাল বজায় থাকে তাহা হইলে শুধু সাধারণ বিদ্যা ও সহজ রসবোধ সম্বল করিয়া আর কবিতা পড়া চলিবে না।"

এরপর নীরেন 'সহজ রসবোধ'কে স্পর্শ করে এমন কতকগুলি কবিতার নমুনা দিয়েছে পাঠকদের এই ভরসা দেবার জন্যে যে ইংরেজি কবিতার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার নয়। একটি নমুনা তুলে দিলাম, বিচারের ভার পাঠকদের ওপর।

FIN DE FETE

Sweetheart, for such a day
    One mustn't grudge the score ;
Here, then, it's all to pay,
    It's Good-night at the door.

Good-night and good dreams to you.
    Do you remember the picture-book
    thieves
Who left two children sleeping, in a
    wood the long night through,
And how the birds came down and
    covered them with leaves ?

So you and I should have slept, but
now,
Oh, what a lonely head !
With just the shadow of a waving
bough
In the moonlight over your bed.

– Charlotte Mew

কবিতাটি সহজ রসবোধকে অবশ্য স্পর্শ করে, কিন্তু এর চেয়ে গভীরভাবে আমাদের সহজ রসবোধকে স্পর্শ করে এমন একাধিক কবিতা তখনকার পরিচয়-এর 'কবিতাগুচ্ছ' সন্ধান করলে বোধহয় পাওয়া যাবে।

অবশ্য সাহিত্যবিচারে ব্যক্তিগত রসবোধ বা রুচির ওপর নির্ভর করা চলে না। তাই কথা ওঠে 'উৎকর্ষের সংজ্ঞা' কী? নীরেন তখন সরাসরি রায় দিয়েছিল, "উৎকর্ষের সংজ্ঞা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই, কোনোদিন হইবে কি না সন্দেহ।" এর সঙ্গে তুলনীয় 'ঐতিহ্য ও টি-এস্ এলিয়ট্' প্রবন্ধে সুধীনের এই উক্তি: "কবি তাঁর হৃদয়কে যতখানি বড় ক'রে তুলতে পারেন, তাঁর জাগতিক পরিমণ্ডলের যতখানি তাঁর কাব্যে পরিকীর্ণ হয়, সেই পরিমাণেই তিনি আমাদের নমস্য, সেই পরিমাণেই তিনি মৌলিক।" শুধু এই ক'টিমাত্র কথায় উৎকর্ষের সংজ্ঞানির্দেশ হয় না, আরো বিস্তার প্রয়োজন। কিন্তু সংজ্ঞানির্দেশ যে সম্ভাবনার অতীত নয়, এইরকম ইঙ্গিত এই কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। নীরেনের এখনকার বিশ্বাস এই যে, সাহিত্যের উৎকর্ষের সংজ্ঞানির্দেশ শুধু সাধ্য নয় সমালোচকের অবশ্যকর্তব্য; এই কর্তব্যসাধনে সে এখন অনুসরণ করছে কড্‌ওয়েল-এর পথ। সুধীনের সঙ্গে কড্‌ওয়েল-এর ব্যবধান দুই বিপরীত মেরুর ব্যবধানের চেয়েও দুর্লঙ্ঘ্য, কিন্তু মহৎ কাব্য সম্বন্ধে কড্‌ওয়েল-এর ও সুধীনের মতে অনেকটা মিল দেখা যায়।

পুরনো পরিচয়-এর পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে নীরেনের আর-একটি সমালোচনা চোখে পড়ল। ডোভার উইলসন্-এর 'দি এসেনশিয়াল শেক্সপীয়র' প্রসঙ্গে নীরেন লিখেছিল:

"স্রষ্টা হইতে হইলে জীবনের পর্য্যালোচনা না করিলে চলে না; সে পর্য্যালোচনা যত উচ্চস্তরের হইবে, ততই মঙ্গল। সৃষ্টিশিল্পের আদর্শ সম্বন্ধেও তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হয়—অপরের সৃষ্টির বেলায় যদিই বা উদাসীন থাকা সম্ভব হয়, নিজের সৃষ্টির বেলায় কিছুতেই সম্ভব নয়। অচেতন শিল্পী কোনদিন বড় শিল্পী হইতে পারে না।"

মোট কথা এই যে পরিচয়-এর কোন প্ল্যাটফর্ম্ ছিল না। স্বদেশী ও বিদেশী, সাহিত্যিক, দার্শনিক বা রাজনৈতিক, বিবিধ প্রভাব যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল একদল মননশীল লেখকের মনে, তারই প্রতিভাস ফুটেছিল ভাবগঙ্গার স্রোতধারায়। বহু কবির সমাবেশে পরিচয়-এর 'কবিতাগুচ্ছ' হয়েছিল বিচিত্র। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্লোল-এর যুগের 'বিদ্রোহী' কবিরাও। কিন্তু তাঁরা তখন যথেষ্ট সম্রান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের ছাচে হৃদয়ের আবেগ ঢালাই করতে শুরু করেছেন। মাঝে-মাঝে অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটেছে, যেমন, বুদ্ধদেব বসুর হেলেনের বুকের সোনার বাটি-সংক্রান্ত মনোগ্রাহী কবিতাটি; কিন্তু এরকম ব্যতিক্রম বিরল।

কল্লোল-এর পাতায় ও আপাতদৃষ্টিতে কল্লোলী ঢঙে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন বিষ্ণু দে। কিন্তু তাঁর কিশোর বয়সে লেখা কবিতাগুলিতে ফুটে উঠেছে তাঁর স্বভাবের স্বকীয়তা ও তাঁর প্রেরণার সূক্ষ্ম বৈদেশিকতা। এই স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, আবেগের চেয়ে মননশীলতার ভাগ এতে বেশি, তাই তাঁর কবিতা অনেকসময়ে অস্বাভাবিক মনে হয়। হয়তো পাঠকদের মননশীলতার অভাবে। মনে হয়, এই মননশীলতার জোরেই বিষ্ণু দে কল্লোলী কবিদের তুলনায় অনেক বেশি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন সমসাময়িক বৈদেশিক সাহিত্যের প্রভাব। কিন্তু এই প্রভাবই অন্তরায় হয়ে উঠেছে বিষ্ণু দে'র কবিতা ও তাঁর পাঠকদের মাঝখানে। বিরল এক-একটি কবিতায় বা মাত্র দু'চার পঙ্‌ক্তিতে তাঁর দীপ্ত আবেগ পাঠকের মনে উষ্ণতার সঞ্চার করে। এইরকম একটি দৃষ্টান্ত তাঁর 'উর্ব্বশী' কবিতা:

তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি
ঘুরিতে সময় নাই—শুধু তুমি রহো ক্ষণকাল
ক্ষণিকের আনন্দআলোয়
অন্ধকার আকাশসভায়
নগ্নতা-প্রদীপ্ত তনু জ্বালাইয়া দাও আজ নৃত্যময় দীপ্ত দেয়ালিতে।

এই কবিতাটি প্রথমে বেরিয়েছিল পরিচয়-এর গোড়ার দিকের একটি সংখ্যায়, পরে ছাপা হয় বিষ্ণু দে'র প্রথম কবিতার বই 'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস'-এ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রিয়া ও পৃথিবী' ও বুদ্ধদেব বসুর 'পৃথিবীর পথে'র সঙ্গে 'উর্বশী ও আর্টেমিস্'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম :

"যে-অদ্ভুতের অবতারণা বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্যকুমারের রচনায় নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ পরম আশ্বস্তি বোধ করিয়াছেন বিষ্ণুর কবিতায় তাহা মাঝে মাঝে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার রচনা-শক্তির উৎকর্ষের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্যকুমারের লেখায় দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য রচনা-শক্তি বলিতে শুধু ভাষার নৈপুণ্যের কথা নয়—সমগ্রভাবে কাব্যসৃষ্টির কথা বলিতেছি। এই তিনটি নবীন লেখকের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কবিতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সব সময়ে সুন্দরভাবে না হউক অনিবার্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, একমাত্র তাঁহারই রচনায় 'ষ্টাইল'-এর আভাস পাওয়া যায়, তাহা অপরিণত এবং অবশ্যই অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিবহুল, কিন্তু তবু তাহা 'ষ্টাইল'। কিন্তু... একটি কবিতা—'উর্বশী'—এই সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে কাটাইয়া উঠিয়াছে মনে হয়।"

প্রায় কুড়ি বছর আগে এই কথা লিখেছিলাম। ইতিমধ্যে বিষ্ণু দে'র স্বকীয়তা, তাঁর স্টাইল, অনেক পরিণতি লাভ করেছে, সমসাময়িক সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মন অনেক বেশি সচেতন হয়েছে, কিন্তু 'উর্বশী'র চেয়ে ভালো কবিতা বিষ্ণু দে'র হাত থেকে যদি বেরিয়ে থাকে তা আমার চোখে পড়ে নি।

আধুনিক কাব্য : অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'রবীন্দ্রোত্তর' বাংলা কবিতার আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, এ-ক্ষেত্রে 'আধুনিক' কথাটির অর্থ একেবারেই পারিভাষিক। সত্যেন দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, যতীন বাগচী বা মোহিতলাল মজুমদার, এঁরা কেউই এই পারিভাষিক অর্থে আধুনিকতার দাবি করেন নি, এঁদের প্রশংসায় বা প্রতিবাদে অন্য কোন সমালোচকও এঁদের প্রসঙ্গে 'আধুনিকতা' কথাটি প্রয়োগ করেন নি।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা নিয়ে প্রথম শোরগোল উঠেছিল কল্লোল-সাহিত্যিকদের অর্বাচীন কোলাহলের ফলে। এঁদের মধ্যে যিনি ছিলেন অর্বাচীনতম, একমাত্র সেই বিষ্ণু দে'র কাব্যরচনাতেই কল্লোলীয় আধুনিকতা ক্রমশ স্বকীয় ভঙ্গিতে কায়েম হয়ে দাঁড়াল। বাদ-বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা যে অচিরেই রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি।

বিষ্ণু দে যখন পরিচয়-এর পাতায় নতুন মেজাজের ও নতুন ভঙ্গির কবিতা

লিখতে শুরু করেছেন, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় তখনো রবীন্দ্রনাথের শুধু মেজাজ নয়, আওয়াজও অত্যন্ত স্পষ্ট। পরিচয়-এ তাঁর রচনা ছাপা হয়েছে কচিৎ কদাচিৎ, কিন্তু ইতিহাসের খাতিরে উল্লেখ করা উচিত যে এর অল্পদিন পরেই অমিয়বাবু তাঁর কবিতা নতুন ছাঁচে ঢালাই করতে শুরু করেন। কিন্তু ছাঁচ বদলালেও মালমশলা বদলায় নি, মেজাজ তো মোটেই না।

অমিয়বাবু ও সুধীন প্রায় সমবয়স্ক, দু'জনেই বিষ্ণুর চেয়ে বয়সে বেশ কয়-বছরের বড়। কিন্তু 'তরুণ' কবি ব'লে বিষ্ণু যখন যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছে— নিজগুণে বা কল্লোলীয় সঙ্গদোষে, সুধীনের বা অমিয়বাবুর কবিতার পরিচয় তখনো বাঙালি পাঠক পায় নি। সুধীনের প্রথম কবিতার বই 'তন্বী' এইসময়ে ছাপা হয়। পাণ্ডুলিপিতে এই বইয়ের কতকগুলি কবিতা দেখে রবীন্দ্রনাথ এগুলির স্বকীয়তার কথা আমাদের বলেছিলেন। তখনো পরিচয় বেরোয় নি। এরপর পরিচয় বেরোলে রবীন্দ্রনাথের হাতে একখণ্ড 'তন্বী' দেওয়া হয় সমালোচনার বরাত দিয়ে। কিন্তু বহু অনুরোধেও সমালোচনাটি আদায় হয় নি। এর কারণ আলস্য বা সময়াভাব নয়। সুধীনের অসাক্ষাতে কবি আমাকে একদিন বলেছিলেন, "দেখ, ভোগ করব পুরোপুরি তারপর বলব কিছু না—এ আমার অসহ্য লাগে।" 'তন্বী'র 'শৃঙ্গার' ও ঐ-জাতীয় কবিতার কথা মনে ক'রেই রবীন্দ্রনাথ ঐরকম কথা ব'লে থাকবেন। 'তন্বী'র সব কবিতাই অবশ্য এই জাতীয় নয়। এর অনেক কবিতাতেই কী মেজাজে, কী সাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল। সুধীন কাব্যরচনার হাতে-খড়ি করেছিল রবীন্দ্রনাথের হরফেই হাত বুলিয়ে, বিষ্ণু দে'র মতন নতুন বর্ণমালা উদ্ভাবনের চেষ্টা না-ক'রে। ক্রমশ দেখা দিল সাজবদলের চেষ্টা, সেই সঙ্গে স্পষ্টতর হ'ল শুধু মেজাজের নয়, একেবারে মজ্জাগত স্বকীয়তা।

সুধীনের দ্বিতীয় কবিতার বই 'অর্কেস্ট্রা'। এর কবিতাগুলো সবই লেখা পরিচয়-এর প্রথমযুগে। প্রথম যে-কবিতা বা কবিতাসমষ্টির নামে বইটির নামকরণ তার শেষের দিকে আছে কল্পলোকের প্রেয়সী সম্বন্ধে কবির এই ভাববিলাস :

মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে,—
আমার অমরা আশ্রিত তব মাংসী স্নেহে।
স্খলিতবসন উরুতে তোমার
অনাদি নিশার শান্তি উদার;

নবদূর্ব্বার চিকণ পুলক ও-বরদেহে।
বিশ্বের প্রাণ বিকচ আজিকে আমার গেহে।

'অনাদি নিশার শান্তি উদার' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দান, কিন্তু সুপ্ত প্রেয়সীর স্খলিতবসন উরুতে এই শান্তির সন্ধানলাভ সুধীনের স্বকীয় আবিষ্কার। এরপর সুধীনের আধুনিকতা আরো মৌলিক হয়েছে 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের চরম পরিণতিতে।

অকস্মাৎ স্বপ্ন গেলো টুটে। দেখিনু সরমে চাহি
জনশূন্য রঙ্গালয়ে নিবে গেছে সমস্ত দেউটি,
নিস্তব্ধ সকল যন্ত্র, মঞ্চপরে যবনিকা ঢাকা।
অলক্ষ্যে কখন পার্শ্ব হ'তে প্রেমিক প্রেমিকা চলে
গেছে অমৃতসঙ্কেতে। শান্তি—শান্তি—শান্তি চারিধারে!
কেবল অন্তর মোর দীর্ণ হয় ক্ষুব্ধ হাহাকারে॥

তখনকার আধুনিকতার অভিনবত্ব ছিল অন্তরের এই হাহাকার। এলিয়ট-এর মরু-বিলাপ ক্ষান্ত হয়েছে শান্তিবাচনে; ক্যাথলিক চার্চ-এর আশ্রয়ে এলিয়ট এখন প্রায় নিরাময় হয়েছেন। কিন্তু সুধীনের ক্ষেত্রে

কবিত্ব আমার ব্রত, তাই বুঝি কৌমুদীজাগরে
পেচকীয় দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা!

কিংবা

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে;
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে;
বস্তুর দুর্দান্ত চিতা অনির্ব্বাণ শূন্যের সৈকতে;
কালের অদৃশ্য গতি ব্যক্ত শুধু বিপ্লববর্দ্ধনে;
সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ, সে কেবলি সম্ভব স্বপনে;
বিসংবাদ, বিকর্ষণ, আর্যসত্য জাগ্রত জগতে;
ছুটি মোরা মর্ত্যচর আত্মঘাতী আবর্ত্তের স্রোতে,
ফেনিল সম্মোহে মেতে, লুব্ধকেন্দ্র নাস্তির শোষণে।

ছন্দ ও ভাষার কাঠামো নেওয়া রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে (যদিও রবীন্দ্রনাথ কখনো সনেট লেখেন নি); অভিধান ঘেঁটে শব্দ সংগ্রহ ক'রে এই কাঠামোকে সাজানো হয়েছে নতুন সাজে। 'শনিবারের চিঠি' তাই উপরের উদ্ধৃতিটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে সপ্তম লাইনের 'ছুটি মোরা' শব্দ দুটি অভিধানে খুঁজে না-

পাওয়ার জন্যে পঙ্‌ক্তিগুলির অর্থ বোধগম্য হয় নি। এই পরিহাস নিরর্থক নয়। কিন্তু এ-কথা মানতে হবে যে সুধীনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্তরের তিক্ততা ফুটে উঠেছে তার কবিতাগুলির পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে; এই তিক্ততা তার স্বোপার্জিত, তাই তার মৌলিকতা অবশ্যস্বীকার্য। দুঃখের বিষয় এই মৌলিকতার সমাপ্তি ঐখানেই; উত্তরকালের বাংলা কবিতায় সুধীনের প্রভাব যেটুকু সঞ্চারিত হয়েছে তা শুধু ভাষাগত।

জীবনানন্দ দাশের কবিতাও পরিচয়-এ মাঝেমাঝে বেরিয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ও বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত কবিদের নাম আগেই করেছি। বাদ-বাকি কবিদের মধ্যে হুমায়ুন কবির, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, জীবনময় রায়, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বাগচী, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বা দিলীপকুমার রায়—এঁদের কাউকেই 'আধুনিক' বলা চলে না, অন্তত বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বা সুধীন দত্তের মতন এঁদের প্রভাব কনিষ্ঠ কবিদের মধ্যে দেখা যায় না।

এই তিনজনের মধ্যে বিষ্ণুর প্রভাব অবশ্য সবচেয়ে ব্যাপক। এই প্রভাব যে খুব স্বাস্থ্যকর হয় নি তার কারণ, বিষ্ণু দে'র বক্রোক্তি অনুকারকদের হাতে দাঁড়িয়েছে অসহনীয় ভঙ্গিদোষে। বিষ্ণু দে'র ক্ষেত্রে এই বক্রোক্তির উৎস, তাঁরই নিজের ভাষায়, তাঁর নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও তাঁর তির্যক দৃষ্টি; দুই-ই তাঁর অনুকারকদের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু বিষ্ণু দে, বাংলা ছন্দে নতুন দোল এনেছেন—এটুকু আমাদের লাভ।

যে-যুগের কথা বলছিলাম সে-যুগে ফিরে যাওয়া যাক। পরিচয়-সভায় ইতিমধ্যে আর-একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলার মাটিতে তাঁর জন্ম হলেও বহুদিন বিদেশে কাটিয়ে ও ইংরেজি ভাষাকে মাতৃভাষার মতন আয়ত্ত ক'রে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন আমরা তাঁকে গ্রহণ করলাম বিদেশী সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে—স্বদেশে প্রত্যাগত বাঙালি হিসাবে নয়।

সাহেদ সুরাওয়ার্দি

এই আগন্তুকটির নাম সাহেদ সুরাওয়ার্দি। কলকাতার সুপরিচিত সুরাওয়ার্দি পরিবারে তাঁর জন্ম। অখণ্ড বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সহিদ সুরাওয়ার্দি এঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সাহেদ সুরাওয়ার্দি কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যয়ন সাঙ্গ ক'রে

অক্সফোর্ড-এ যান ও সেখানকার পালা শেষ হ'লে সাহিত্য ও ললিতকলার অনুসরণে, ভাগ্যের অন্বেষণে ও প্রবৃত্তির তাড়নায় বৃত্তি গ্রহণ করেন ইয়োরোপের দেশ হতে দেশান্তরে যাযাবর জীবনযাপনের। এই অবস্থায় ফরাসি দেশে এঁর প্রায় শিকড় গজায়। অতঃপর রাশিয়া। সেখানে বিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটার-এ নাট্যকলা সম্বন্ধে এঁর শিক্ষানবিশির সুযোগ ঘটে, কিন্তু বলশেভিক বিপ্লবের বিপর্যয় অসহ্য হওয়ায় সাহেদ সুরাওয়ার্দি তিক্ত চিত্তে রাশিয়া থেকে প্রস্থান ক'রে আবার গা ভাসিয়ে দেন ইয়োরোপীয় জীবনের ঘূর্ণিপাকে। প্রবীণ বয়সে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন ক'রে সাহেদ সুরাওয়ার্দি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ললিতকলার বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

অক্সফোর্ড-এ ছাত্রাবস্থাতেই ইংলণ্ডের সাহিত্যিক-চক্রের সঙ্গে সাহেদ সুরাওয়ার্দির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে অক্সফোর্ডবাসী রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস-এর সঙ্গে। এইসময়েই ইংরেজিতে কবিতা রচনায় তাঁর হাত খোলে। এইসব কবিতা পরে 'এসেস্ ইন্ ভার্স' (*Essays in Verse*) নামে সংগ্রথিত হয়ে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই বইটিরই সমালোচনা প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে সাহেদ সুরাওয়ার্দির সম্বন্ধে 'নাগরিকোচিত বৈদগ্ধ্য' কথাটি ব্যবহার করেন। এই কথাটি আমি প্রয়োগ করেছি বিষ্ণু দে'র নিজের সম্বন্ধে। বিষ্ণু দে'র সমালোচনার কথা পরে বলছি। আপাতত একটু ব্যক্তিগত কথা বলি।

সাহেদ সুরাওয়ার্দি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের গান, 'তোমায় চোখের দেখার আগে, তোমার স্বপ্ন চোখে জাগে।' এ-ক্ষেত্রে আমার মনে স্বপ্নের বীজ বুনেছিল নীরেন রায়। সাহেদ সুরাওয়ার্দির কবিতার বই তখনো আমাদের হাতে পৌঁছয় নি কিন্তু এখান-ওখান থেকে তাঁর কয়েকটি কবিতা নীরেন সংগ্রহ করেছিল, আর নীরেনের কাছ থেকে এইসব কবিতার সন্ধান পেয়ে আমি বেশ-একটু বিহ্বল হয়েছিলাম। বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে 'দি লেডি অফ্ সিম্বলস্' নামে একটি কবিতা। আমার স্মরণশক্তি দুর্বল, 'এসেস্ ইন্ ভার্স' বইটিও কাছাকাছি নেই। সুতরাং ঐ-কবিতাটি সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল মেটানো আমার পক্ষে উপস্থিত অসম্ভব। কিন্তু সাহেদ সুরাওয়ার্দির কবিতার স্বাদ থেকে পাঠকদের একেবারে বঞ্চিত করলে এই প্রসঙ্গের অঙ্গহানি ঘটবে, সুতরাং তাঁর দুটি কবিতা আমি উদ্ধার করছি —একটি মূলে ও একটি অনুবাদে। মূল কবিতাটি বিষ্ণু দে'র উক্ত সমালোচনায়

গোটা ছাপা হয়েছিল ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। অনুবাদটি নীরেনের করা; এটি বেরিয়েছিল ১৩৩৯-এর বৈশাখ সংখ্যায়। সুতরাং দুই ক্ষেত্রেই নির্বাচন আমার চাইতে অনেক পাকা হাতের।

নীরেনের অনুবাদ :

জানি তুমি করিবে না শোক
আমি যবে হইব বিগত,
তোমার কবরী হ'তে খসা
অযতন কুসুমের মতো।

তবু কোন ঝড়-ওঠা দিনে,
কোন এক দীপ-জ্বালা সাঁঝে,
ফুটি-ফুটি ফুলটির প্রায়
চঞ্চলিবে তব মর্ম মাঝে।

ম্লান হেসে মোরে মনে হবে,
হাত হ'তে বই যাবে প'ড়ে,
দীপ-পানে রহিবে ঝুঁকিয়া,
চেয়ে রবে কোন্ দিগন্তরে।

এই কবিতাটির মামুলি রোম্যান্টিকতা একেবারে মূলগত, অনুবাদকের কলম শুধু তার অনুলিখন করেছে। কিন্তু বিষ্ণু দে-কর্তৃক উদ্ধৃত 'অ্যাট টেনিস' (At Tennis) কবিতাটি রোম্যান্টিক হ'লেও, ঠিক মামুলি ধরনে নয়।

Friend, the world smashes in my brain—
Girders and plinths, limbs and scars!
In the sudden upheaval of unbidden centuries
The lands convulse with cataclysmal speed.
Flaming wide-nostrilled monsters plunge
Across the convex of the skies.
I stretch torn hands to reach your piteous hands;
I seek through tattered space your ample eyes.

But you,
Stranger to apocalyptic needs,
In the narrow orb of your accurate mind
Rotate from hour to hour :
Dinner for two ;
Tennis at four ;
Odol and powder before going out to friends ;
Cautious caresses ;
Honourable amends ;
Lips painted to the crimson of a wound
After sentimental flutters ; –
Whatever happens one should go to sleep
Carefully drawing to the shutters.…
Oh ! Passion lion-hearted, that ruled calamitous wilds,
Browses on will-laid lawns, a weary sheep.

আধুনিকতার সাধনায় সাহেদ সুরাওয়ার্দির চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন ব'লেই বিষ্ণু দে তাঁর সমালোচনায় মন্তব্য করেছিলেন : "শাহেদ সুরাওআর্দি ইরানী-ইংরেজি শেষ ক্যাভালিঅর্। দ্বিতীয় চার্লস্ আজ মৃত, সপ্তমের নাতি অষ্টম এডোআর্ড আজ বনবাসে, যাযাবর ইরানীরা আজ অনেকেই ইউ-এস্-এস্-আরে প্রগতিশীল – তাই সুরাওআর্দির At Tennis-এ মনে হয়" – তারপর ঐ-উদ্ধৃতি।

পাঠকেরা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন কবিতাটির সম্পূর্ণ বিদেশী আবহাওয়া। এই আবহাওয়া বহন ক'রে যে-নাগরিক কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন পরিচয়-গোষ্ঠিতে তাঁর প্রবেশ ছিল একদিন-না-একদিন অনিবার্য। অপূর্ব চন্দ বলতেন, সুধীন সাদা চামড়াকে আকর্ষণ করে চুম্বকের মতন। সাহেদ সুরাওয়ার্দির চামড়া যেমনই হোক, অন্তরে ছিলেন তিনি বিদেশী, ভারতবর্ষকে দেখতেন প্রায় বিদেশীর চোখেই। তখনকার কথা বলছি, এখন কিরকম জানি না। একদিন খুল্লতাত সার আবদুল্লা সুরাওয়ার্দির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সাহেদ সুরাওয়ার্দি আমাকে বলেছিলেন, "ইনি এখন একজন মাতব্বর পলিটিসিয়ান। দেশে ফিরে দেখি মুসলমান সম্প্রদায়ের যত ব্যাটা বদমায়েস সবাই হয়ে উঠেছে

পলিটিসিয়ান।" কথাগুলি সাহেদ সুরাওয়ার্দি বলেছিলেন ইংরেজিতে, ঠিক ভাষা মনে নেই, কিন্তু 'স্কাউন্ড্রেল' কথাটি যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা স্পষ্ট মনে পড়ে। সার আবদুল্লা এই শুনে হাসতে-হাসতে আমাকে বাংলাতেই বললেন, "দেখলেন তো মশায়, ভাইপোর কাণ্ড।" সুরাওয়ার্দি-পরিবারে বাংলার চলন ছিল অল্প, কিন্তু সাহেদ সুরাওয়ার্দির মুখে দু'একটি শব্দ ছাড়া বাংলা বুলি কখনো শুনি নি।

অক্সফোর্ড-এ সাহেদ সুরাওয়ার্দি ও অপূর্ব চন্দ ছিলেন সমসাময়িক, বোধহয় সাহেদ সুরাওয়ার্দি কিছু আগে সেখানে গিয়ে থাকবেন, কেননা অপূর্ববাবুর চেয়ে তিনি বয়সে বছর-কয়েকের বড়। যতদূর মনে পড়ে অপূর্ববাবুই সাহেদ সুরাওয়ার্দিকে প্রথম পরিচয়-এর আসরে নিয়ে আসেন। তারপর সুধীনের আকর্ষণে ও আড্ডার প্রলোভনে সাহেদ সুরাওয়ার্দি নিজে জ'মে গেলেন, আমাদের আড্ডাও জমালেন। অমনধারা আড্ডা-মাতানো গ'ল্পে লোক আর দেখি নি – দু'জন বাদে। একজন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ; পরিচয়-এর আড্ডায় তিনি কখনো আসেন নি ; পরিচয়-এ তাঁর কোন লেখাও ছাপা হয় নি। আর-একটি আমাদের ঘরের লোক – ধূর্জটি মুখার্জি। অবশ্য ধূর্জটিবাবু একটু অনিশ্চিত, প্রায় শিশুসুলভ, মেজাজের লোক – তাঁর লেখা থেকেই তা যথেষ্ট মালুম হয়। কিন্তু মেজাজে থাকলে যেমন জমে এঁর রচনা, তেমনি এঁর মুখের বচন। নানা ঘাটের জল খেয়ে, নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে সাহেদ সুরাওয়ার্দি দেশে ফিরেছিলেন হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে ও পাকাপোক্ত চরিত্র নিয়ে ; এই চরিত্রে মেজাজের আমেজ কিছুই ছিল না। একটু বিচ্ছিন্ন কৌতুকের, প্রায় অবজ্ঞার সঙ্গেই, সাহেদ সুরাওয়ার্দি সবকিছু দেখতেন, অবশ্য আমাদেরও, আর দেখাশোনার বৃত্তান্ত আমাদের শোনাতেন – আবার বিষ্ণুর ভাষা ধার করছি – নাগরিকোচিত বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে।

কালের স্রোতে ভেসে গেছে সাহেদ সুরাওয়ার্দির সে-সব বিদগ্ধ বচন, কিন্তু পরিচয়-এর পাতায় তাঁর তিনটি রচনা এখনো সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর প্রশস্ত সংস্কৃতির : একটি প্রবন্ধ ও দুটি সমালোচনা। তিনটিই ইংরেজি থেকে অনুবাদ ক'রে পরিচয়-এ ছাপা হয়েছিল, কিন্তু অন্য পত্রিকা থেকে নয় ; রচনাগুলি লেখা হয়েছিল পরিচয়-সম্পাদকের বরাতে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়, 'আধুনিক নাট্যপ্রসঙ্গ' নামে। এতে পরিচয় পাওয়া যায় নাট্যকলা সম্বন্ধে লেখকের ব্যাপক জ্ঞানের। সমালোচনা দুটিই

পরবর্তী সংখ্যায়। একটি চার্লস
বেরিয়েছিল ঐ-বছরেরই কার্তিক অর্থাৎ
মর্গান-এর উপন্যাস 'ফাউনটেন'-এর (বইটি তখন খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল),
আর-একটি হুমায়ুন কবিরের সদ্যপ্রকাশিত 'পোয়েমস্'-এর। এই দ্বিতীয়
সমালোচনাটির দুটি অংশ উদ্ধার ক'রে সুরাওয়ার্দি-প্রসঙ্গ শেষ করা যাক:

"কাব্যগ্রন্থে ভূমিকা আমার কোনদিনই পছন্দ হয় না; আর যে-
মুখবন্ধ দিয়া হুমায়ুন কবির মহাশয় তাঁহার ক্ষীণকায় কবিতাপুস্তক আরম্ভ
করিয়াছেন তাহার মতো বিরক্তিকর ভূমিকা আমি খুব কমই পড়িয়াছি।
তাহাতে এই সংবাদটি দেওয়া আছে যে পুস্তকস্থ প্রায় সবগুলি কবিতাই অল্প
কয়েকদিনের মধ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। মনে হয় এ তথ্যটি নিতান্ত
বাহুল্য। যে-পাঠকের কিছুমাত্র রসবোধ আছে তিনি ইহার কয়েকটি কবিতা
পড়িয়াই কাঁচা ও চঞ্চল হাতের পরিচয় পাইবেন।"

এরপর:

"কবির মহাশয়ের গ্রন্থ দুটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের অবতারণা করে।
ভারতীয়ের পক্ষে ইংরাজীতে কবিতা লেখা উচিত কি? এ প্রশ্নের বিচার
করা এখানে অসম্ভব। এটুকু আমরা জানি আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয়ের
ইংরাজী কবিতা মাতৃভাষায় লিখিত কবিতার উৎকর্ষ বা স্থায়িত্ব লাভ করে
নাই। শুধুই difference in atmosphere, tradition and back-
ground—যাহার উল্লেখ কবির মহাশয় করিয়াছেন—ইহার সম্পূর্ণ কারণ নয়।
বোধহয়, আমাদের মেজাজ ইংরাজী ভাষায় ভাবপ্রকাশের অনুপযুক্ত। ইংরাজী
ভাষার প্রকৃতি আমাদের উচ্ছ্বাসপ্রিয়তার বিরোধী। অপর প্রশ্নটি এই, অনুবাদে
মূলের গুণবৃদ্ধি হয় কি না। কবির মহাশয়ের ক্ষেত্রে হইয়াছে বলিয়া মনে
হয়। কিন্তু প্রকৃত কবিতার লক্ষণই এই যে তাহা অননুবাদ্য।... কাব্যে ভাব ও
ভাবচ্ছন্দ ভাষার সংযোগে এমনই প্রাণময় যে এক হইতে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করা
অসম্ভব। কবির মহাশয় এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিলে ভাল করিবেন। ইহা
নিঃসন্দেহ তাঁহার রচনায় সাফল্যের আভাস আছে। আর আছে বাংলা ও
ইংরাজী দুভাষাতেই দক্ষ পরিচালন-শক্তির পরিচয়। কিন্তু যতদিন না তিনি
স্বকীয়তর প্রতীকাবলী ও রচনারীতি অর্জ্জন করিতে পারেন, ততদিন তাঁহার
কিছু না লেখাই ভালো।"

ফাল্গুন সংখ্যায় সাহেদ সুরাওয়র্দি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলাম পরিচয়-এ
প্রকাশিত তাঁর তিনটি রচনার কথা। দুটি সমালোচনা ও একটি প্রবন্ধ।
সমালোচনা দু'টির মধ্যে একটির বিষয় ছিল হুমায়ুন কবিরের ইংরেজি বই
'পোয়েমস্'। এরই শেষ অংশ থেকে খানিকটা তুলে দিয়ে গতবারের কিস্তি
শেষ করেছিলাম। বর্তমান কিস্তি লিখতে গিয়ে মনে হ'ল নাটক ও রঙ্গমঞ্চ
সম্বন্ধে বাংলা দেশে, বিশেষ ক'রে প্রগতিপন্থীদের মহলে, এখন যে-আগ্রহ
দেখা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে সুরাওয়ার্দির 'আধুনিক নাট্যপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি
(শ্রাবণ ১৩৩৯) বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সমালোচনা দু'টির মতন সুরাওয়ার্দির ঐ-প্রবন্ধটি মূল ইংরেজি থেকে
অনুবাদ ক'রে পরিচয়-এ ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধটির অনুবাদে সুধীন দত্তের
হাতের ছাপ অতি স্পষ্ট। দু'একটি নমুনা তুলে দিচ্ছি, তা থেকে প্রমাণ হবে
আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে লেখকের দরদী ও বিচারশীল মনের ও অনুবাদকের
অসাধারণ নৈপুণ্যের। প্রবন্ধটির গোড়ার কথা:

"য়ুরোপের আধুনিক নাট্যসমালোচনার সঙ্গে যিনিই সুপরিচিত, তিনিই
প্রায় শোনেন যে রঙ্গালয়ের এখন শনির দশা। আসলে য়ুরো'পীয় নাটকের
ইতিহাসে, সেনেকার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত, কখনো এমন যুগ ছিলোনা, যখন
এই সঙ্কট দেখা যায়নি। অবশ্য দুর্দ্দশার অবস্থাভেদ আছে।... কয়েক বছর
আগে... সকলে ভয় পেয়েছিলো যে নির্ব্বাক ছবির আক্রমণে বুঝিবা তার
চিহ্নমাত্র বাকি থাকবেনা।... অবশেষে যখন মনে হলো, এই প্রতিযোগিতায়
আত্মরক্ষা করা তার সাধ্যে আর কুলোবেনা, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সবাক ছবির
প্রাদুর্ভাব তাকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে তুললে।"

এরপর লেখক করেছেন নাট্যকলার সংজ্ঞানির্দেশ পাঠ্য-সাহিত্যের ও দৃশ্য-
নাটকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ক'রে:

"সাহিত্যবিচারে সাধারণ পাঠকের যতটা মূল্য, নাট্যানুষ্ঠানের সার্থকতা-
পরিমাপে সাধারণ দর্শকও তদনুরূপ হতে পারে, তবু, কোনো-না-কোনোখানে
নাটক ও যথার্থ নাট্যামোদীর মধ্যে একটা রহস্যময় যোগসূত্র আছেই আছে।
ফলে নাট্যামোদীর রুচি যেমন নাট্যশালার প্রভাবে গ'ড়ে ওঠে, তেমনি
নাট্যশালাও নাট্যামোদীর বশবর্ত্তী হয়ে পড়ে। আসলে নাটকের সঙ্গে

সাহিত্যের প্রভেদটা অন্য গোত্রের। সাহিত্য রচিত হয় বাসগৃহের নীরব নির্জনতায়, যে-নামহীন জনতাকে সে ডাক দেয়, তার অস্তিত্ব হয়তো না-ও থাকতে পারে। কিন্তু নাটক ও দর্শকের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, এমন-কি ব্যক্তিগত; মানুষ আপনার অজ্ঞাতসারে শিল্পসৃজনে সমর্থ কি-না, তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে এই নাটক-দর্শকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়।”

লেখক এই প্রসঙ্গে ফিরে গিয়েছেন প্রবন্ধটির উপসংহারে :

“সাহিত্যের সঙ্গে নাট্যকলার আত্মীয়তা সত্যই ঔৎসুক্যময়। সাহিত্যের গুণাগুণ যেমন প্রযোজনশিল্পের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি অভিনয়-শিল্পের সংস্পর্শ এসে পৌঁছয় সাহিত্যে। এই জন্যেই, গোড়াকার চক্ষুচমৎকারী নাটকগুলো বাদে, মস্কো আর্ট থিয়েটারের দৃশ্য-পরিকল্পনা, উচ্চারণপ্রণালী, ইত্যাদি সমগ্র অভিনয়পদ্ধতি চেকোফের রচনার আবেগ-ব্যঞ্জনার কড়িকোমল গুণে বদলে গিয়েছিলো; এবং আজ পর্যন্ত সেই পরিবর্তিত অবস্থাতেই আছে। এমন-কি মনে হয় যেন এই মৃদুস্বভাব রেখাশিল্পীদের প্রায় সকলেই অন্তরের আবেগকে বীরোচিত ব্যক্তিস্বরূপে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে অপারগ হয়ে পড়েছে।...

“নানা ধরণের নাটকে নানা রকমের নাট্যশিল্পের প্রয়োজন হয়, কাজেই সম্প্রতিবিদ নাট্যশালাগুলোকে বাঁচতে হলে উপযোগী নাটকের আবশ্যক। এক মতসর্ব্বস্ব লেখক ছাড়া নাট্যকারমাত্রেই নানাশ্রেণীর নাটক লিখে থাকেন, তার মধ্যে কোনোটা হয়তো আষাঢ়ে, কোনোটা রীতিপ্রধান, কোনোটার প্রসঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক, কোনোটার বা ঐতিহাসিক, আবার এক-একটা হয়তো বাস্তবপন্থী। ফলে আজকালকার অতি আধুনিক রঙ্গালয়ে সাহিত্যের আমদানী অত্যন্ত অল্প। কিন্তু উপযুক্ত উপাদান পেলে মায়ারহোল্টের বিপ্লব-প্রচারিণী নাট্যশালা সুদ্ধ কী রকম অপরূপ শিল্পসৃজনে সমর্থ হয়, তার প্রমাণ মিলে 'হার্ল ও চায়না'-নামক চৈনিক শ্রমিকসংঘর্ষের নাটকখানির অভিনয়ে। তবে এই প্রসঙ্গে সোভিয়েৎ কারখানাও বেশি নাটক তৈরি করতে পারছেনা। সুতরাং স্বয়ং মায়ারহোল্টও এখন ধ্রুপদী রুষ নাটকগুলোর বৈহাসিক অনুকরণে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। এর ফলে নাট্যসম্বন্ধে কতকগুলো চমৎকার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়ে থাকলেও, তাঁর অবস্থা এখন মামুলি প্রযোজকদের মতোই বৈচিত্র্যবিহীন। অতএব দেখা যাবে প্রবন্ধের প্রস্তাবনায় যে সঙ্কটের উল্লেখ করেছিলুম, তার সমাধান এখনো সুদূরপরাহত। শুধু সেইদিন সে-দুর্দ্দশার অবসান হবে যবে উপযোগী সাহিত্যের বন্যা রঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ করবে। এযুগের কারু-

কৌশলের আবিষ্কারগুলি নাট্যকলার ভবিষ্যৎকে কী পরিমাণে প্রশস্ত ও সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলেছে, তা বোঝা যাবে শুধু সেই শুভদিনে।”

যদিও 'আধুনিক নাট্যপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি কুড়ি বছর আগে লেখা ও যদিও অনেক বিষয়ে সুরাওয়ার্দির মতের সঙ্গে এখনকার প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের মতের একেবারেই মিল নেই, তবু ঐ-প্রবন্ধটি এখনকার দিনেও রঙ্গমঞ্চ ও নাটক-সংক্রান্ত আলোচনার উৎকৃষ্ট ভূমিকা হিসাবে গ্রাহ্য হবার দাবি রাখে। সুরাওয়ার্দির উল্লিখিত 'উপযোগী সাহিত্যের বন্যা' বাংলা রঙ্গালয়ে 'পুনঃপ্রবেশ' দূরের কথা, কোনদিনই প্রবেশ করে নি। মনে পড়ছে, একবার কথাপ্রসঙ্গে এডওয়ার্ড টম্‌সন্‌ বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে নাটক ও সমালোচনা এ'দুয়ের একটিও পরিণতি লাভ করে নি। বোধহয় আগের এক সংখ্যায় টম্‌সন-এর এই মত উল্লেখ করেছি। 'নীলদর্পণ' নাটক রঙ্গমঞ্চের আদিযুগের পর শুধু কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল। তারপর গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর কল্যাণে অবশ্য বাংলা রঙ্গালয়ে নাটকের বন্যা বয়েছিল। কিন্তু তা 'উপযোগী সাহিত্য' কিনা সন্দেহ। আর রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি উঁচুদরের সাহিত্য হলেও, প্রথমত, সেগুলি বেশিরভাগই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নয়; দ্বিতীয়ত, ঐ-কয়টি নাটকে তো আর বন্যা সৃষ্টি করতে পারে না। বাঙালি হ'য়ে জন্মেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সাহেদ সুরাওয়ার্দির কোনদিনই তেমন পরিচয় ঘটে নি। ঘটলেও এ-কথা তিনি উপলব্ধি করতেন কিনা জানি না, যে, বাস্তবতাবোধের অভাবই বাংলা নাট্যসাহিত্যের অনুপ-যোগিতার প্রথম কারণ।

নাটকের প্রাণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত। এর মধ্যে বাস্তবতার অভাব ঘটলে নাটক জমবে না, কেননা সুরাওয়ার্দিরই ভাষায় 'নাটক ও দর্শকের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, এমন-কি ব্যক্তিগত', তাই শুধু ভাবাবেগ বা বর্ণনার ঐশ্বর্য দিয়ে বাস্তবতার অভাবমোচন রঙ্গালয়ে অসম্ভব। আষাঢ়ে বা পৌরাণিক নাটক দিয়ে রঙ্গালয়ের পুরো খোরাক জোগানো কখনো সম্ভব নয়।

বাস্তবতা ও সাহিত্য

সুরাওয়ার্দি রঙ্গালয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা শ্রেণীর নাটকের মধ্যে 'বাস্তবপন্থী' নাটকের উল্লেখ করলেও তার ওপর মোটেই জোর দেন নি। কিন্তু বাস্তবতা সম্বন্ধে তখন বাংলা দেশের একাধিক লেখক যে সজাগ হয়েছিলেন তার প্রমাণ

কল্লোল-এর যুগের নয়—সত্যিকারের
পরিচয়-এর পাতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। সেইসময়ের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি নিচে দিলাম।
বাস্তবতাবোধ। প্রবন্ধটি হুমায়ুন কবিরের 'সাহিত্যে বাস্তবতা' (কার্তিক ১৩৩৯)। কবির
এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

"সকল সাহিত্যই যে প্রপাগ্যাণ্ডা বা কেবলমাত্র মতামত প্রকাশমূলক হবে এমন কথা কেহই বলে না। কিন্তু কোন কথা বলতে গেলেই তাতে কোন-না-কোন মত প্রকাশ পায়, এবং সেভাবে সাহিত্যে যদি মতামত প্রকাশ না থাকে তবে সে সাহিত্যের জীবনের সঙ্গে যোগ শিথিল হয়ে আসে।"

প্রবন্ধটির শেষের দিকে লেখক অভিযোগ করেছেন :

"বাংলা সাহিত্যে অবাস্তবতা যে কত বেশী তার কেবল আর একটীমাত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে এ প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।...

"এদেশে আজ প্রায় সাতশো বছর হিন্দুমুসলমান পাশাপাশি ঘর করেছে। দুঃখে সুখে, শান্তি অশান্তিতে, কলহকোন্দলে, বন্ধুত্বমিলনে তাদের সম্বন্ধ কি কখনো রাঙিয়ে ওঠে নাই? বন্ধুত্ব শত্রুতা জাতিধর্ম্ম মেনে চলে না। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কাউকে আমরা ভালবাসি, কাউকে হিংসা করি, কাউকে ঘৃণা করি। কারু সঙ্গে শৈশবের পরিচয় যৌবনের বন্ধুত্ব গ'ড়ে তোলে। কারু সঙ্গে জাতিধর্ম্মভেদের পার্থক্যের সঙ্গে স্বার্থ-বৈভিন্ন্য মিলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কিন্তু সন্ধির পথেই হোক আর দ্বন্দ্বের পথেই হোক, জীবনে কেবলমাত্র হিন্দু বা কেবলমাত্র মুসলমানের ছায়া পড়েছে এমন লোক বাংলাদেশে বেশী নাই। যেখানে বাতাস এক, আবহাওয়া এক, নদনদী খালবিল এক, একই মাঠে পাশাপাশি কাজ করতে হয়, একই গাঁয়ে ঘর বেঁধে থাকতে হয়, সেখানে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের গায়ের বাতাস বাঁচিয়ে চলবে কেমন ক'রে? কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কোথাও কি তার ছায়াটুকুও পড়েছে? সমস্ত বাংলা সাহিত্য প'ড়েও কি কেউ ভাবতে পারে যে সাতশো বছর এত বড় দুটো জাতি এমনি ক'রে পাশাপাশি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেছে?... বাংলা সাহিত্য বাংলার জাতীয় জীবনের এ বৈচিত্র্যকে রূপ দিতে পারে নাই, তাই জীবনের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যে বাংলা সাহিত্য আজো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নাই।"

বাস্তবতাবোধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে কবির নিজের বাস্তবতাবোধের অভাব প্রমাণ করেছেন এই উক্তিতে।

অবশ্য কথাগুলি লেখা মনের দুঃখে। এই দুঃখ অকারণ নয়। বাংলা দেশের মুসলমানের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অতি সামান্য, এই কারণে হিন্দু মধ্য-বিত্তের তুলনায় মুসলমানের সংখ্যাও নগণ্য। ফলে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে-স্তরে কবির পৌঁছেছিলেন সেখানে দু'একটি বাদে মুসলমানদের সাহচর্য পাওয়ার কোনই উপায় তাঁর ছিল না। তাই স্বভাবতই হিন্দু ইন্টেলেক্চুয়্যালরা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল—এই টানেই তিনি ভিড়েছিলেন পরিচয়-এর আড্ডায়। সাহেদ সুরাওয়ার্দি বা কবিরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরিচয়-এর লেখকগোষ্ঠীর উজ্জ্বল রত্ন, আইয়ুব—এই দু'জনেরও অবস্থা ছিল কবিরের মতন। কবিরের দরদী মনকে স্বভাবতই ব্যথা দিয়েছিল এইজাতীয় আড্ডায় বা ব্যাপকভাবে বাংলা সাহিত্যে তার নিজের সম্প্রদায় ও সমাজ সম্বন্ধে দরদের ও জ্ঞানের অভাব।

কিন্তু এই নিয়ে কবির যে অভিযোগ করেছেন তাতে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টির থেকে সেন্টিমেন্টই বেশি প্রবল। কবির লিখেছেন, বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে একই আবহাওয়ায়, একই খাল-বিল-নদীর পরিবেশে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সমাজ কবে এক হয়েছে? সমাজের যে-স্তর থেকে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব সেই স্তরে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক যোগাযোগ কোনদিনই হয় নি। এর জন্যে সমাজ ও ধর্মের অন্ধ সংস্কার অনেকটা দায়ী। এই গোঁড়ামি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, একে ঘা দেওয়া সাহিত্যিকের অবশ্যকর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তা করেছেন—শুধু হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে নয়, সাধারণ-ভাবে। অপরপক্ষে, সঙ্কীর্ণ হিন্দু সংস্কারের ও হিন্দু ঔদ্ধত্যের বীজ ছড়িয়ে আমাদের মনকে বিষাক্ত করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যাঁরা সাহিত্যে বাস্তবতার সমর্থক তাঁদের কর্তব্য এই দারুণ বিষ থেকে বাঙালির মনোবৃত্তিকে, বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করা। শুধু হিন্দু-মুসলমানের অবাস্তব কল্পিত মিলন দেখিয়ে তা সম্ভব নয়। কেননা, হিন্দু-মুসলমানের মিলন পুরোপুরি কোনদিন হয় নি। শুধু ধার্মিক ও সামাজিক গোঁড়ামির জন্যে নয়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে। এই রাজনীতির প্রবর্তক ব্রিটিশ-রাজ। তারই প্রত্যক্ষ ফল আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, পরোক্ষ ফল আমাদের সমাজ ও সাহিত্য। হিন্দু জমিদার

সরকারের গোলাম, গোলামের গোলাম মুসলমান ও হিন্দু প্রজা। বাংলা সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে প্রধানত মধ্যবিত্ত লেখকদের হাতে। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর সুখদুঃখ তাঁদের রচনায় আর কতটা ফুটতে পারে ?

মূল সমস্যা সাম্প্রদায়িক নয়, শ্রেণীগত বিরোধ। কবির এ-বিষয়ে মোটেই সচেতন নন। "জীবনে কেবলমাত্র হিন্দু বা কেবলমাত্র মুসলমানের ছায়া পড়েছে এমন লোক বাংলাদেশে বেশী নাই।" কবিরের এই কথা নিতান্তই ভাসা-ভাসা। সামাজিক আদান-প্রদান সামান্য হ'লেও সুখেদুঃখে বিজড়িত হিন্দু চাষী মুসলমান চাষী এবং অবশ্য হিন্দু-মুসলমান মজুর। কিন্তু যে-মাটিতে মজুরদের-চাষীদের বাস সে-মাটিতে এখনো সাহিত্য পৌছায় নি। পৌছাতে আরম্ভ করেছে সবে। এই মাটিতে সাহিত্য ফলাতে যে-সাধনার যে-সংগ্রামের প্রয়োজন কবিরের প্রবন্ধে তার আভাসমাত্র নেই।

'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা'

হুমায়ুন কবিরের চাইতে অনেক বেশি পরিণত দৃষ্টিতে, অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাহিত্য-সমস্যার আলোচনা করেছেন, ঐ একই যুগে, ধূর্জটিবাবু তাঁর 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে। এটি ছাপা হয়েছিল ঠিক কুড়ি বছর আগে।

বাংলা সাহিত্যের চরম দুর্বলতা মুসলমানী ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা, এই অভিযোগ জানিয়ে কবির ক্ষান্ত হয়েছিলেন। আর ধূর্জটিবাবু লিখেছিলেন :

"এ দেশে আমরা সকলে সমাজসত্বাকে পাশ কাটিয়ে আসছি, তাই আমাদের সাহিত্য আমাদের সমশ্রেণীর প্রাণেই কেবল সাড়া দেয়, জনসাধারণের কাছে তার কোনও আবেদন ও মূল্য নেই।...সমাজ গেল ভেঙ্গে, মানুষের ব্যবহার গেল বদলে, অথচ সাহিত্যিক খরগোশের মতন ভাবছেন চোখ বুজলেই বিপদ কেটে যাবে। তা হয় না, তা হয় না, তা হয় না। এখন চোখ খুলে দাঁড়াতে হবে, সমাজ ভাঙ্গার ও গড়ার শক্তিকে, তাকে বিজ্ঞানই বলুন আর শ্রেণী-বিরোধই বলুন – কি দুইই বলুন, আমার তাতে আপত্তি নেই, ব্যবহার করতে হবে।"

কবির চেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যকে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর থেকে মুক্ত করতে, আর ধূর্জটিবাবু চাইলেন, তার অল্পদিন পরেই, বাংলা সাহিত্যে শ্রেণীবিরোধ আমদানি করতে।

কবিরের এই প্রবন্ধের তুলনায় ধূর্জটিবাবুর প্রবন্ধে প্রগতিশীল চিন্তার ছাপ

যে অনেক বেশি স্পষ্ট ফুটেছিল তার আর-একটি নমুনা প্রোপাগ্যাণ্ডা সম্বন্ধে ধূর্জটিবাবুর এই উক্তি :

"সাহিত্য, অন্তত নবযুগের সাহিত্য, প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট হতে বাধ্য। রামায়ণে, মহাভারতে আর্যধর্ম, ক্ষাত্রধর্মের তরফ্‌দারি আছে; রবীন্দ্রনাথেও আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার; পুরাতন সমাজের বিপক্ষে এবং এখনকার নতুন সমাজের তরফে কিছু বলতে গিয়ে ব্যাস-বাল্মীকি-রবীন্দ্রনাথকেও প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট হতে হয়েছে। জনকয়েক যখন সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশে যায়, কিম্বা জনসাধারণে কোন কারণে, বুঝে, না বুঝে, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার দরুণ একটি শ্রেণীকে স্বীকার করে নেয়, তখন সাহিত্যের প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট হয়ে ওঠেন প্রকৃষ্ট। প্রোপাগ্যাণ্ডা হল জীবনস্রোতের এই ঘাটার ঢেউ।"

'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা'র মূল কথা :

"ইতিহাসের পটভূমিকায় নটের অভিনয়-অংশ সম্বন্ধে সচেতন না হলে কি করে চলবে? সাহিত্যে যে সমাজসত্তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক চেতনার প্রয়োজন। যে সেই সমাজ গড়বে, সেই বড় সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করবে।"

পরিচয় ও মার্কস্‌বাদ

মার্কস্‌বাদের মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যায় ঐ-প্রবন্ধটি ঠাসা। তখনকার দিনে ও-সব কথা নতুন ছিল। ভাবগঙ্গার ঘোলাটে জলে ফুটল লালের আভা।

ঐ-সময়ে একটির পর একটি প্রবন্ধে সুশোভন সরকার বর্ণনা করেছিলেন তখনকার ইয়োরোপের রাজনৈতিক অবস্থা। অত্যন্ত সরল ভাষায় সমসাময়িক ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য। পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে অনেকেরই তখন চোখ ফুটেছিল ঐ-লেখাগুলি প'ড়ে। শুধু 'তরুণ' ইন্টেলেক্‌চুয়্যালদের কথা বলছি না, তখনকার পরিচয়-এর একাধিক প্রবীণ পাঠকের মুখে ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি সুশোভনের ঐ-প্রবন্ধগুলির। অবশ্য ঐ-জাতীয় রচনা প'ড়ে যে তাঁরা নতুন সমাজ গড়ার তাগিদ বিশেষ ক'রে অনুভব করেছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এর কিছুকাল পরে সদ্য বিলেত-ফেরত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসে যোগ দিলেন পরিচয়-এর আড্ডায় ও লেখকগোষ্ঠীতে। পরিচয়-এর পাতায় লালের আভা আর-একটু গাঢ় হ'ল। কিন্তু এই রঙ প্রথম ফুটিয়েছিলেন ধূর্জটিবাবু তা ভুললে অন্যায় হবে।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাদে এদেশে রীতিমতো মার্কস্‌বাদ অধ্যয়ন ও আলোচনা ধূর্জটিবাবুর আগে আর কে করেছিলেন জানি না। ভূপেনবাবুও বাংলা দেশের সাহিত্যিক আসরে মার্কস্‌বাদের বার্তা প্রচার করেন নি। যেটুকু করতেন তা অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে গল্পে ও আলোচনায় বা এমন রচনায় যা সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে। ধূর্জটিবাবুরই মুখে শোনা একটি গল্প মনে পড়ছে। ভূপেনবাবু বেড়াতে গিয়েছিলেন দার্জিলিং-এ ও ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে ছিলেন একই বাসায়। হঠাৎ একদিন ভূপেনবাবু নাকি গাইতে শুরু করলেন:

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া—
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।

সংগীত-রসিক ধূর্জটিবাবুকে গান গেয়ে মুগ্ধ করার মতন গানের গলা যে তাঁর ছিল না ভূপেনবাবু তা বিলক্ষণ জানতেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের ঐ বিখ্যাত গানটির বিশুদ্ধ মার্কসীয় ব্যাখ্যা শোনানো। বিশেষ একটি কবিতার বিচারে মার্কসীয় পদ্ধতির প্রয়োগ বাংলা দেশে বোধহয় এই প্রথম। আশা করি ধূর্জটিবাবু একদিন ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাটির বৃত্তান্ত লিখবেন যাতে এ-যুগের পরিচয়-এর পাঠকেরা ভূপেনবাবুর ঐ-ব্যাখ্যার সঙ্গে নীরেনের 'উর্বশী' ও 'সোনার তরী' কবিতার বস্তুবাদী বিশ্লেষণ মিলিয়ে উভয়ের বিশ্লেষণ-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার করার সুযোগ পান। মনে রাখা দরকার, ভূপেনবাবুর ঐ-ব্যাখ্যা প্রাক্‌-কড্‌ওয়েল যুগের। ঐ-সময়ে বা কিছুকাল পরে বাংলা দেশে দু'একটি বামপন্থী কাগজের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঐরকম একটি কাগজে কোন লেখক নাকি লিখেছিলেন: রবীন্দ্রনাথ=ফিউড্যালিজ্‌ম্‌=ক্ষয়িষ্ণুতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতা বা ঐরকম কিছু অতি জঘন্য ব্যাপার। এই কথাও শোনা ধূর্জটিবাবুর মুখে। খুঁটিনাটি সব মনে নেই। তখন বামপন্থী সাহিত্যবিচারে মার্কসীয় পদ্ধতির থেকে বেশি ফুটেছিল বিনয়-সরকারী উগ্রতা। নইলে, অমন নিটোল ইকুয়েশন কোত্থেকে আসে? ধূর্জটিবাবু ঐ অপূর্ব সিদ্ধান্তের উল্লেখ করলেই খেপে উঠে বলতেন, "এই তোমাদের মার্কসবাদ।" ধূর্জটিবাবু স্বভাবতই খ্যাপা লোক, সুতরাং তাঁর গালিগালাজ গায়ে মাখার দরকার নেই। আর ঐ-যুগের 'আপনি মোড়ল' জাতীয় মূর্তিমান মার্কসবাদীদের মন্তব্যও ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, তাঁদের অনেকেই এখন মুখোশ খসিয়ে স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদ প্রয়োগ এ-যুগেও কি যথেষ্ট সুস্থ হতে পেরেছে?

এর আগের কিস্তিতে বাস্তবতাবোধ-প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির ও ধূর্জটি মুখুজ্যের দুটি প্রবন্ধের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছিলাম। এ হ'ল পরিচয়-যুগের বাস্তবতাবোধ। এর বহুদিন আগে যে একদা একাধিক বাংলা সাময়িক পত্রিকার পাতায় বাস্তবতা সম্বন্ধে রীতিমতো আলোচনা হয়ে গিয়েছিল সে-কথা আমার মনে ছিল না। মনে যখন পড়ল তখন যথাসম্ভব অর্থাৎ মাল-মশলার পরিমাণ অনুযায়ী ত্রুটি সংশোধন ক'রে নেওয়া যাক।

বিপিনচন্দ্র পাল জনসাধারণের কাছে সমধিক পরিচিত ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে চরমপন্থী দলের অন্যতম পুরোধা হিসাবে। এই পরিচয়ের স্মৃতিই আজ আমাদের মনে প্রবল হয়ে আছে। সাহিত্যিক বিপিনচন্দ্রের খ্যাতি এত বেশি ব্যাপক হয় নি। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি আজ প্রায় লুপ্ত হ'লেও বাংলা সাহিত্যের এক-একটি রত্ন। এরকম একটি লুপ্ত রত্ন তাঁর অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'চরিত-কথা' গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ। এইটি প্রথম প্রকাশিত হয় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর ১৩১৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। ঐ-প্রবন্ধটিতে বিপিনবাবু বোধহয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'বস্তুতন্ত্রতা' কথা ব্যবহার করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা বস্তুতন্ত্রতাহীন। এ-ক্ষেত্রে বিপিনবাবু বস্তুতন্ত্রতার বিচার করেছেন শুধু ধর্মসাধন প্রসঙ্গে। সুতরাং তাঁর 'বস্তুতন্ত্রতা' ঠিক আধুনিক বস্তুতন্ত্রতা কিনা বিবেচ্য। কিন্তু ঐ-প্রবন্ধেই পরে তিনি সরাসরি অভিযোগ আনেন যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বাস্তবতাবর্জিত। কেননা,

"আপনার জমিদারীর পল্লীসমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও, ঔদার্য্য সাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও, বাংলার পল্লী-জীবন ও বাঙালীর সাচ্চা প্রাণটা চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।"

বিপিনবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের ছিল "মায়িক" সৃষ্টির মোহিনী প্রভাবে মানুষকে মাতিয়ে তোলার ক্ষমতা। বিপিনবাবুর প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের রত্ন, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক রত্ন নয়। আলোচ্য প্রবন্ধটির কলঙ্ক

কোথায় অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৩১৯ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসী-তে তা বিশদভাবে আলোচনা করেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন' প্রবন্ধে। অজিতবাবু বিপিনবাবুর অভিযোগের যথোচিত জবাব দিতে পেরেছিলেন কিনা তা আমার আলোচ্য নয়, তাই ঐ-প্রবন্ধটির উল্লেখমাত্র করলাম।

বাস্তবতাবোধ ও বস্তুতন্ত্রতা : সবুজপত্র-যুগ

এরপর সবুজপত্র-যুগের বাস্তবতা-প্রসঙ্গে আর-একবার যে-আলোচনা হ'য়ে উঠল, রবীন্দ্রনাথ শুধু তার নিষ্ক্রিয় উপলক্ষ ছিলেন না; তাতে যোগ দিয়েছিলেন তীব্র উৎসাহে।

সবুজপত্র-এর প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২১) রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির একেবারে গোড়ায় আছে:

"লোকেরা কিছুই ঠিক-মত করিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সময় খারাপ পড়িয়াছে, এই সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া মানুষ দিব্য আরামে থাকে,... এটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

"অতএব যদি এমন কথা কেহ বলিত যে আজকাল বাংলা দেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোক-শিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব আমিও দেশের অবস্থাসম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে; এবং নিজেকে এই দলের বাইরে ফেলিতাম।

"কিন্তু একেবারে আমারি নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্যের তাহাতে যতই আমোদ হোক আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথ একালের বাংলা জানতেন না, তাই 'অংশ গ্রহণ করতে পারি না' লেখেন নি। যতই হোক, 'বাস্তব' প্রবন্ধটির উপলক্ষ ছিল ঐ-বছরেরই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবাসী-তে ছাপা ও শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ নিয়ে বিতর্কের শুরু। পুরানো প্রবাসী ঘেঁটে দেখবার সুবিধা হয় নি, প্রয়োজনও নেই, কেননা রাধাকমলবাবু তাঁর বক্তব্য আর-একবার আরো পরিষ্কার ক'রে জানালেন ১৩২১ সালের মাঘ মাসের সবুজপত্র-এর 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধে। এটি হ'ল রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধের জবাব।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পের গোড়ার কথা:

"আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়—কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।"

গল্পটি বেরিয়েছিল ১৩২১ সালের আষাঢ় সংখ্যার সবুজপত্র-এ অর্থাৎ প্রবাসী-র 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধের একেবারে সঙ্গে-সঙ্গে। রাধাকমলবাবু ঐ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে যে-রঙে রঞ্জিত করেছিলেন তাতে কালিমার আতিশয্য ঘটেছিল কিনা বলতে পারি না, কিন্তু তাঁর কথাগুলি যে কবির পক্ষে খুব মনোহারী হয় নি তার প্রমাণ 'বাস্তব' প্রবন্ধ। নতুবা তিনি লিখতেন না:

"যাঁহারা অবাস্তব-সাহিত্য সম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ খুলিবার কাজ করিতেছেন।"

এ হ'ল উষ্মার কথা। এ-জাতীয় উষ্মা রবীন্দ্রনাথের রচনায় মাঝে-মাঝে পাওয়া যায় ও তাতে তাঁর রচনার রস আরো গাঢ় হয়। আসল কথা হ'ল এই রস—রবীন্দ্রনাথের মতে। কিন্তু

"যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন—'দাঁড়ি-পাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিষটার বস্তু-পরিমাণ করা যায় না একথা সত্য কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ত প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।'

"নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইটেরই বস্তু পিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়?"

এখনকার দিনের বৈজ্ঞানিক সমালোচক সাহিত্যের যাচাই করতে গিয়ে রসের আধার সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত হন, কিন্তু তাই ব'লে শুধু নিরেট বস্তু-পিণ্ডকে সাহিত্যশিল্পের মানদণ্ড ব'লে নিশ্চয়ই মেনে নেন না। তখনকার

দিনের সমালোচক কী করেছিলেন দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথের জবাবে 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধে রাধাকমলবাবু লিখেছিলেন :

"সাহিত্যের চরমসাধনা হইতেছে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।"

"যুগধর্ম্ম প্রকাশ করিতে যাইলে সাহিত্যকে বাস্তবের সহিত আত্মীয়তা করিতে হইবে, সাহিত্যকে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বড়লোক, দীন, মধ্যবিত্ত, লোক-সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে, নিখিলের সংস্রবে না থাকিলে সাহিত্যে বাস্তবতা আসিবে না।..."

"সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি করে। রস জিনিষটার একটা আধার থাকা চাই;—সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্ত্তন হইতেছে;—যুগে যুগে বাস্তব বিভিন্ন হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসও বিভিন্ন হইতেছে।"

মনে হয়, মোটের ওপর রাধাকমলবাবু তো বেশ ভালো কথাই বলেছেন, তবে রবীন্দ্রনাথ এত উত্তপ্ত হয়েছিলেন কী কারণে? যতদূর মনে পড়ে, তাঁর প্রথম প্রবন্ধে রাধাকমলবাবু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে দু'চারটি দৃষ্টান্ত বাদে তাঁর রচনায় যথেষ্ট বস্তু পাওয়া যায় না, তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তখনকার রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত বাংলা সাহিত্য লোকশিক্ষার উচ্চ আদর্শে পৌঁছতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এই অভিযোগের উত্তরে :

"কিন্তু লোকশিক্ষার কি হইবে?

"সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

"লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখী কাঙালের ঘরকন্নার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড় বড় রাজা, বড় বড় রাক্ষস, বড় বড় বীর এবং বড় বড় বানরের বড় বড় ল্যাজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।"

রাধাকমলবাবু এর উত্তরে লিখলেন :

"রবীন্দ্রবাবু আধুনিক ভারতের একজন যুগনির্দ্দেষ্টা, আধুনিক ভারতীয় সমাজের তিনি একজন প্রধান শিক্ষক,—তাঁহার সাহিত্য আমাদিগকে এক নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতেছে—কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে আজ এ কি কথা!"

এরপর রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিবাদে রাধাকমলবাবু লিখেছিলেন :

"আমাদের দেশের লোকসাধারণের ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইয়াছে,—রামায়ণ মহাভারত।...রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাবলী অসাধারণ, ইহা কিয়দংশ সত্য বটে; কিন্তু অসাধারণ ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া কবি মানুষের এরূপ সাধারণ সুখদুঃখের কথা বলিয়াছেন...।" ইত্যাদি।

তারপর :

"সাধারণ লোক আপনার গরজে এ সাহিত্য পড়ে, এ কথা বলিলে কবি-প্রতিভাকে খর্ব্ব করা হইবে। কবি সাধারণের শিক্ষা ও আনন্দ দিবার জন্য এ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন,—এক্ষেত্রে সাধারণের গরজ নহে, কবিরই গরজ।"

এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের অনেক কথাই যে উষ্মার আবেগে লেখা তা আগেই বলেছি, তাই জায়গায়-জায়গায় মনে হয় তিনি যেন অনর্থক কলহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। রাধাকমলবাবুর লেখা বিশ্লেষণমূলক কিন্তু এই বিশ্লেষণ যে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক নয় তা আশা করি এখনকার পাঠকদের কাছে স্পষ্ট। কবি সচেতন ও সাক্ষাৎভাবে ও সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইস্কুল-মাস্টারির ভার অবশ্যই নেন না। কিন্তু তাঁর প্রতিভা সমসাময়িক সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা, সুখ-দুঃখ আত্মসাৎ ক'রে তাঁর রচনায় প্রতিফলিত করে ব'লেই তা শুধু সমসাময়িক নয়, ভাবীকালের শিক্ষার আনন্দের খোরাক হয়। যে-কবির প্রতিভা যত বেশি, সমাজের সঙ্গে যোগ যে-কবির যত নিবিড়, তাঁর বেলায় এই কথা তত বেশি খাটে। এই হ'ল মোটামুটি এখনকার কালের কথা। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর আগের লেখকের কাছে কী ক'রে এ-সব কথা প্রত্যাশা করা যায়? রাধাকমলবাবু তাঁর সমর্থনে জার্মান দার্শনিক রুডলফ্ অয়কেন্-এর 'মেন কারেন্টস্ অফ মডার্ন থট্' বই থেকে একাধিক অংশ উদ্ধার করেছিলেন। দুটি উদ্ধৃতি পুনরুদ্ধার ক'রে দিলাম :

"Was it not characteristic of the great works of art which have made a parmanent appeal to man that in them all opposition between form and content was overcome;

in their perfection of form have they not at the same time given full expression to the content of the inner life ? Should not art take up the problems of humanity and attempt to solve them after its own fashion ?"

যে-সব মহৎ শিল্পসৃষ্টিতে মানুষ নিত্যরসের সন্ধান পেয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য কি এই নয় যে, সেইসব সৃষ্টিতে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের বিরোধ একেবারে দূর হয়েছে, তাদের বহিরঙ্গের চরম উৎকর্ষ ফুটে উঠেছে মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশে ? মানব-জীবনের বিচিত্র সমস্যার বিচার ও স্বকীয় অভ্যস্ত রীতিতে এইসব সমস্যার সমাধানই কি আর্টের উদ্দেশ্য নয় ? গোলমাল হয়েছে ঐ inner life নিয়ে। রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন কবির অন্তরের অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদের কথা, বিশেষ জোর দিয়েছিলেন কবির অন্তরের ধ্রুব আদর্শের ওপর। তাই, প্রকৃত বাস্তব কী তার ব্যাখ্যা ক'রে তিনি লিখেছিলেন :

"ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মত আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে লোক ভয় করে, যে লোক বাঁধা-নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে তাহারা, ইংরেজই হউক্ আর বাঙালীই হউক্, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক জীবনের আঘাত জীবন জাগিয়া উঠে, মানব-চিত্ত-তত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।"

ভিতরকার বাস্তব কথাটি খুব জুতসই নয়, কিন্তু বাদ-বাকি কথাগুলি এখনকার বাস্তববাদীরা নিশ্চয়ই মূল্যবান ব'লে মেনে নেবেন। রাধাকমলবাবুর প্রবন্ধ থেকে অয়কেন্-এর আর-একটি লোভনীয় উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

"Literature has an obvious task. It should help to clarify our ideas, to bring to clear expression all that is around us and within us, to point out simple lines of development amidst the chaos of appearances with which we are surrounded. It should as far as possible gather life into a whole and at the same time assist in the work of developing

it. For this purpose it has need of an inner superiority to raise it above the oppositions of the age, of an energetic synthesis which can reject as well as absorb, of a courageous and powerfully progressive spiritual creation."

আমাদের নানা ধারণাকে স্পষ্টতর করা, আমাদের পরিবেশের ও আমাদের অন্তরের সকল বস্তুকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা, প্রত্যক্ষ জগতের বিচিত্র বিভ্রমের মধ্যে সহজ গতিপথ নির্দেশ করা—নিঃসন্দেহে এই হ'ল সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্যের কর্তব্য যথাসম্ভব জীবনকে অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত করা ও জীবনের পরিপূর্ণতর বিকাশে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যসাধন করতে হ'লে সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন সমসাময়িক সকল বিরোধের ওপরে উঠবার মতো স্বকীয় উৎকর্ষ, গ্রহণ ও বর্জন করবার মতো সক্রিয় সমন্বয়ের শক্তি, নব-নব উন্মেষশালী অধ্যাত্মসম্পদ সৃষ্টি করার মতো উদ্যোগ ও সৎ সাহস।

তখন অয়কেন্ ও বের্গসঁ মননশীল বাঙালির মনের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী তো কথায়-কথায় বের্গসঁর দোহাই পাড়তেন, তাই সুকুমার রায় উপহাস ক'রে 'ক্যাবলের পত্র' ব'লে একটি রচনায় লিখেছিলেন, "বের্গসঁ বলেছেন মানুষ আর যাতেই বাঁচুক মাথা কেটে ফেললে আর বাঁচে না।" ঠিক কথাগুলি আর মনে নেই। ঐ-রচনাটি বেরিয়েছিল সবুজপত্র-যুগের প্রবাসী-তে। পরে শনিবারের চিঠি-তে ওটি পুরোপুরি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

সম্পাদক হিসাবে প্রমথ চৌধুরীমশায় এই বিতর্কে যোগ দিলেও বের্গসঁর কথা এই প্রসঙ্গে একবারও বলেন নি, শুধু বার্নার্ড শ ও অয়কেন্-এর দু'চারটি কথা তুলে দিয়েছিলেন। সেগুলি এমন-কিছু নয়। রাধাকমলবাবুর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সবুজপত্র-এর যে-সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল ঐ-সংখ্যাতেই 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' এই প্রবন্ধে প্রমথবাবু নিজের প্রশ্নের জবাবে লিখেছিলেন :

"এ বাক্যটি বাঙ্গলাসাহিত্যে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং এই অপরিচিত আগন্তুক শব্দটির কুলশীলের সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

"এ বাক্যটি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নেই, দর্শনশাস্ত্রে আছে।"

এরপর শঙ্কর ঘেঁটে প্রমথবাবু আবিষ্কার করলেন যে, দার্শনিক অর্থে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানই হ'ল যথার্থ বস্তুতন্ত্রতা। তারপর,

"রাধাকমলবাবু অবশ্য যদ্‌দৃষ্টং তল্লিখিতং অর্থে ও বাক্য ব্যবহার করেন না ;

কেননা যে কবির হাতে বাঙলার মাটি এবং বাঙলার জল পরিচ্ছিন্ন মূর্তি লাভ করেছে তাঁর কাব্যে যে পূর্ব্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্রতা নেই এ কথা কোনও সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। দেশের রূপের সম্বন্ধে যিনি দেশসুদ্ধ লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন—তাঁর যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান নেই—এ কথা চোখের মাথা না খেয়ে বলা চলে না।"

অতএব :

"ইউরোপীয় সাহিত্যের Realism-ই নাম-ভাঁড়িয়ে বাঙলা-সাহিত্যে 'বস্তুতন্ত্রতা'-নামে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার বিচার করতে হলে অন্ততঃ দু কথায় এই Realism-এর পরিচয় দেওয়াটা আবশ্যক।"

অতঃপর ঠিক দু'কথার পরিচয় :

"Idealism-এর মূলকথা হচ্ছে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং Realism-এর মূলকথা জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা।"

প্রমথবাবু আরো লিখেছিলেন :

"রাধাকমলবাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইউরোপের গত-শতাব্দীর materialism-এর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনিই বই আর কিছু নয়।"

এই মেটারিয়ালিজম্ কী জাতীয় তার ব্যাখ্যা ক'রে প্রমথবাবু লিখেছিলেন:

"রাধাকমলবাবু উদ্ভিদ্-জগৎ হতে যে উপমা দিয়েছেন, ইউরোপে ঘোর materialism-এর যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে যোগসাধনের সেতু স্বরূপ ব্যবহৃত হত। মাটি জল আলো ও বাতাস প্রভৃতির যোগাযোগে জীব সৃষ্ট হয়েছে এবং জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তার মনের সৃষ্টি হয়েছে—এই বিশ্বাসবশতঃই ইউরোপের একদল বস্তুতান্ত্রিক-দার্শনিক ধর্ম্ম কাব্য আর্ট নীতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপার সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ওরূপ ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থারই বর্ণনা করা হয়েছিল—কাব্য প্রভৃতির বিশেষ-ধর্ম্মের কোনও পরিচয় দেওয়া হয় নি। দার্শনিক ভাষায় বলতে গেলে তাঁরা কাব্যের উপাদান-কারণকে তার নিমিত্ত-কারণ বলে ভুল করেন।"

এই অভিযোগ অবশ্য যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও পারিপার্শ্বিক প্রভাববাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রমথবাবু কোনদিনই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মেনে নেন নি, ফলে তাঁর লেখায় নানা উল্টো-পাল্টা কথা পাওয়া যায়। যেমন,

"গাছের ফুল আকাশে ফোটে, কিন্তু তার মূল যে মাটিতে আবদ্ধ—সে কথা

আমরা সকলেই জানি; সুতরাং কবিতার ফুল ফুটলেই আমরা ধরে নিতে পারি যে মনোজগতে কোথাও-না-কোথাও তার মূল আছে। কিন্তু সে মূল ব্যক্তি-বিশেষের মনে নিহিত নয়,—সমাজের মনে নিহিত,—এই হচ্ছে নূতন মত। এ মত গ্রাহ্য করবার প্রধান অন্তরায় এই যে, সামাজিক মন বলে কোন বস্তু নেই; ও পদার্থ হচ্ছে ইংরাজিতে যাকে বলে abstraction."

শেষ পর্যন্ত প্রমথবাবু রায় দিয়েছেন এই ব'লে :

"Realism-এর পুতুল-নাচ এবং Idealism-এর ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে সে কারণ যা হয় বস্তুহীন, নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়।"

খুবই ভালো কথা। কিন্তু এর পরও একটু খোঁচা আছে, তা একেবারেই বীরবলীয়। যথা :

"Realism-এর উচ্চবাচ্য ইউরোপীয় সাহিত্যেই যখন বিরক্তিজনক, তখন বাঙলা-সাহিত্যে তা একেবারেই অসহ্য। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে বস্তু-জগতের উপর প্রভুত্ব—অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিক দর্শন আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। ...ইউরোপ পঞ্চভূতকে তার দাসত্বে নিযুক্ত করেছে—আর আমরা তাদের পঞ্চ দেবতা করে তোলবার চেষ্টায় আছি।"

মোট কথা, প্রমথবাবু যুক্তিবাদের তরোয়াল খেলেছেন বীরবলী কায়দায়। এইরকম বেপরোয়া তরোয়াল খেলার বিপদ এই যে, এতে শুধু প্রতিপক্ষের নয়, নিজেরও মাথা কাটা যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রে খেলোয়াড় অতি সাবধানে নিজের ও রবীন্দ্রনাথের মাথা বাঁচিয়েছেন। কিন্তু রাধাকুমুদবাবুর মাথায়ও যে বিশেষ চোট লেগেছে তা মনে হয় না, কেননা তাঁর লেখাটি সুযুক্তিতে ঠাসা। অনুমান হয়, রাধাকুমুদবাবুর বয়স তখন বছর-পঁচিশেকের বেশি ছিল না। ঐ-বয়সে অতখানি সাফল্যের সঙ্গে ঐরকম জটিল বিতর্কে বাংলা সাহিত্যের একেবারে মহারথীরা বাদে আর ক'জন নেমেছেন জানি না।

পাঠকদের আর-একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। একদা রবীন্দ্রনাথের মুখেই আমরা শুনেছিলাম যে 'সহিত' থেকে সাহিত্য কথাটির উৎপত্তি, অর্থাৎ সাহিত্যের ভিত্তি সমাজ। কিন্তু স্থূল হস্তের খোঁচা খেয়ে অনেকসময়ে সাহিত্য-কলা সম্বন্ধে তিনি অনেক এলোমেলো কথাও বলেছেন ও যখন-তখন সাহিত্য-কলা প্রসঙ্গে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন ভাববাদীর রসবিলাসে। কিন্তু সবুজপত্র-এর 'বাস্তব' প্রবন্ধে তাঁর সবচাইতে মূল্যবান কথা এই যে, "যেখান হইতে যেমন

করিয়াই হোক, জীবন হইতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানব চিত্ততত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।" রোম্যান্টিক হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রচনা এই-জাতীয় সংক্রামক মানবতায় মহীয়ান।

বাস্তবতা প্রসঙ্গের জের

গত আষাঢ় সংখ্যায় সবুজপত্র-যুগের বাস্তবতাবোধ আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম একবারে শেষের দিকে দুইবার 'রাধা-কুমুদ'-এ বিকৃত হয়েছে। এ-বিকার মুদ্রণপ্রমাদ নয়। এর জন্য দায়ী লেখকের কলম। রাধাকুমুদ ও রাধাকমলবাবু উভয়েরই পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ভূ-ভারতে ব্যাপ্ত; কিন্তু একের পাণ্ডিত্য অপরের ঘাড়ে চাপানো অমার্জনীয়। অতএব এই ত্রুটির জন্য পাঠকদের ও বিশেষভাবে মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে আমি মার্জনা ভিক্ষা করি।

আরো একটি কথা, মনে যখন পড়ল, পাঠকদের জানিয়ে দেওয়াই বিধেয়। রাধাকমল ও রাধাকুমুদবাবু উভয়েই তাঁদের উচ্চস্তরের গবেষণার পরামর্শ ও প্রেরণা বহুলত পেয়েছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছে—অন্যান্য বহু বাঙালি গবেষকের মতন। সুতরাং এই অনুমান বোধহয় অসঙ্গত নয় যে বাস্তবতা-প্রসঙ্গে রাধাকমলবাবু যে-মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তাতে আচার্য মহাশয়ের অনেকটা প্রভাব, অন্তত সমর্থন ছিল।

শিবের গীতের পালার এবারের মতন এখানেই শেষ।

বিতর্কের কথা যখন উঠেছে তখন বিতর্ক দিয়ে আবার ধান ভানা শুরু করি।

ইতিপূর্বে লিখেছিলাম যে, ত্রৈমাসিক কাগজে বিতর্ক জমা কঠিন হ'লেও ছন্দ-সংক্রান্ত বিতর্ক পরিচয়-এর পাতায় ভালোই জমেছিল। পাঁচ বছর ত্রৈমাসিক অবস্থায় কাটিয়ে পরিচয় হ'ল মাসিক। সুতরাং বিতর্ক জমার আর কোন বাধাই রইল না। একটি বিতর্কের কথা বলি।

হিন্দু, অহিন্দু ও আশানন্দ নাগ

১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসের পরিচয়-এ 'অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজ' প্রবন্ধে লেখক আশানন্দ নাগ অভিযোগ জানান যে,

"সাধারণ হিন্দু হিন্দুধর্ম ও হিন্দুকৃষ্টিকে ভালবাসেন কিন্তু ভারতবর্ষকে ভাল-বাসতে শেখেননি।...

"জাতীয়তাবাদের অনুকম্পা-হীনতার পরিচয় এইখানে। জাতীয়তাবাদ যতখানি পর্যন্ত হিন্দুয়ানির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে, ততটা পর্যন্তই সাধারণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থন করেন। তার বেশী এগুতে সাহস করেন না। অহিন্দুর বিচারে সাধারণ হিন্দুর এই "কিন্তু কিন্তু" ভাব নৈরাশ্যসূচক ব'লে বোধ হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ কাপুরুষদের জন্য নয়—এর আহ্বান বীর্যবানেরাই শুনে থাকেন। সুখের বিষয় এই যে হিন্দু ও অহিন্দু উভয় সম্প্রদায়ে সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তা' না হ'লে কংগ্রেসের অস্তিত্ব সম্ভবপর হ'তো না। কংগ্রেস যে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে একটি বৃহত্তর ও ক্রমশঃ বর্দ্ধমান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"কংগ্রেস্ সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত হোক, এই প্রত্যেক হিন্দু ও অহিন্দু জাতীয়তাবাদীর আন্তরিক বাসনা।"

মননশীল ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হুমায়ুন কবির একদা যে-অভিযোগ এনেছিলেন বাস্তবতা-প্রসঙ্গের গোড়াতেই তা উল্লেখ করেছিলাম। তখনকার দিনের পরিচয়-এ কোন লেখক এই অভিযোগের উত্তর দেন নি, তাই কবিরের অভিযোগের উত্তর আমি নিজের সাধ্যমতো দেবার চেষ্টা করেছি।

আশানন্দ নাগ খ্রীষ্টান। তাঁর পিতা রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ কলকাতার সুপরিচিত পাদরি ছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন তখনকার ভারতীয় লিবারেল পার্টির একজন উৎসাহী সভ্য। এখানে উল্লেখনীয় যে মাদ্রাজের কে. টি. পল বা পঞ্জাব-প্রবাসী রেভারেণ্ড এস. কে. দত্ত প্রভৃতি ভারতীয় খ্রীষ্টান নেতারাও আমাদের জাতীয়তাবাদকে বিনা দ্বিধায় বরণ করেছিলেন। সুতরাং মনে হয় যে, আশানন্দ নাগের অভিযোগ সমগ্র ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজের মনের কথা নয়। অবশ্য আশানন্দবাবু কংগ্রেসের সাফল্য কামনা ক'রে জানিয়েছিলেন, তিনিও জাতীয়তা আন্দোলনের বিরোধী নন।

আশানন্দবাবুর প্রবন্ধের উত্তরে প্রবোধ বাগচীর 'হিন্দুর দৃষ্টিতে অহিন্দু সমাজ' নামে একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এই প্রসঙ্গে প্রবোধবাবু উল্লেখ করেছিলেন চীন ও জাপানে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্মের সংঘাতের সংবাদ। মনে হয়, আশানন্দবাবু কলম বাগিয়ে তৈরি ছিলেন আগে থেকেই। পরের সংখ্যাতেই তাঁর প্রত্যুত্তর বেরোলো

'সুদূর প্রাচ্যে খৃষ্টধর্ম' প্রবন্ধে। বহুল তথ্য সংগ্রহ ক'রে জোরালো যুক্তি দিয়ে জোরালো কলমে লেখা এই প্রবন্ধটির উপসংহার উদ্ধৃতির যোগ্য :

"ইউরোপের রাজনৈতিক প্রতাপ ঈশার ধর্মের পরিপন্থী। এ জন্যই খৃষ্ট-বিভীষিকা ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে উৎকৃষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে। ইংরাজ মিশনারি এদেশে খৃষ্টধর্মপ্রচারে সহায়তা করেছে না বাস্তবিকপক্ষে এ ধর্মের প্রসার কষ্টসাধ্য করে তুলেছে, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখক অকৃত্রিম সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। স্বদেশপ্রীতির উন্মাদনায় অনেকে বিদেশীদের আঘাত করতে গিয়ে এশিয়ার দুলাল যীশুকে আঘাত করেছে।...কিন্তু পূর্ব্ব এশিয়ার ইতিবৃত্তে এইটি শেষ পর্ব্ব নয়। এই কালিমার পেছনে আছে বালার্কের স্বর্ণচ্ছটা। নেপথ্যে সাধারণ দর্শকের অগোচরে প্রাচ্যের পূর্ব্ব সীমায় নূতন এক ভাবাত্মক কাব্যের মহড়া চলছিল। এর পরিণতি লক্ষ্য করে ঐতিহাসিক শেষ অধ্যায়ে লিখবে যে সুদূর প্রাচ্যে খৃষ্টধর্ম নবযুগের ও নবজীবনের প্রেরণা এনেছিল।"

আশানন্দবাবুর ঐ-উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের প্রচার-রীতির সঙ্গে তাঁর আদৌ সহানুভূতি ছিল না। এই কারণে বা অপর যে-কারণেই হোক পাদরি পিতার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তিনি মানিয়ে চলতে পারেন নি। যেমন মানিয়ে চলতে পারেন নি তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থকদের সঙ্গে। বোধহয় এই কারণেই আশানন্দবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতীছাত্র হওয়া সত্ত্বেও জীবন-সংগ্রামে কোনদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি। চিরদিন তাঁকে প্রায় একই অবস্থায় দেখেছি : জীর্ণবস্ত্রে পথেঘাটে ভ্রাম্যমাণ—এক হাতে তালিমারা ছাতা, আর-এক হাতে এক বা একাধিক দুরূহপাঠ্য বই, ভোজন অনিশ্চিত, শয়ন হাটেবাটে অর্থাৎ কখনো-বা মেসের দম বন্ধ হওয়া কুঠরিতে, কখনো-বা কোন বন্ধুর বৈঠকখানায়। এইরকম জীবন বহন ক'রে তিনি বেড়াচ্ছেন বছরের পর বছর মুখে অম্লান দীপ্তি নিয়ে। কে আজ খোঁজ রাখে তাঁর জোরালো কলমের জোরালো বুদ্ধির ও প্রশস্ত পাণ্ডিত্যের? তখনই-বা কে রাখত যদি-না তাঁর যোগাযোগ ঘটত মল্লিকদার সঙ্গে। কোন্ সূত্রে এই যোগাযোগ ঘটেছিল জানি না। অনুমান হয়, বৈপরীত্যের টানে। কেননা, খ্রীষ্টধর্মকে মল্লিকদা বিশেষ উদার দৃষ্টিতে দেখতেন না, বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকদের। ইংরেজ মিশনারিদের সম্বন্ধে মল্লিকদার মনের প্রবল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রেই বোধহয় আশানন্দবাবুর মনে এই 'অকৃত্রিম সন্দেহ' জন্মায় যে তাঁদের কাজ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পরিপন্থী না সহায়ক।

মল্লিকদা তো নিয়ে এলেন আশানন্দ নাগকে। কিন্তু মল্লিকদাকে পরিচয়-সঙ্ঘে নিয়ে এলেন কে ও কোন্ সূত্রে? পুরো বৃত্তান্ত মনে নেই, যেটুকু মনে পড়ে তা লিখছি।

পরিচয় বেরোবার মাস-কয় পরে সাপ্তাহিক অধিবেশনে একদিন শুনলাম বসন্তকুমার মল্লিক নামে এক ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষ অক্সফোর্ড-এ যাপন ক'রে দেশে ফিরে গ্রে স্ট্রীটের কাছাকাছি কোথাও বাসা বেঁধে আছেন। অক্সফোর্ড-এ তাঁর সঙ্গে অপূর্ব চন্দ, সাহেদ সুরাওয়ার্দি প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এঁদের মুখে আমরা শুনলাম যে অক্সফোর্ড-এ ভারতীয় ছাত্রমহলে বসন্তকুমার মল্লিক পরিচিত ছিলেন মল্লিকদা নামে ও অক্সফোর্ড-এ ছাত্র-অধ্যাপক উভয় মহলে তিনি বেশ-একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন ব্যক্তিত্বের ও বিতর্কের জোরে।

এইরকম একটি লোক পরিচয়-সভায় না-এলে সে-সভার অঙ্গহানি হ'তে বাধ্য। অতএব স্থির হ'ল এঁকে পরিচয়-সভায় নিয়ে আসতে হবে। তারপর যথাসময়ে একদিন পরিচয়-সঙ্ঘের পক্ষ হতে সুধীন দত্ত ও সত্যেন বসু ডেপুটেশনে গিয়ে তাঁকে সাপ্তাহিক অধিবেশনে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন। এই হ'ল পরিচয়-সভায় মল্লিকদার যোগদানের ইতিহাস। প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাদেরও মল্লিকদা হলেন।

মল্লিকদার দেশ অবিভক্ত বাংলা দেশের অবিভক্ত নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রাম। মল্লিকদার মা ও ভাই ঐ-গ্রামে বাস করতেন। তাঁর ভাই ছিলেন ঐ-গ্রামের একজন বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস ক'রে মল্লিকদা কিছুদিনের জন্য নেপালে বাস করেছিলেন একটি চাকরি নিয়ে। তারপর বিদেশগমন ও দ্বাদশবর্ষব্যাপী অক্সফোর্ড-এ বাস ও দর্শনচর্চা। এই দর্শনচর্চার সূত্রেই মল্লিকদার সঙ্গে পরিচয় ঘটে সমসাময়িক ইংরেজ কবি রবার্ট গ্রেভস্-এর। তাঁর 'গুড বাই টু অল দ্যাট' নামক প্রথম-জীবনের আত্মচরিতে গ্রেভস্ মল্লিকদা সম্বন্ধে যা-লিখেছেন মোটামুটি তা এইরকম :

"একটি ছাত্রসমিতিতে একবার একটি প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল। সেইসময়ে পরিচয় হয় বসন্ত মল্লিকের সঙ্গে ও তার সঙ্গে আলাপের ফলে দর্শনচর্চায় আমার আগ্রহ জন্মে। আমার শিক্ষার ফলে ইয়োরোপীয় ছাড়া অন্য যে-কোনো জাতের

লোকেদের আমি প্রায় অবজ্ঞার চোখে দেখতাম, এমন-কি য়িহুদীদেরও, আমার বিশেষ বন্ধু সিগ্‌ফ্রিড্* প্রভৃতি দু'একজন বাদে। কিন্তু বসন্তের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। তার ধরনধারণে পরাধীন জাতির লক্ষণ একেবারেই ছিল না—তার ব্যবহারে কখনো প্রকাশ পেত না ইংরেজদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার বা ঘৃণার বাড়াবাড়ি।

"অনুসন্ধান ক'রে জেনেছিলাম যে উচ্চবর্ণের এক পরিবারে বসন্তের জন্ম হয়। তার বাবা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ক'রে হিন্দু সংস্কার থেকে যে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন তা জাহির করবার জন্যে অতিরিক্ত পরিমাণে নিষিদ্ধ খাদ্য-পানীয় সেবনের ফলে অল্পদিনেই দেহত্যাগ করেন। বসন্তকে হিন্দুর সন্তানরূপেই মানুষ করেন তার ঠাকুমা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে আইনের ডিগ্রি পেয়ে† বসন্ত নেপালের মহারাজার পুত্রকন্যাদের সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়।

"এইসময়ে নেপালের সঙ্গে ভারতবর্ষের অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজের সম্পর্ক একটু তিক্ত হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক আইনের রীতিনীতি সম্বন্ধে সারা নেপাল-দেশে এক বসন্তই ছিল পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। বসন্তের পরামর্শের ফলে মহারাজা ১৯২৩ সালে ব্রিটিশদের রাজি করান এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে যার প্রধান শর্ত ছিল নেপালের অব্যাহত স্বাধীনতা মেনে নেওয়া। মহারাজই বসন্তকে ইংলণ্ডে পাঠান ব্রিটিশ রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নের জন্যে যাতে ভবিষ্যতে নেপাল ও ইংলণ্ডে কোন বিরোধ ঘটলে সেই বিরোধ সমাধান সহজ হয়।"

রবার্ট গ্রেভস্ মল্লিকদার প্রাক্-অক্সফোর্ড জীবনের এই বিবরণ সম্ভবত মল্লিকদার কাছেই সংগ্রহ করেছিলেন। অতঃপর গ্রেভস্ লিখেছেন মল্লিকদার সঙ্গে দর্শন আলোচনার কথা। মল্লিকদার দার্শনিক মতামত মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর ঝোঁক ছিল নীতির ওপর। প্রত্যেক ব্যক্তির কঠোর আত্মসাধনা তিনি অত্যাবশ্যক ব'লে মনে করতেন। মোটের ওপর তিনি বিশ্বাস করতেন যে যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন কঠোর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, সমগ্র সমাজ-জীবনে এইজাতীয় নীতির স্থান নেই। •

* কবি সিগ্‌ফ্রিড্ সাসুন।

† আমাদের ধারণা ছিল মল্লিকদা বি. এল্. নয়, এম. এ. পাস ছিলেন।

এই হ'ল গ্রেভস্-এর কথার মোটামুটি ভাব। মল্লিকদা পরিচয়-গোষ্ঠীতে যখন যোগদান করেন তখন তাঁর দার্শনিক মতামত ঠিক ঐ-জাতীয় ছিল কিনা সে-কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তিনি এমন অনেক কথাই বলতেন যার হয় মানেই হয় না কিংবা যার মানে বোঝা সাধারণ লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি অবশ্য সাধারণ লোক। কিন্তু পরিচয়-গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা অসাধারণ মননশীলতার দাবি করতে পারতেন, মল্লিকদা সম্বন্ধে তাঁরা ঐ একই কথা বলতেন।

কিন্তু মল্লিকদার তত্ত্বজ্ঞানঘটিত ভাষিতাবলীর সব কথা না বুঝলেও দু'চারটি অবশ্য বুঝতাম, গূঢ় না হোক স্থূল অর্থে। যেমন মল্লিকদা প্রথমদিন আমাদের আড্ডায় এসে ঘোষণা করলেন যে কর্মফলের দায়িত্ব উভয় পক্ষের অর্থাৎ কর্মীর ও ফলভোগীর। মল্লিকদার সূক্ষ্ম ভাব আমি স্থূল ভাষায় ব্যক্ত করলাম, মল্লিকদার ভাষায় নয়, কেননা তাঁর কথাগুলি আমার হুবহু মনে নেই। এবার স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়ে জিনিসটা বোঝানো যাক। আমি যদি আর-এক ব্যক্তিকে প্রহার করি তাহ'লে দায়িত্ব আমার ও তার উভয়ের। কেন মল্লিকদা তা ভালো করে বোঝান নি, বোঝালেও আমার মনে নেই।

কিন্তু একটি কথা মনে পড়ছে। মল্লিকদা তখন কাঁচড়াপাড়ার কাছাকাছি পলাশি (যুদ্ধক্ষেত্র নয়) ব'লে একটি জায়গায় অনেকখানি জমি সংগ্রহ ক'রে বেশ-একটি কৃষিক্ষেত্র গ'ড়ে তুলে মহা উৎসাহে সেটির বিধিব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। সেখান থেকে প্রচুর শাক-সবজির আমদানি হয়ে কলকাতায় আমাদের বাড়ি-বাড়ি মাঝে-মাঝে বিলি হ'ত। বিশেষ ক'রে টোম্যাটো, এগুলি ছিল মল্লিকদার গর্বের জিনিস।

প্রথম দিন পরিচয়-সভায় এসেই মল্লিকদা আমাদের জানালেন যে ঐ-কৃষিক্ষেত্রটি শুধু কৃষিক্ষেত্র নয়, তাঁর দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাগার। তাঁর গবেষণার উপকরণ হালবলদ বা কলামূলো নয়—ওখানকার সাঁওতাল মজুরেরা। মল্লিকদার কর্মফলের দায়িত্ব-সংক্রান্ত তত্ত্বের পরীক্ষা চলছিল এই সাঁওতালদের নিয়ে। মাঝে-মাঝে মল্লিকদা আকুল হয়ে বলতেন 'আমার সাঁওতালরা'। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল তা জানবার সুযোগ আমাদের হয় নি। বোধহয় ১৯৩৬ সাল—যে-বছর মল্লিকদা দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রা করেন এ-দেশের পালা পাকাপাকিভাবে গুটিয়ে, ততদিন পর্যন্ত, কোন ফলাফলই সাব্যস্ত হয় নি। আমার নিজের উৎসাহে ও মল্লিকদার টানে পলাশির এই কৃষিক্ষেত্রটি

দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। একদিন বেলাবেলি গিয়ে আবার সন্ধ্যার পর কলকাতায় ফিরেছিলাম। রাত কাটানোর ব্যবস্থাও ছিল, তবে গ্রাম্য ব্যবস্থা। তাতে আমার আপত্তি ছিল না, কেননা ছেলেবেলা থেকে গ্রামের অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট আছে। মল্লিকদা নিজেও বারো বছর বিলেত বাস ক'রেও দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি। কলকাতায় তিনি ঘোরাফেরা করতেন ধবধবে দেশী ধুতি ও পাঞ্জাবি প'রে বা ফিটফাট সাহেবি পোশাকে। কালো-কোলো বেঁটেখাটো মজবুত গড়ন, একেবারে পাকা ভারতীয় চেহারা, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পোশাক-পরিচ্ছদ আদব-কায়দায় ফুটে উঠত সম্ভ্রান্ত ভাব। আর কথাবার্তা অল্প শুনলেই বোঝা যেত বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাব। মনে হ'ত তিনি বিকিরণ করছেন নাগরিক সভ্যতার শতাব্দীসিঞ্চিত নির্যাস। এর সঙ্গে ছিল একটু মাটির সুবাস—দেশের ও বিদেশের। আবার যখন দার্শনিক তত্ত্বের কথা পাড়তেন তখন মাথা গুলিয়ে যেত।

এই লোকটিকে আর-এক রূপে দেখলাম পলাশির কৃষিক্ষেত্রে। হাফ-প্যাণ্ট প'রে বন-বাদাড়ে জলকাদা ভেঙে ঘুরছেন একেবারে মেঠো মানুষের মতন। মুখে জলাজঙ্গল ও ফসলের কথা। এইজাতীয় ঘোরাফেরায় আমি আবাল্য বিশেষ রস পাই। তাই মল্লিকদার আনন্দ আর ধরে না। মল্লিকদা বললেন, 'দ্যাখো আমাদের বাঙালি সায়েবদের ধাতে এ-সব সয় না। কিন্তু আসল সায়েব যারা তারা সব অবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে।' এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি উল্লেখ করলেন পলাশির ঐ-কৃষিক্ষেত্রে অক্সফোর্ড-এর ব্যালিঅল কলেজের বিখ্যাত অধ্যক্ষ লিণ্ড্সে প্রভৃতির আগমনের কথা। লিণ্ড্সে ও অন্যান্য কয়েক-জন ইংরেজ মনীষী খ্রীষ্টধর্ম-সংক্রান্ত কোন-একটি কমিশন উপলক্ষ্যে একবার এ-দেশে আসেন। তখন মল্লিকদা পুরনো বন্ধুতার সূত্রে তাঁদের ডেকে নিয়ে যান তাঁর কৃষিক্ষেত্রে। তাঁরা নাকি মহানন্দে সেখানে গোটা দিনরাত কাটিয়ে-ছিলেন একেবারে তাঁরই মতন মাটির মানুষ হ'য়ে।

গ্রেভস্ লিখেছেন যে আবার অক্সফোর্ড-এ আসবার সঙ্কল্প নিয়ে বসন্ত মল্লিক দেশে ফিরেছিলেন, কিন্তু বন্ধুর মৃত্যুতে বৃহৎ সংসারের ভার কাঁধে চাপায় তিনি সে সঙ্কল্প পালন করতে পারেন নি।

আমাদের সঙ্গে যখন মল্লিকদার পরিচয় হয়, তখন তিনি মৃত বন্ধুর সংসারেই বাস করতেন ও ঐ-সংসারের ভার বহন করতেন সাচ্ছল্যে না-হলেও স্বাচ্ছন্দ্যে। মল্লিকদার বেশভূষা বা আহার-বিহারে অস্বাচ্ছন্দ্যের লেশমাত্র

অভাব কোনদিন চোখে পড়ে নি—নিরন্তর আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও। অগস্টিন বিরেল বার্ক সম্বন্ধে লিখেছেন: 'হি বিলঙ্ড্ টু দি স্প্লেনডিড রেস অফ ডেটর্স্।' মল্লিকদা সম্বন্ধে এ-কথা হুবহু খাটে। ধারের জন্যে—অল্প বা বিস্তর যেমন জোটে—মল্লিকদা সবসময়ই হাত পেতে থাকতেন। কিন্তু এই অবিরত খাতক জীবন বহন ক'রেও মল্লিকদার কথাবার্তার বা হালচালের মর্যাদা কোনদিন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। ধার চাওয়াটা তাঁর কাছে ছিল এক গেলাস জল চাওয়ার মতন, আর ধার দেওয়াটা শুধু বন্ধুত্বের নয়, সামাজিক জীবনের, আবশ্যিক দায়িত্ব। বহু বন্ধুবান্ধবকেই তিনি দায়িত্ব পালনের প্রায় অপরিসীম সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু বন্ধুবান্ধবদের মনে তাঁর শুধু স্নেহের নয়, গৌরবের আসন ছিল অটল। তার কারণ মানুষকে আপন করবার অদ্ভুত শক্তি নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন।

পরিচয়-গোষ্ঠীর কেন্দ্র ছিল সুধীন, তার ব্যক্তিত্বের মাধ্যাকর্ষণে আমরা সবাই ছিলাম তার প্রতি আসক্ত। মল্লিকদা এসে হলেন আমাদের অভিভাবক—শাসনে নয়, স্নেহের টানে।

পরিচয় প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের প্রায় সকলেরই বয়স হয় ত্রিশের কোঠায় নয় ত্রিশের কোঠায় পা দেব-দেব করছে। অর্থাৎ শতাব্দীর সঙ্গে এক তালে আমরা চলেছি। মল্লিকদার বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুতরাং চারুবাবুকে বাদ দিলে তিনিই ছিলেন আমাদের মধ্যে প্রবীণতম। ছেলে-বুড়ো সকলকে সহজে আপন ক'রে নেওয়ায় ও সকলকে নিয়ে আড্ডা জমানোয় চারু-বাবুর জুড়ি ছিল না, কিন্তু তাঁকে আমরা সমীহ ক'রে চলতাম মান্য ব্যক্তির মতন। মল্লিকদা ছিলেন একাধারে আমাদের অভিভাবক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাদের বলতে এ-ক্ষেত্রে বোঝায় সুধীন, সুশোভন, ধূর্জটি মুখার্জি, সত্যেন বসু, গিরিজা ভট্টাচার্য ও অবশ্য আমি—এই কয়জনকে। নীরেনের সঙ্গে মল্লিকদার কোনদিনই অন্তরঙ্গতা হয় নি। এই দু'জনের মধ্যে ছিল একটা মৌলিক বিরোধ যা প্রথম থেকেই প্রকাশ পেত রূঢ়ভাবে। কিন্তু আমাদের বাকি কয়জনের বেলায় মল্লিকদা হলেন আমাদের ঘরে-বাইরের বন্ধু, শুধু পরিচয়-সভার সহযোগী নন। বাইরের বন্ধু বিশেষ ক'রে আমার, কেননা আমার মতন আর কেউ মল্লিকদাকে নিয়ে পথেঘাটে এত ঘোরাফেরা করে নি।

পরিচয়-এ একটি লাইন লেখাও মল্লিকদা কোনদিন লেখেন নি, কিন্তু তবু পরিচয়-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল অন্তরঙ্গ। তার কারণ তিনি

আমাদের সাপ্তাহিক আড্ডায় বা কাজের কথার আলোচনায় যোগ দিতেন সমান উৎসাহে। বাংলা লেখা বা পড়ার অভ্যাস তাঁর ছিল না কিন্তু প'ড়ে শোনালে তিনি আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন ও ততোধিক আগ্রহে যোগ দিতেন আলোচনায়। কেননা, যদিও দর্শনচর্চা ছিল তাঁর পেশা, বিতর্ক ছিল তাঁর প্রাণ। পরিচয়-বৈঠকে তিনি বিতর্কের সন্ধানে ওত পেতে থাকতেন বলা যায়। সুবিধামতো যে-কোন বিষয় একবার উঠলেই হ'ল। তারপর শুরু হ'ত প্রশ্ন ও বিশ্লেষণ। এইসময়ে সুধীন বা সুশোভন তথ্যের বা শব্দ-প্রয়োগের সামান্য একটু দুর্বলতা দেখলেই তাঁকে আক্রমণ করত নির্মমভাবে। মল্লিকদা প্রায়ই তথ্যের ধার ধারতেন না, শব্দ ব্যবহার করতেন অনেক সময়ে স্বকীয় গূঢ় অর্থে, আর চেষ্টা করতেন সব সমস্যাকেই নিজের মনোমতো একটি সূত্রের ছকে ফেলে ঢেলে সাজবার। এই নিয়ে সুধীনের ব্যঙ্গ অনেক সময়েই তীব্র হয়ে উঠত। মল্লিকদা তাতে বিচলিত হতেন না, কিন্তু আড়ালে অনেক সময়ে আমাকে বলেছেন, "এরা তর্ক করে, কিন্তু আলোচনা করতে জানে না। বিলেতে মননশীল লোকেদের আলোচনার রীতি অন্যরকম। তারা প্রতিপক্ষকে তথ্যের সন্ধান দিয়ে হাতিয়ার জুগিয়ে দেয়, শব্দ ব্যবহারে সামান্য ভুলচুক নিয়ে হৈ-চৈ করে না – আলোচনার উপজীব্য তথ্য নয় তত্ত্ব এই কথা তারা বোঝে।"

মল্লিকদার বিতর্কপ্রিয়তা পরিচয়-গোষ্ঠী ও এই গোষ্ঠীর বাইরেও তখন কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায় একটি গল্প লিখেছিল প্রধানত এই কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর ক'রেই, কেননা ১৯৩৬ সালে যখন মল্লিকদা দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রা করেন, তরুণ কামাক্ষী তখন পরিচয়-সভায় যোগ দিতে সবে শুরু করেছে, সুতরাং মল্লিকদাকে ভালো ক'রে জানবার সুযোগ তার বোধহয় হয় নি। গল্পটি এই : একদা এক অরণ্যে মল্লিকদার সঙ্গে একটি বাঘের সাক্ষাৎ হয়। বাঘ তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'তেই মল্লিকদা তাকে একটির পর একটি প্রশ্নে এমনই বিভ্রান্ত ক'রে দেন যে শেষ পর্যন্ত শুধু তর্কে পরাস্ত নয়, দম-বন্ধ হয়ে বাঘটি মারা যায়।

কোন ব্যক্তি যদি কিংবদন্তীর উৎস হন তাহলে বুঝতে হবে তিনি অসাধারণ। মল্লিকদা অত্যন্ত স্বকীয়ভাবে অসাধারণ ছিলেন ব'লেই পরিচয়-গোষ্ঠীর যেটুকু অসাধারণত্ব ছিল তার ভূমিকায় তিনি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন।

ভাদ্র সংখ্যায় 'মল্লিকদা' প্রসঙ্গের শেষে বাঘের গল্পটির লেখক কামাক্ষীপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায় নয়, তস্য ভ্রাতা দেবীপ্রসাদ। বাস্তবতা-প্রসঙ্গে রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখুজ্জে – এই দুই ভাই সম্বন্ধে ঠিক এইরকম ভুল হয়েছিল, পাঠকদের হয়তো মনে আছে। এক ভায়ের বোঝা আর-এক ভায়ের ঘাড়ে চাপানো দেখছি আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। আশা করি এর ফলে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটবে না।

পলিটিক্স ক্লাব ও মল্লিকদা

মল্লিকদার কথা শেষ করি কী ক'রে? চারবছর তিনি আমাদের এমনি অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়েছিলেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে তখনকার কথা ভাবা যায় না। পরিচয়-এর আড্ডা তো ছিলই। তার ওপর ঘরে-বাইরে, এর-ওর বাড়িতে, এমন-কি আমার আফিস – সর্বত্র মল্লিকদা হলেন ব্যাপ্ত।

তখন আমি কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে-সঙ্গে কাজ করতাম, সারা বাংলার সমবায় প্রচেষ্টার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতিতে। আফিসের কর্তা ছিলেন আমার মাতুল সুধীরকুমার লাহিড়ী; গুরুগম্ভীর প্রবীণ ব্যক্তি, লোকে তাঁকে বিশেষ সমীহ ক'রে চলত, কেননা আচার-ব্যবহারে সামান্যমাত্র নড়চড় তিনি বরদাস্ত করতেন না।

দু'চারদিন আমার আফিসে আসা-যাওয়ার পরই মল্লিকদা তাঁকে বশ ক'রে ফেললেন। আমার মাতুল নিরামিষাশী ছিলেন, কিন্তু ডিমে তাঁর আপত্তি ছিল না। বরং ডিম সম্বন্ধে তাঁর একটু দুর্বলতাই ছিল। মল্লিকদা কেমন ক'রে তা আবিষ্কার করলেন তা জানি না – বোধহয় যোগবলে। তারপর এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল আমাদের আফিসে। একদিন বেলা চারটে, এ-রকম সময় আফিসে আমার মাতুলের ঘরে ঢুকে দেখি মল্লিকদা সেখানে উপস্থিত ও আমার মাতুলের সঙ্গে কী-এক গোপন পরামর্শে ব্যস্ত। মাতুল গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, 'দরজা বন্ধ করো।' তারপর শুনলাম মল্লিকদার প্রস্তাব, 'স্ক্রাম্‌ব্‌ল্‌ড্‌ এগ্‌' নামক উপাদেয় ভোজ্যের ব্যবস্থা। যেমন কথা তেমনি কাজ। ডিম এল। আফিসে স্টোভ ধরানো হ'ল। তারপর প্রস্তাবক পাচকরূপ ধারণ ক'রে 'স্ক্রাম্‌ব্‌ল্‌ড্‌ এগ্‌' তৈরি করলেন। আমরা তিনজনে পরিতৃপ্তি-সহকারে তা ভক্ষণ করলাম।

এই মল্লিকদা যে অতঃপর সম্পূর্ণ স্বকীয় অধিকারে পলিটিক্স ক্লাব-এ নিমন্ত্রিত হবেন তা তো ধরাবাঁধা কথা। সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যা

আলোচনার উদ্দেশ্যে পলিটিক্স ক্লাব-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শচীন সেন (তখনো তিনি ডক্টর হন নি) ও আমার মাতুল—প্রধানত এই চারজনেরই উদ্যোগে। বিনয়ের বাবা খ্যাতনামা নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ ও আরো দু'চারজনও এই ক্লাবের সভ্য হয়েছিলেন ও আমাদের আলোচনায় নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন। বাকি কয়জনের মধ্যে আমিও ছিলাম। মাঝে-মাঝে সুশোভন সরকার নিমন্ত্রিত হয়ে ও কলকাতায় থাকলে ধূর্জটিবাবু প্রায় নিয়মিতভাবে আমাদের অধিবেশনে যোগ দিতেন। সুতরাং পরিচয়-গোষ্ঠীর সঙ্গে পলিটিক্স্ ক্লাব-এর সামান্য একটু যোগসূত্র ছিল বলা চলে—যে-সূত্র ধ'রে আমার এই প্রসঙ্গের অবতারণা। তুলসীচন্দ্র গোস্বামীকেও পলিটিক্স্ ক্লাব-এ ডেকে আনা হয়েছিল পরিচয়-এর আসর থেকে।

এই পলিটিক্স্ ক্লাব একদা প্রবৃত্ত হলেন হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিশ্লেষণে। প্রায় তিন-চারটি সাপ্তাহিক অধিবেশনে তুমুল আলোচনা হ'ল নির্মল ভট্টচার্য, তুলসী গোঁসাই ও রাধাকুমুদবাবুর বাড়িতে। রাধাকুমুদবাবুও ধূর্জটিবাবুর মতন মাঝে-মাঝে লখ্‌নৌ থেকে কলকাতায় এলে আমাদের অধিবেশনে উপস্থিত হতেন। আমাদের অন্যান্য আলাপ-আলোচনার ফল কিছু 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়, কিছু-বা পুস্তিকা আকারে ছাপা হয়ে প্রকাশ হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান সংক্রান্ত আলোচনাটি আরো একটু মর্যাদা পেয়েছিল, কেননা এই আলোচনাকে ভিত্তি ক'রে মল্লিকদা 'দি ইন্‌ডিভিজুয়াল অ্যাণ্ড সোসাইটি' নামে ছোটখাটো একটি বই লিখে ফেললেন। বলাই বাহুল্য যে আমাদের আলোচনা এই বইটির ভিত্তিমাত্র। এই ভিত্তির ওপর বইটি মার্কসীয় ভাষায় যাকে বলে 'সুপার-স্ট্রাক্‌চার', একেবারে তাই। অর্থাৎ ভিত্তির সঙ্গে এই সুপার-স্ট্রাক্‌চার-এর সম্বন্ধ এত সূক্ষ্ম যে প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তা চোখে পড়ে না। পরিচয়-এ বইটির বেশ একটু কড়া সমালোচনা করেছিলেন আশানন্দ নাগ। মল্লিকদা অনেক বিষয়েই ছিলেন রক্ষণশীল, তার ওপর ঠিক ধার্মিক অর্থে গোঁড়া না-হলেও, তাত্ত্বিক অর্থে অত্যন্ত তীব্রভাবে হিন্দু। আশানন্দবাবু বইটির দোষ-ত্রুটি বিচার করেছিলেন লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

দ্বিতীয়বার অক্সফোর্ড-এ যাবার পর মল্লিকদা আরো কতকগুলি বই লিখেছেন: তার মধ্যে একটি গান্ধিজী সম্বন্ধে, তাঁর মৃত্যুর পরেই লেখা।

গান্ধিজী সম্বন্ধে মল্লিকদার মনে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল ও অনেক সময়েই পরিচয়-আসরে তাঁকে বলতে শুনেছি যে সারা ভারতবর্ষে সত্যিকারের 'সিভিলাইজ্‌ড' লোকের সেরা দৃষ্টান্ত গান্ধিজী। মল্লিকদার বইগুলির অবশ্য খুব প্রচার হয় নি, কারণ তাঁর বক্তব্য সাধারণ উচ্চশিক্ষিত লোকেদের কাছে মোটেই স্পষ্ট নয়। হয়তো মল্লিকদার বন্ধু স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতন অসাধারণ ব্যক্তিরাই এইসব বইয়ের মর্ম বোঝেন।

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ

মল্লিকদার কথা বলতে মনে পড়ল পরিচয়-গোষ্ঠীতে অক্সফোর্ড-ফেরত দলের প্রাদুর্ভাব। জ্যেষ্ঠ দলে ছিলেন অপূর্ব চন্দ, সাহেদ সুরাওয়ার্দি, তুলসী গোঁসাই, অবনী ব্যানার্জি ও কিরণ মুখুজ্জে। এঁরা সকলেই অক্সফোর্ড-এ ছিলেন মল্লিকদারই সময়ে। কনিষ্ঠ দলে ছিলেন তিনজন: সুশোভন সরকার, হুমায়ুন কবির ও হীরেন মুখুজ্জে। এঁদের সঙ্গে মল্লিকদার পরিচয় হয়েছিল পরিচয়-এর আসরে। কিছুদিন পরে এসে জুটলেন, বোধহয় ১৯৩৬ সালে, হাম্‌ফ্রে হাউস, কনিষ্ঠদের অন্যতম। মোটমাট ন'জন। কেম্‌ব্রিজ-ফেরত মাত্র তিনজনের কথা মনে পড়ছে: সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ১৯৩২ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর নিয়ে ইনি কলকাতায় আসেন ও পরিচয়-গোষ্ঠীতে যোগ দেন। বাকি দু'জন, মজিদ রহিম ও ম্যাল্‌কম ম্যাগারিজ্‌। এঁদের মধ্যে দু'চারজনকে পাঠকদের কাছে পরিচিত ক'রে দেওয়া দরকার।

তুলসী গোঁসাই

খ্যাতি ও অখ্যাতিতে একসময়ে তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। অখ্যাতির কথায় কাজ কি? খ্যাতির কথাই বলা যাক। পরিচয়-এর প্রকাশের সময় এঁর বয়স ছিল আন্দাজ চৌত্রিশ বছর। এই অল্প বয়সেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বাগ্মীদের একজন ব'লে ইনি গণ্য হয়েছিলেন। এখনকার ভারতীয় পার্লামেন্টে যেমন হীরেন মুখুজ্জে, তেমনি এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় তুলসী গোঁসাইয়ের ইংরেজি বাচনভঙ্গি শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করত। হীরেন মুখুজ্জের মতন তুলসী গোঁসাইও ছিলেন গরম কথার ওস্তাদ—বক্তৃতাপ্রসঙ্গে। আবার তেমনি হীরেনবাবুরই মতন সাধারণ কথাবার্তায় এঁর মতন নম্র, ধীর, সহিষ্ণু লোক কম দেখেছি।

পরিচয়-এর আড্ডায় কোন বিতর্ক যখন চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে তখন অনেকসময়ে দেখেছি এঁর ব্যর্থ চেষ্টা শান্তভাবে নিজের বক্তব্য জানানোর। মল্লিকদা কদাচিৎ উত্তেজিত হতেন, কিন্তু সুযোগ পেলেই একে-ওকে চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়তেন না। সুধীন, নীরেন, এমন-কি সুশোভনও —যাকে লোকে সাধারণত সৌম্য, শান্ত ব'লেই জানে—এ-বিষয়ে কম যেত না।

হীরেনবাবুর সঙ্গে তুলসী গোঁসাইয়ের তুলনা করেছি। কিন্তু এঁদের দু'জনের মিল সম্পূর্ণ বাইরের। বামপন্থী পলিটিক্স্-এর প্রতি তুলসীবাবুর যেটুকু টানের পরিচয় পেয়েছি তা ট্রট্স্কি-ঘেঁষা, অন্তত ট্রট্স্কি সম্বন্ধে এঁর মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। মোটের ওপর তুলসীবাবু ছিলেন লিবারেল—তখনকার মাপকাঠিতে। একেবারে খাঁটি লিবারেল। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। তুলসীবাবুর বালিগঞ্জের বাড়িতে একদিন তুলসীবাবু, মল্লিকদা ও আমি গল্পসল্প ও চা পান করছি, এমন-সময়ে এক প্রবীণ ও সেকেলেগোছের ভদ্রলোক এসে নিজের পরিচয় দিলেন। শুনলাম, তিনি তুলসীবাবুরই সমগোত্রীয় এক বড় জমিদার। তখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন আসন্ন। একটু পরেই প্রবীণ ভদ্রলোকটি জানালেন যে তুলসীবাবু যদি জমিদারদের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচনপ্রার্থী হতে রাজী হন তাহলে বাংলার সমস্ত বড় জমিদারেরা ওঁকে সমর্থন করবেন। অত্যন্ত নম্রভাবে তুলসীবাবু উত্তর দিলেন যে কোন সম্প্রদায়ের জন্যে ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ আসনের বিধান গণতন্ত্রের বিরোধী, সুতরাং জমিদার-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

এ-সব কথা বহুদিন আগেকার। তুলসীবাবু এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে অসুস্থ জীবন যাপন করছেন। বাংলা দেশের লোক তাঁর কথা কতদূর মনে রেখেছে বলতে পারি না, কিন্তু আভিজাত্যের ও সৌজন্যের এই প্রতিমূর্তিটির কথা তখনকার পরিচয়-এর আড্ডার লোকেরা সহজে ভুলবে না।

কিরণ মুখুজ্জে ও অবনী বাঁড়ুজ্জে

এঁরা পরিচয়-এর আড্ডায় আসতেন মাঝে-মাঝে।

কিরণ মুখুজ্জের খ্যাতির খবর অক্সফোর্ড থেকে ভারতবর্ষে পৌঁছেছিল আমরা যখন কলেজে পড়ি সেইসময়ে। গ্রীক, ল্যাটিন ও পাশ্চাত্য দর্শনে পাণ্ডিত্যের ফলে ইনি অক্সফোর্ড-এর 'অল সোল্‌স্ কলেজ'-এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতীয়দের পক্ষে এ-গৌরব বিরল। অক্সফোর্ড-এর ডিগ্রি লাভ ও

সেই সঙ্গে ব্যারিস্টারি পাস ক'রে কিরণ মুখুজ্জে দেশে ফিরলেন জাঁকালো নাম নিয়ে, তারপর শুরু করলেন যুগপৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্। কিন্তু তেমন পসার জমাতে পারলেন না একটি কাজেও। দু'নৌকোয় পা দিলে যা হয় তাই। সুধীনের নামে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ছাড়া আর কোনই ছাপ নেই। কিন্তু হালচাল ও বিদ্যাবুদ্ধির জোরে সে স্বদেশের ও বিদেশের যে-সব বড়-বড় ছাপ-মারা লোকেদের সহজেই আকর্ষণ করত, কিরণ মুখুজ্জে তাঁদেরই একজন।

কিরণ মুখুজ্জের যেটুকু খ্যাতি ছিল তা নিতান্তই কাগজে-কলমে। কথায়-বার্তায় বা চেহারায় ইনি ছিলেন একেবারে মামুলি। সাহেদ সুরাওয়ার্দি ঠাট্টা ক'রে এঁকে বলতেন 'প্লেটো'। কথাটা খুব অসঙ্গত নয়। কেননা আলাপ-আলোচনার ফাঁকে একটু সুযোগ পেলেই তাঁর অভ্যাস ছিল প্লেটো, প্লটাইনাস প্রভৃতির আপ্তবাণী আওড়ানো। তবে কিরণ মুখুজ্জে যে যথার্থ পণ্ডিত ছিলেন তা সর্বজন-স্বীকৃত। কোন দার্শনিক প্রসঙ্গ উঠলে মল্লিকদা, আইয়ুব বা সুধীনের সঙ্গে কিরণবাবু বেশ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা জমাতেন। পরিচয় প্রকাশ হবার কিছুদিন পর থেকে সুধীন তার অভ্যস্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ইয়োরোপীয় দর্শন অধ্যয়ন করতে শুরু করে, তাই ঐ-সময়ে সে স্বভাবতই উৎসুক হয়ে থাকত পাকা লোকেদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে জটিল দার্শনিক সমস্যাগুলি পরিষ্কার ক'রে নেবার জন্যে।

পরিচয়-এর আসরে যাঁরা আসতেন নিছক আড্ডার লোভে, কিরণ মুখুজ্জে ও অবনী বাঁড়ুজ্জে উভয়ই তাঁদের দলে। ইংরেজি বা বাংলা, সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক, কোনরকম লেখাই কিরণ মুখুজ্জে লিখেছেন ব'লে জানি না। অবনীবাবুর লেখার অভ্যাস ছিল, কিন্তু ইংরেজিতে। তখনকার সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ড' কাগজের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ইনি পরিচিত ছিলেন 'অবনী সি. ব্যানার্জি' নামে। অবনীবাবুর পেশা ব্যারিস্টারি। কিন্তু শিল্পকলায় এঁর বিশেষ অনুরাগ। মাঝেমাঝে চিত্রকলা সম্বন্ধে লেখা বোধহয় এখনো কাগজে বের হয়।

কিরণ মুখুজ্জে মারা গিয়েছেন অনেকদিন। অবনীবাবুর সঙ্গে প্রায়ই কলকাতার চিত্রপ্রদর্শনীগুলিতে দেখা হয়। তখন মনে পড়ে পরিচয়-এর প্রথম-যুগের সেই অন্তরঙ্গ আড্ডার কথা, যা আজ সম্পূর্ণ ছন্নছাড়া। আর্টের প্রসঙ্গ উঠলেই সাড়া পাওয়া যায় অবনী বাঁড়ুজ্জের উৎসুক মনের। কিন্তু পরিচয় আজ

যে-তালে চলেছে তার সঙ্গে অবনী বাঁড়ুজ্জের ও তখনকার আরো অনেকের মনের মিল একেবারেই নেই। মাঝখানে একটি যুগের ব্যবধান।

হাম্‌ফ্রে হাউস

ঐ-যুগের ব্যবধান পেরিয়ে মনে পড়ে হাম্‌ফ্রে হাউস-এর কথা।

কবি জেরাল্ড ম্যানলি হপ্‌কিন্‌স্‌ সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে হাউস তরুণ বয়সেই পাণ্ডিত্যের খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তারই জোরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন বোধহয় ১৯৩১ সালে। সুশোভন তার এই নতুন সহযোগীটিকে নিয়ে এল আমাদের আড্ডায়। তারপর অতি অল্প ক'দিনেই হাউস হয়ে উঠলেন সুধীনের পরম অন্তরঙ্গ।

হাউস-এর একটি লেখা—বোধহয় সমালোচনা—বোধহয় পরিচয়-এ বেরিয়েছিল। ঠিক মনে নেই। চেহারায়, ভাবে-ভঙ্গিতে ও প্রকৃতিতে হাউস ছিলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগোছের—প্রাচীন ভারতের আদর্শ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, যাঁদের মধ্যে দেখা যেত অগাধ পাণ্ডিত্যের, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও সরল সদাচারের সমাবেশ, শিক্ষিত ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এইজাতীয় ইংরেজ। অল্পদিন চাকরির পরেই হাউস ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কিছুদিন রিপন কলেজে চাকরি করেন। যে-সব অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর স্বজাতীয় আমলাদের ওপর হাউস একেবারে হাড়ে চ'টে গিয়েছিলেন তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর 'আই এস্‌পাই উইথ্‌ মাই লিট্‌ল আই' পুস্তিকায়। শুধু বন্ধুদের মধ্যে বিলি হবার জন্যে ছাপা এই পুস্তিকাটিতে পরিচয় পাওয়া যায় হাউস-এর নিপুণ ব্যঙ্গ-রচনার হাতের ও তাঁর অসামান্য সৎসাহস ও সততার।

হাউস-এর সঙ্গে ঔপন্যাসিক ই. এম. ফরস্টার-এর ব্যক্তিগত পরিচয়-সূত্রেই 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ পরিচয়-এ প্রকাশের অনুমতি সহজেই পাওয়া গিয়েছিল। 'ভারতপথে' নামে আমি এর আংশিক অনুবাদ করেছিলাম। সঙ্কল্প ছিল সম্পূর্ণ অনুবাদ ক'রে পুস্তকাকারে ছাপা হবে। কিন্তু যুদ্ধ বাধায় তা আর হয়ে ওঠে নি।

যুদ্ধ বাধার কিছু আগেই বা অল্পদিন পরে, ঠিক মনে নেই, হাউস স্বদেশে ফিরে যান। তারপর সুধীনের সঙ্গে তাঁর ইংল্যাণ্ডে দেখা হয়েছে, কিন্তু পরিচয়-এর সঙ্গে তাঁর আর কোন যোগাযোগ ঘটে নি।

ম্যাগারিজ, রহিম ও সুরেনকাকা

কেম্‌ব্রিজ-ফেরত যে-তিনজনের নাম করেছি তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র পাঠকসমাজে পরিচিত। ছেলেবেলা থেকে এঁকে আমি সুরেনকাকা ব'লে জানি। একসময়ে 'নব্যভারত' পত্রিকায় ইনি চতুর্দশপদী কবিতা লিখতেন 'সুরেশ্বর শর্মা' নামে, তারপর আমারই পরামর্শে ভাঙলেন চোদ্দ লাইন পয়ারের বেড়ি। পরিচয়-এ সুরেনকাকার দু'চারটি কবিতা ও বোধহয় দু'একটি ছোটো-ছোটো সমালোচনাও ছাপা হয়েছিল প্রথম দিকে। সুরেনকাকার মৃত্যু ঘটে যুদ্ধের সময়ে লখ্‌নৌতে।

ম্যাল্‌কল্‌ম ম্যাগারিজ 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজের সহকারী সম্পাদক হয়ে কলকাতায় আসেন হাউস-এর কিছুকাল আগে, তারপর কিছুদিন পরেই আবার দেশে ফিরে যান। সুধীনের সঙ্গে কী সূত্রে ম্যাগারিজ-এর পরিচয় হয়েছিল জানি না, যে-সূত্রেই হোক, ম্যাগারিজ-এর প্রশংসা সুধীনের মুখে তখন ধরত না। আমাদেরও লাগত মন্দ না, কেননা ম্যাগারিজ কথাবার্তা বলতেন বেশ। ম্যাগারিজ এখন বিখ্যাত 'পাঞ্চ' পত্রিকার সম্পাদক। মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে দেখা যায় তাঁর তীব্র সোবিয়েত-বিরোধী লেখা।

মজিদ রহিম, আই. সি. এস. সার আবদুর রহিমের ছেলে, অতএব শহিদ সুরাওয়ার্দির শ্যালক। যতদূর মনে পড়ে, তাঁকে পরিচয়-এর আড্ডায় নিয়ে এসেছিলেন শহিদের দাদা, আমাদের বন্ধু সাহেদ। এই সুদর্শন সদালাপী যুবকটির নানা বিষয়ে আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের আড্ডায় জ'মে যেতে তাঁর একটুও দেরি হয় নি। রহিম বোধহয় তখন 'কাস্টমস্‌' বিভাগে বড় কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন। কেননা বিদেশ থেকে আমদানি যে-যে নিষিদ্ধ পলিটিক্যাল বই সরকারি পাহারা এড়িয়ে এদেশী পাঠকের হাতে পৌছতে পারত না, রহিম মাঝেমাঝে এরকম অনেক বইয়ের বৃত্তান্ত ও বক্তব্য আমাদের শোনাতেন। রহিমের বিদেশিনী স্ত্রী ছবি আঁকতেন। পরিচয়-এর আড্ডায় মাঝেমাঝে মেয়েরা কেউ-কেউ আসতেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে রহিম-পত্নীকে কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। যুদ্ধের সময় রহিম দিল্লীতে স্থানান্তরিত হন। তারপর ভারত-বিভাগের পর তিনি যে কোথায় অন্তর্ধান করলেন বলতে পারি না।

আমাদের আড্ডায় যাঁরা নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে আরো দু'একজনের সঙ্গে পাঠকদের বিশেষ পরিচয় ক'রে দেওয়া দরকার। তাঁদের মধ্যে প্রথম মনে পড়ছে বটকৃষ্ণ ঘোষের কথা।

বটকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'র আফিসে। প্রথমে নজরুল ইসলাম ও পরে কল্লোল-গোষ্ঠীর সংহার-পর্ব সমারোহে সমাপ্ত ক'রে 'শনিবারের চিঠি' প্রবৃত্ত হয়েছিল প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ধূলিসাৎ করার চেষ্টায়। এইসময়ে, দৈব অনুগ্রহে বা অন্য কী উপায়ে জানি না, 'শনিবারের চিঠি' সন্ধান পায় বটকৃষ্ণ ঘোষের। বটকৃষ্ণ ঘোষ তখন তরুণ যুবক। কিন্তু ঐ-বয়সে তিনি ফরাসি, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষায় ও এই ভাষাত্রয়ের মাধ্যমে ইণ্ডোলজি বা ভারততত্ত্বে রীতিমতো পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলেন, যদিও অবস্থাবিপাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির দেউড়ি পার হবার সুযোগ তাঁর ঘটে নি।

বটকৃষ্ণ ঘোষকে আবিষ্কার ক'রে 'শনিবারের চিঠি' হাতে স্বর্গ পেল ও এই স্বর্গ হ'তে যথাসময়ে সশব্দে বজ্র নিক্ষিপ্ত হ'ল সদ্য ফ্রান্স-ফেরত চীন-ভারততত্ত্বে সুপণ্ডিত ডক্টর প্রবোধ বাগচীকে লক্ষ্য ক'রে। ফলে প্রবোধ বাগচীর খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হোক বা না-হোক, বটকৃষ্ণ ঘোষ অচিরে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন। সুনীতি চাটুজ্যে, কালিদাস নাগ প্রভৃতির দৃষ্টি ইতিপূর্বেই তিনি আকর্ষণ করেছিলেন।

এরপর পাঁচজনের চেষ্টায় একটি স্কলারশিপ জোগাড় ক'রে ভারততত্ত্বে উচ্চতর গবেষণার জন্যে বটকৃষ্ণ ঘোষকে জার্মানি পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। যতদূর মনে পড়ে বটকৃষ্ণ ঘোষ দেশে ফিরেছিলেন ১৯৩৪ সালে। 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় তখন আমার আর যাতায়াত ছিল না কিন্তু সদ্য জার্মানি-ফেরত ডাক্তার মৈত্রেয়ী বসুর বাড়িতে সুযোগ ঘটল বটকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে পুরনো আলাপ ঝালিয়ে নেবার।

পরিচয়-সঙ্ঘে যোগ দেবার জন্যে বটকৃষ্ণ ঘোষ ইতিপূর্বেই উৎসুক ছিলেন। আর পরিচয়-এর আড্ডা ও লেখকগোষ্ঠী তো তৈরিই হয়েছিল এমন সব গুণী লোকদের জন্যে। সুতরাং বটকৃষ্ণ ঘোষ আমাদের দলে ভিড়ে গেলেন অতি সহজে। পরিচয়-এ তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ ও সমালোচনা বেরিয়েছিল। এই রচনাগুলিতে প্রমাণ পাওয়া যায় একাধারে তাঁর পাণ্ডিত্যের ও সেই সঙ্গে জটিল

দুরূহ বিষয়কে মনোগ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতার। প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতীয়, বিশেষ ক'রে বৌদ্ধ, দর্শন। তাঁর রচনা প'ড়ে সেইসময়ে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীমশায় ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। বটকৃষ্ণ ঘোষের জীবন-কাহিনী ট্র্যাজিক। বাল্যকালেই তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধি বাধিয়ে বসেছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে এই ব্যাধিতেই। শেষের দিকে এই ব্যাধিই হয়েছিল তাঁর সঙ্গে বহির্জগতের ব্যবধানের কারণ। এমন-কি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ প্রায় ছিল না বলা চলে। যুদ্ধ বাধবার কিছুদিন আগেই পরিচয়-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ঘুচে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনের এই মর্মান্তিক বিপত্তি সত্ত্বেও বটকৃষ্ণ ঘোষ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক হিসাবে যে-কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তা আমাদের আশ্চর্য ক'রে দেয়। যতদিন দেহ একেবারে অপটু হয়ে পড়ে নি, তিনি লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চা করেছিলেন পুরো উৎসাহে। জীবন-সংগ্রামে বটকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন সত্যিকারের বীর।

বটকৃষ্ণ ঘোষ ও সরোজ আচার্য

এইরকম একটি লোককে প্রগতিপন্থীরা নিজেদের দলে পেলে নিশ্চয়ই তাঁদের গৌরব বাড়ত। কিন্তু সে-সৌভাগ্য তাঁদের হয় নি। পরিচয় যখন প্রগতিশীল লেখকদের মুখপাত্র হ'ল তার কয়েক বৎসর আগেই আমাদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে আবার নতুন ক'রে তাঁর নাম দেখা দিল পরিচয়-এর পাতায়— লেখক হিসাবে নয়, বিষয় হিসাবে।

জার্মানি ও ফ্রান্স-এ থাকতে বটকৃষ্ণ ঘোষ বামপন্থী দর্শন যথেষ্ট চর্চা করেছিলেন। দেশে ফেরার পর তাঁর কথাবার্তা শুনলে তাঁকে বামপন্থী-ঘেঁষা ব'লেই মনে হ'ত। কিন্তু মার্কসবাদ ও কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর মন ক্রমশ অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিকূলতা তিক্ত ভাষায় ফুটে উঠল যুদ্ধের শেষ দিকে লেখা দুটি প্রবন্ধে।* মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানের যোগ্য বাহন হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'। অর্থাৎ বটকৃষ্ণ ঘোষের প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল যে-ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রেই দেখা দিল তার চরম বিকৃতি। তাঁর জীবনের এ আর-এক ট্র্যাজেডি।

* ১ "অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব", শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫২
২ "সাম্য ও স্বাধীনতা", শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৫২

তখন পরিচয় পুরোপুরি প্রগতিশীল পত্রিকা। সুতরাং বটকৃষ্ণ ঘোষের মতন ব্যক্তি মার্কস্‌বাদের যে কদর্থ করেছিলেন পরিচয় তা উপেক্ষা করতে পারে নি। বটকৃষ্ণ ঘোষ সমুচিত উত্তর পেলেন ১৩৫২ সালের মাঘ সংখ্যার পত্রিকায় ছাপা 'মার্কস্‌বাদ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে। রচয়িতা সরোজ আচার্য মার্কস্‌বাদী মহলে সুপরিচিত পাণ্ডিত্যের ও রচনাশক্তির জন্যে। কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন, পরিচয় তাঁর রচনা ছাপাবার সৌভাগ্য পেয়েছে কদাচ। মাত্র ঐ-লেখার জন্যে সরোজ আচার্য পরিচয়-এর লেখক হিসাবে স্মরণীয়। অতএব ঐ-প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠকদের উপহার না-দিলে অন্যায় হবে।

"মার্কস্‌বাদ মরিয়াছে। কিন্তু 'সমাজতন্ত্র' সকলেরই ঘাড়ে চাপিতেছে। উহা কেহই ছাড়িতে চাহেন না। স্বয়ং হিটলারও ছাড়িতে চাহেন নাই—তিনিও তাঁহার দলটির নাম রাখিয়াছিলেন, 'জাতীয় সমাজতন্ত্রী'। আমাদের জাতীয়তাবাদী মহলেও এই বিজাতীয় জিনিসটির খুবই আদর কিন্তু জিনিসটাকে আরও একটু 'ভদ্র' না করিলে চলে না। তাই কেহ 'হিন্দু সোশ্যালিজম্‌', কেহ 'ইসলামিক সোশ্যালিজম্‌', কেহ বা 'গান্ধী সোশ্যালিজম্‌' চান—শুধু 'হিন্দুত্ব', শুধু 'ইসলাম্‌', শুধু 'গান্ধীবাদ' বলিলে যেন আর মাল কাটে না। 'সোশ্যালিজম্‌'-এর মতই এদেশে ইতিমধ্যে আরও দুই-একটি জিনিসের বেশ বাজারসিদ্ধ নামডাক হইয়াছে—একটি 'বিপ্লব' আর একটি 'প্রগতি'। রাজনীতিক কর্মীরা প্রথমটি লইয়া মাতেন, তাঁদের সভাপণ্ডিতেরা দ্বিতীয়টিকে ছাড়িতে চাহেন না। তাই পণ্ডিত মহাশয়েরা 'প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রের' একটা জ্ঞানকাণ্ড আবিষ্কার করিতেছেন। এই আবিষ্কারের 'ঘোষণা' পাওয়া যাইতেছে অক্লান্ত গবেষক ডাক্তার বটকৃষ্ণ ঘোষের মারফৎ।...

"এই বিশ্বপণ্ডিতটির মূল বক্তব্য হইল ইহাই যে, 'কোন মার্ক্সবাদী যদি কখনও বলে যে, স্বাধীনতা তাহার ঈপ্সিত তখনই বুঝিতে হইবে যে, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে।' বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ এখানে একেবারে চূড়ান্তভাবেই মৌলিক—দুনিয়ার কোনো বিশ্বপণ্ডিত মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে এমন অপূর্ব অভিযোগ কস্মিনকালে করিতে পারেন নাই। সার্থক হউক ডাঃ ঘোষের দিগ্বিজয়। কিন্তু মুস্কিল এই যে, যুক্তিতর্ক-প্রমাণ প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধুতা ও সংযমের কতকগুলি নীতি পণ্ডিতব্যক্তিরা মানিয়া চলেন। ঘোষ মহাশয় একে supralogical পণ্ডিত, তাহার উপর 'প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী'। তাঁহার

ঐ সকল কুসংস্কার থাকিবে কেন? কাজেই যুক্তি ও প্রমাণের অভাব পূরণ করিতে খড়্গ সঞ্চালন ও দম্ভোক্তিই যথেষ্ট।...

"মার্কস্‌বাদ বেদ বাইবেল নয়। মূল ও ভাষ্যের পণ্ডিতী গবেষণা মার্কস্‌বাদীর কারবার নয়। মার্কস্‌বাদ সক্রিয় জীবনদর্শন—মার্কসীয় পদ্ধতিতে প্রয়োগ ও প্রসারেই মার্কস্‌বাদের সার্থকতা। মার্কস্‌বাদের এই গতিশীলতাই পুঁথিজীবীর আতঙ্কের কারণ। ডাঃ ঘোষ মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিতেছেন, 'অন্ততঃ আমাদের দেশে যাহা মার্ক্সবাদ বলিয়া পরিচিত তাহা কোনদিনই মার্ক্সের মত ছিল না।' কি অলৌকিক পশ্চাৎদৃষ্টি (hind-sight)! পণ্ডিত মহাশয়ের জানা দরকার যে মার্কসের হাস্যকর আক্ষরিক অনুকরণ আর মার্কসীয় চিন্তা-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ব্যবহারে আকাশ-পাতাল তফাৎ।...

"বোঝা গেল supralogical ডাঃ ঘোষের যত রাগ 'ঘৃণ্য জড়বাদের' উপর। তবে nothing succeeds like success. সোভিয়েট রাশিয়ার সফলতাও অস্বীকার করা যায় না; 'ঘৃণ্য জড়বাদ'কেও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। অতএব প্রমাণ করিয়া ফেলা যাক যে, সোভিয়েট ঘৃণ্য জড়বাদকে পরিত্যাগ করিয়াছে।"

"আসলে মার্কস্‌বাদ জড়বাদই নয়, বাস্তববাদ, আর বাস্তববাদ ও জড়বাদ এক জিনিস নয়—ইহা একালের পণ্ডিতেরা অন্তত জানেন।

"মার্কস্‌বাদ মানবীয় চৈতন্যের দেহাতীত অলৌকিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে মাত্র। দেহমনের সমগ্রতাই মানুষের জীবন। এই জীবন অলৌকিক নয়। বস্তু জগতেই এই জীবনের উৎপত্তি স্থিতি গতি ও বিলয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হইল—জীবনধারণের বাস্তব প্রয়োজনের উপরে ভিত্তি করিয়াই মানুষের কর্মব্যবহার ভাবনা ধারণা নানা শাখা প্রশাখায় ঊর্ধ্বে উঠিয়া থাকে। ভাবনাধারণাকর্ম সবই দৈহিক ভোগলিপ্সার প্রতিচ্ছবি—এই অভিযোগ আর একটি খৃষ্টীয় howler মাত্র।...

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও ভারতীয় মার্কস্‌বাদীদের দান কেবলমাত্র দার্শনিক ধোঁকাবাজী দিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় ততক্ষণ যতক্ষণ দিব্যজ্ঞানের পশরা খুলিয়া লক্ষ্মীলাভ সম্ভব। কানপুর মামলার পর হইতে কায়ুর শহীদের দিন পর্যন্ত ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিরও একটা ঐতিহ্য রচনা হইয়াছে, আজও সে ঐতিহ্যে নূতন নূতন অধ্যায় যোগ হইতেছে। ঢাকার রাস্তায় সোমেন চন্দের হত্যা হইতে ক'লকাতার ও বোম্বাইয়ের রাস্তায় তাহারই আর এক

অধ্যায়ের ছোট-খাট পর্ব প্রতিদিন রচনা হইতেছে—সেই রচনার একটু দাম দিতে হয় বৈ কি? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকটেও কমিউনিস্টদের দাম দিতে হয়। প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রীদের নিকটেও দিতে হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ বাবা শোহন সিং, রুর সিং-এর সহকর্মীরা তাহা দিতেছে, বাংলাদেশে চট্টগ্রামের স্বাধীনতার শহীদদের সহযাত্রীরাও দিতেছে, দিতেছে শহরের শত শত মজুর আর গ্রামের শত শত কৃষক। স্বাধীনতার ইতিহাস কি করিয়া রচনা করিতে হয় তাহা তাহারা এক-আধটুকু জানে।—না হইলে তিন বছর আগে যে পার্টি বে-আইনী ছিল, আজও নাকি যাদের না আছে বিদ্যাবুদ্ধি না আছে কর্মশক্তি, না আছে অসাধারণ মানুষদের নেতৃত্ব, না আছে সাধারণ জনতার সঙ্গে একত্ব, —তাহারা একই কালে শাদা-কালা মালিকদের এত দুশ্চিন্তার কারণ হইল কেন, আর কৃপালনী-বটকৃষ্ণদের এত গভীর গবেষণার বিষয় হইল কিরূপে?"

আবু সয়ীদ আইয়ুব

বটকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে আমাদের যে-বিরোধ ঘটেছিল তার চাইতে অনেক বেশি শোচনীয় আইয়ুব-এর সঙ্গে আমাদের বিরোধ। কেননা প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ও ভাবগত যোগ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ও অনেকদিন পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন। প্রগতিশীল লেখকদের দল থেকে সুধীনও আজ বিচ্ছিন্ন, আমরা যাকে 'প্রগতি' বলি তা সুধীনের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সুধীন কখনো সাক্ষাৎভাবে কাগজে-কলমে মার্কস্‌বাদকে আক্রমণ করে নি। আইয়ুব তা করেছেন।

এই আইয়ুব ছিলেন একসময়ে পরিচয়-এর লেখকগোষ্ঠীর উজ্জ্বল রত্ন। জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সুললিত ব্যাখ্যায় তাঁর কলম ছিল বটকৃষ্ণ ঘোষের কলমের মতনই স্বচ্ছন্দ। বোধহয় আরো বেশি, কেননা দর্শন-চর্চা ছিল তাঁর পেশা, বটকৃষ্ণ ঘোষের প্রধান গবেষণার বিষয় ছিল ভাষাতত্ত্ব।* তার ওপর আইয়ুব-এর ছিল সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনার কুশল হাত।

আমাদের সাপ্তাহিক সভায় আইয়ুব প্রায়ই আসতেন। অন্তত একবার

* তাঁর 'লিঙ্গুইস্টিক ইন্‌ট্রোডাকশন টু স্যান্সক্রিট' বই প'ড়ে বিশ্ববিশ্রুত জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণ ভ্যাকারনাগেল লিখেছিলেন: তোমার এই কাজ ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্বের নবযুগ প্রবর্তন করবে।

আইয়ুব-এর বাড়িতেও আমাদের আড্ডা বসেছিল। কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা উঠলেই আমরা উৎসুক হতাম তাঁর মতামত জানবার জন্যে। আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর তীক্ষ্ণ মেধায় আর তাঁর ব্যক্তিগত সৌজন্যে। বটকৃষ্ণ ঘোষের মতন আইয়ুবকেও কঠিন ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল বহুদিন। এই সংগ্রামে তিনি এখনো পর্যন্ত জয়ী।

সুরেন গোস্বামী

প্রথমযুগের পরিচয়-এর দলের মধ্যে যাঁরা ইহজগতে নেই, তাঁদের একজন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। আইয়ুব-এর মতন ইনিও ছিলেন পেশাদার দার্শনিক। কিন্তু সাহিত্যে, সমাজতত্ত্বে, রাজনীতিতে—সর্ববিষয়ে তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। পরিচয়-এ তাঁর যে-কয়টি রচনা বেরিয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইমানুয়েল কাণ্ট সম্বন্ধে একটি কবিতা। তাঁর লেখা আর-কোন কবিতা কখনো পড়ি নি। তাঁর আর-একটি উল্লেখযোগ্য রচনা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ইংরেজি 'ফ্যাসিজম্' বইয়ের সমালোচনা। এর থেকে দু'একটি অংশ উদ্ধারযোগ্য, যেমন:

"দার্শনিক ব্যাপারে রায় মহাশয় মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের মতাবলম্বী বলে প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু, দার্শনিক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যায়গায় যায়গায় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিলেও, সমস্যাগুলির উপরে আলোকপাত করার চাইতে উত্তাপই বিকীরণ করেছেন বেশী।"

এরপর আছে:

"ভারতীয় দর্শনের প্রতি তিনি অতি-চরমপন্থীসুলভ নাসাকুঞ্চন করলেও, কোথাও যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যে ডায়ালেকটিকের তিনি এত ভক্ত, সে ডায়ালেকটিক অনুযায়ীই ভারতীয় দর্শনের মধ্যে কোথায় তার বাস্তব সারপদার্থটি কূটতর্কজালের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে, তাকে ডায়ালেকটিক ভঙ্গীতে প্রকাশ করা উচিত ছিল।... দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কম্যুনিষ্ট বলে পরিচিত ছিলেন না; কিন্তু তিনিও তাঁর লোকপ্রসিদ্ধ ফরিদপুর অভিভাষণের প্রারম্ভে উপনিষদের সময় থেকে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় চিত্তের বৈশিষ্ট্য, তাকে অতীন্দ্রিয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে পৃথিবীর ধূলিমাটীর সঙ্গে, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করবার দিকে প্রচেষ্টার স্বপক্ষে ইঙ্গিত করেছিলেন। অথচ বিশ্ববিশ্রুত কম্যুনিষ্ট রায় মহাশয় একেবারে মারমুখো হয়ে

ভারতীয় দর্শনকে ফ্যাসিজমের দর্শন বলে গালাগালি সুরু করে দিলেন! হয়তো ইউনাইটেড ফ্রন্টের নীতির প্রতি তিনি উদাসীন বা বিরূপাক্ষ বলেই ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের জোর করে ফ্যাসিষ্টদের দলে ঠেলে দিতেও তিনি নারাজ নন!"

ইউনাইটেড ফ্রন্টের উল্লেখ থেকে এই সমালোচনাটির সময় আন্দাজ করা যায়। এটি বেরিয়েছিল ১৩৪৫ সালের মাঘ সংখ্যায় (ইংরেজি ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে) অর্থাৎ যুদ্ধ বাধার ক'মাস আগে।

আরো একটি কথা এখানে স্মরণীয়। এই সমালোচনাটি বেরোবার অতি অল্পদিন আগে, ১৯৩৮ সালের বড়দিনের সময়ে, কলকাতায় নিখিল-ভারত প্রগতিশীল লেখকদের যে-সম্মেলন হয়, তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুরেন গোস্বামী। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মুল্‌করাজ আনন্দ্‌। অনেক কড়া কথা থাকলেও এই সমালোচকটি যে সঙ্কীর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট নয় তার প্রমাণ সুরেনবাবুর এই মত:

"রায় মহাশয়ের সঙ্গে পাঠকের হয়তো অনেক বিষয়ে মতের মিল না হতে পারে; কিন্তু তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও ফ্যাসিষ্টবিরোধিতা এবং সেজন্য তিনি যেরকম সাবলীল ভাষায় ও শক্তিমতার সঙ্গে লেখনী চালনা করেছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এদেশে আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্ম্মগত কারণে ফ্যাসিজমের উদ্ভব সুদূর আশঙ্কার বিষয় মাত্র নয়। সুতরাং আশঙ্কা যাতে সত্যে পরিণত না হয় সেজন্য এই রকম ফ্যাসিজম্ বিরোধী সাহিত্য যত বেশী প্রচারিত হয় ততই দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর।"

ফ্যাসিজম্ বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘের সংগঠন হয় এর তিন বছর পরে।

আড্ডার কথা: শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

আড্ডাধারীদের পরিচয় দিলাম—অর্থাৎ যাঁরা পরিচয়-এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগ দিতেন তাঁদের পরিচয়। এবার আড্ডার কথা একটু বলি। কিন্তু তা বলতে গেলে শ্যামল ঘোষের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই, কেননা দুর্বল স্মৃতির রিক্ত ভাণ্ডার থেকে এইসব সাপ্তাহিক অধিবেশনের খুঁটিনাটি আর কতটা সংগ্রহ করতে পারি? শ্যামল ঘোষ সুবিধা ক'রে দিয়েছেন তাঁর ডায়রি থেকে উপকরণ জুগিয়ে। ডায়রি লেখা তাঁর বরাবরের অভ্যাস, একসময়ে এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করেছি, সেই ঠাট্টা ফিরে এসে লাগল আমারই গায়ে।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ জন্মেছিলেন পূর্ব আফ্রিকায় নাইরবি শহরে। মনে পড়ছে এই নিয়ে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের ঠাট্টা। শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে শ্যামল ঘোষকে নিয়ে যাচ্ছি, পথে ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে দেখা, শ্যামল ঘোষের আদি বৃত্তান্ত শুনে তিনি "বললেন, নাইরবি থেকে একেবারে রবির কাছে!"

শ্যামল ঘোষের বাল্য ও কৈশোর আফ্রিকাতেই কাটে। সেখানকার জংলি পরিবেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ঘনিষ্ঠ, কেননা জঙ্গলের তথা যে-কোন বে-মামুলি ব্যাপারের প্রতি আকর্ষণ তাঁর একেবারে ধাতুগত। তাই যখন বার্ড কোম্পানির চাকরি নিয়ে কলকাতায় এসে তাঁকে যেতে হ'ল সিংভূম ও কেওনঝর প্রভৃতি অঞ্চলের জঙ্গলে খনিজের সন্ধানে, তাঁর প্রকৃতি ও পেশা এই খাপছাড়া জীবনে বেশ সহজেই খাপ খেয়ে গেল। নীরেনের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটেছিল কী এক সূত্রে। পরিচয় পত্রিকা বেরোবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নীরেন এঁকে নিয়ে সুধীনের কাছে হাজির করল পরিচালনের কাজে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে। অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন লেখক। তখন সাহিত্যিক বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল না। বোধহয় আফ্রিকার আদিম সহেলি ভাষাতেই তিনি বেশি সড়গড় ছিলেন। কিন্তু দেখতে-দেখতে বাংলা রচনায় বেশ-একটু বিচিত্র ভঙ্গি আয়ত্ত ক'রে তিনি অনেক পাঠককেই মুগ্ধ ক'রে ফেললেন। বোধহয় এই ভঙ্গিতে সহেলির প্রভাব কিছু থাকায় তা এত মনোগ্রাহী হয়েছিল। তার চেয়েও মুগ্ধ হ'ল তাঁর মুখে বনজঙ্গলের গল্প শোনার সুযোগ যারা পেয়েছিল তারা। নানা প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার আবহাওয়া খানিকটা তিনি তাঁর লেখার মধ্যেও সঞ্চার করতে পেরেছিলেন ব'লেই তখনকার পরিচয়-এর লেখকদের মধ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান হয়েছিল।

শ্যামল ঘোষের ডায়রি থেকে উদ্ধৃতি মুলতুবি থাকল পরের সংখ্যার জন্যে। আগের বারের কিস্তিতে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের ডায়রির কথা উল্লেখ করেছিলাম। এই ডায়রি ইংরেজিতে লেখা। তারই থেকে স্বচ্ছন্দ ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ক'রে কয়েকটি টুকরো এবার দিচ্ছি। ১৯৩১ সালের মাঝামাঝিতে পরিচয়-এর সাপ্তাহিক অধিবেশন শুরু হয়। ঠিক সেইসময় লেখা ডায়রি পাই নি। তাই আমাদের আড্ডার কথা শুরু হয়েছে ১৯৩২ সাল থেকে। আবার লম্বা লাফ দিতে হয়েছে, কেননা ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের ডায়রি শ্যামলবাবুর নথিপত্রের মধ্যে থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

১

টাউন হল্ থেকে সোজা গেলাম সুধীন দত্তর বাড়ি পরিচয়-সভায়।

টাউন হল্-এ গিয়েছিলাম শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনন্দন উপলক্ষ্যে। গত বছর এই দিন হিজলীতে রাজবন্দীদের ওপর গুলি চালানো হয়েছিল, দুইজন রাজবন্দীর তাতে মৃত্যু ঘটে। আজ তাই একদল ছাত্র সদর রাস্তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে শরৎবাবুর গাড়ি আটকে তাঁকে প্রার্থনা জানালো তিনি যেন এই শোকের দিনে সভাস্থলে না যান। শরৎবাবু তো রণে ভঙ্গ দিলেন, কিন্তু এদিকে চেষ্টা হ'ল শরৎবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁর ছবি দিয়েই সভার কাজ চালানোর। ইতিমধ্যে ছাত্রদের সঙ্গে সভার ভলান্টিয়ারদের বাধল বচসা আর ভলান্টিয়ার দলের কাপ্তেন রেগেমেগে একটি ছাত্রকে এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন। তারপর তাণ্ডব। কোনরকমে বিধান রায় সভা বন্ধ ক'রে গোলমাল থামালেন। আমরাও পালিয়ে বাঁচলাম।

পরিচয়-সভায় এসে দেখি মল্লিকদা বেশ জোর একটি দার্শনিক বিতর্ক জমিয়েছেন। আমার ভগ্নদূতের কাহিনী শুনে মল্লিকদা উল্লসিত হয়ে মন্তব্য করলেন, "এ খুব ভাল লক্ষণ—একেবারে বিপ্লবের সূচনা।" হারীতকৃষ্ণ দেব সায় দিয়ে রসিকতা ক'রে বললেন, "আগেই বলেছিলাম শরৎ-বন্দনা বন্ধ না হয়।"

এরপর হঠাৎ তুলসী গোঁসাই এসে উপস্থিত। তিনিও ছিলেন টাউন হল্-এ বিধান রায় প্রভৃতি হোমরাচোমরাদের দলে। তুলসী গোঁসাইর যে-চেহারা মনে-মনে আন্দাজ করেছিলাম, দেখলাম আসল চেহারার সঙ্গে তার একেবারেই মিল নেই। আমার ধারণা ছিল, তিনি আরো সুপুরুষ। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা ও ধরনধারণ ভারি চমৎকার লাগল।

এরপর কথা উঠল মহাত্মাজীর আমরণ উপবাসের।* হারীতদা মনে করিয়ে দিলেন যে ধূর্জটিবাবু বলেছিলেন, যীশু খ্রীষ্টের মতন মহাত্মাজীরও অচিরে

* ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধিজী উপবাস শুরু করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড-এর 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award)-এর প্রতিবাদে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দল-উপদলের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে ব্রিটিশ সরকার রাজি হওয়াতে পাঁচ দিন পরে মহাত্মাজী উপবাস ভঙ্গ করেন।

ক্রুসিফিকশন্ অনিবার্য। হিরণ মন্তব্য করল, যীশুর মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্যের পতন হতে যত সময় লেগেছিল, মহাত্মার মৃত্যুর পর যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ততদিন টি'কে যায় তাহলে তো বিশেষ ভরসার কারণ নেই। কে যেন বলল, ততদিনে আবার হিন্দু সাম্রাজ্য গ'ড়ে উঠবে। মল্লিকদা বেশ-একটু জোর দিয়ে বললেন, হিন্দু প্রভাব তো সমস্ত পৃথিবীতেই ব্যাপ্ত।

এরপর কথার মোড় ফিরিয়ে তুলসী গোঁসাই খবর দিলেন যে বীরেন শাসমল নাকি গভর্নমেণ্টের কাছে জানতে চেয়েছেন, তিনি 'ডিপ্রেস্‌ড ক্লাশ'ভুক্ত কিনা। কিন্তু তাঁর মতন প্রতিপত্তিশালী লোককে বিশেষ অধিকার দিতে নারাজ ব'লে গভর্নমেণ্ট তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব দেয় নি।

আমি আসতে যে দার্শনিক বিতর্কে বাধা পড়েছিল, কথায়-কথায় আবার তা উঠে পড়ল। প্রবোধ বাগচী বললেন যে ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্য দর্শন থেকে একেবারে ভিন্ন জাতের। বাগচীর মতে ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি হ'ল যোগ। সহজ বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অতীত যে-সত্য শুধু অন্তর্দৃষ্টির কাছে বোধগম্য, তাই ছিল ভারতীয় ঋষিদের সাধনার বস্তু। তাঁরা তাই প্রধানত ছিলেন মরমী সাধক। দার্শনিক তত্ত্ব ছিল তাঁদের কাছে গৌণ জিনিস।

সুধীন দত্ত এই কথায় প্রতিবাদ ক'রে বললেন, ইয়োরোপেও যথেষ্ট মরমী সাধক বা মিস্টিক জন্মেছেন, কিন্তু তাঁরা দার্শনিক নন। দর্শনের ক্ষেত্র হ'ল স্বতন্ত্র ও স্বকীয়—কি ইয়োরোপে কি ভারতবর্ষে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অবশ্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু অন্তরের উপলব্ধিই বা 'নেতি-নেতি'র বেশি আর কতদূর এগিয়েছে?

বাগচী আপত্তি জানিয়ে বললেন যে ভারতীয় যোগীদের সঙ্গে ইয়োরোপীয় মিস্টিকদের তুলনা চলে না। এরপর তিনি আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্বের উল্লেখ ক'রে বললেন, ভারতীয় ঋষিদের কাছে এই রিলেটিভিটির রহস্য অজ্ঞাত ছিল না।

গিরিজাবাবু ছিলেন এতক্ষণ চুপচাপ। কিন্তু বাগচীর কথায় আর থাকতে না-পেরে একটু রুক্ষ হয়েই বললেন, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্ব একেবারে নিছক পদার্থবিদ্যা ও গণিতের ব্যাপার। এর সঙ্গে দর্শনকে জড়ানো গায়ের জোর খাটানো ছাড়া কিছু নয়।

সুধীন দত্ত সুযোগ পেলেন জীন্‌স্ ও এডিংটন-এর বিরুদ্ধে তাঁর গায়ের ঝাল ঝাড়বার। এঁরা বিজ্ঞানের বিভীষণ—সুধীনবাবুর এই বিশ্বাস।

তুলসী গোঁসাই এরপর মন্তব্য করলেন যে ইংরেজি ফিলসফি শব্দটির

অনুবাদে আমাদের ব্যবহার করা উচিত 'বিজ্ঞান', 'দর্শন' নয়, কেননা সংস্কৃতে দর্শন বলতে যা বোঝায় ইংরেজিতে তার যথাযথ প্রতিশব্দ কিছু নেই, 'মিস্টিসিজিম্' তো ও-অর্থে একেবারেই অচল।

এর অল্প পরেই সেদিনকার সভা ভাঙল।

২

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

একটু সকাল-সকাল গিয়ে পড়েছিলাম পরিচয়-এর আড্ডায়। তখনো বেশি কেউ লোক আসে নি। আফ্রিকা সম্বন্ধে মল্লিকদার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'ল। তিনি নাকি ইয়োরোপে থাকতে একজন আফ্রিকার লোককে দেখেছিলেন যার গায়ের রঙ প্রায় নীল আর নাক-মুখ বেশ চোখাল। আমি বললাম, আফ্রিকায় এরকম লোক থাকা অসম্ভব।

সুধীন দত্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন অতুলবাবুর 'রীতি-বিচার' প্রবন্ধের।

নীরেন রায় মন্তব্য করলেন, অতুলবাবু একেবারে গোড়ার কথা থেকে আরম্ভ করেছেন।

এরপর চা—সঙ্গে যথারীতি অতি পরিপাটি জলযোগ।

একটি নতুন লোক এসে দল ভারি করলেন, নাম কি এক বোস*—বয়স বেশি না, চোখ দুটি ভারি সুন্দর।

মল্লিকদা আবার কথা তুললেন মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনের। গত এক সপ্তাহ ধ'রে সুধীনের সঙ্গে প্রত্যহ এই বিষয়ে আলোচনা ক'রেও তাঁরা নাকি একমত হতে পারেন নি। মল্লিকদার বক্তব্য মোটামুটি এইরকম—এই একটি ব্যক্তি যিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন মানুষের হিতার্থে, যাঁর মনে আশার অন্ত নেই, যিনি জানেন যে আজ সমগ্র পৃথিবী রয়েছে তাঁর মুখ তাকিয়ে—যেমনভাবে আর কোনদিন তাকায় নি। এই মহাপুরুষ আজ হঠাৎ আহ্বান শুনলেন তাঁর অন্তরে, তাঁর জীবন বিসর্জন দিতে—এমন একটি কারণে সারা পৃথিবীর ভবিষ্যতের তুলনায় যা নিতান্তই নগণ্য। কার কাছ থেকে এল এই আহ্বান? আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা যে মহান নৈতিক আদর্শ—সেই আদর্শের সঙ্গে কী যোগ আছে গান্ধিজীর আজকের দিনের এই সিদ্ধান্তের?

* সম্ভবত মণীন্দ্রলাল বসু।

নীরেন রায় বললেন, মহাত্মা বিচক্ষণ লোক, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না-ক'রে তিনি কোন কাজেই নামেন না। কিন্তু এক-একসময় হাউইবাজির মতন একেবারে আকাশে উঠলেও মাঝে-মাঝে তাঁর পতন ঘটে।

ঈশ্বরের বাণী ব'লে যে কিছু থাকতে পারে সুধীন দত্ত তা আদৌ বিশ্বাস করেন না। নীরেনবাবুর মত কিন্তু ঠিক তা নয়। তিনি বললেন, দেশকালের অতিরিক্ত যে-বাস্তব, মানুষের অন্তরে তারই উপলব্ধিকে বলা যায় ঈশ্বরের বাণী। কিন্তু চেতনার এই উচ্চতম স্তরে পৌঁছানো গান্ধিজীর পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাঁর ঈশ্বর অহিংস ঈশ্বর, অতএব তাঁর সত্তা ও শক্তি খণ্ডিত। গান্ধিজীর জীবনদর্শনের আধ্যাত্মিক সাজই সার, আসলে তা নিছক নীতিবাদ ছাড়া আর কিছু না। এর দৃষ্টান্ত, মহাত্মার গীতা-ভাষ্য। একসময়ে মহাত্মাজী ঘোষণা করেছিলেন, গীতার আদর্শ হ'ল অহিংসা। এই নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হ'ল, গীতার শ্লোক উদ্ধার ক'রে একদল দেখালেন যে মহাত্মার ব্যাখ্যা প্রামাণিক নয়। তখন মহাত্মাজী স্বীকার করলেন যে গীতার আদর্শ কায়িক বলপ্রয়োগের বিরোধী নয়, কিন্তু তবু ঈশ্বর যে অহিংস এই মত তিনি ছাড়লেন না।

নীরেনবাবুর মোট কথা এই যে গান্ধিজীর মতামত অকপট হলেও, তাঁকে পথ বাছতে হয় সাময়িক ও সাংসারিক ভালমন্দ বিচার ক'রে।

আজকের সভায় আর বেশি-কিছু আলোচনার অবসর ঘটে নি।

আশ্চর্য লোক মল্লিকদা।

৩

১৭ই জানুয়ারী ১৯৩৩

আজকের সভা বেশ জোর জমেছিল।

টয়েনবির বিখ্যাত বইতে সভ্যতার ইতিহাসের যে-বৃত্তান্ত আছে, সুশোভনবাবু তারই কথা বলছিলেন। বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান ও পতন সম্বন্ধে বেশ-একটা ধারণা হ'ল।

সাহেদ সুরাওয়ার্দি আসতে কে যেন প্রশ্ন তুলল, সভ্যতা বলতে কী বোঝায়। সাহেদ বললেন, আদিম মানুষের আসবাবপত্রে যখন অলঙ্করণ দেখা গেল, তখনই সভ্যতার উদ্ভব। অর্থাৎ মানুষ সভ্য হ'ল তখন, যখন মানুষকে ভর করল স্থূল প্রয়োজন-সাধনের অতিরিক্ত উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা।

হিরণ বলল, আদিম মানুষ ছবি আঁকত মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে, সৃজনী আবেগে নয়। সাহেদ এই কথায় সায় দিলেন, কিন্তু সুধীনবাবু বললেন যে আদিম

মানুষের অস্ত্রশস্ত্র যা পাওয়া গেছে তাদের বিচিত্র গড়ন ও তাদের পালিশ দেখে প্রমাণ হয় যে শুধু কাজের উপযোগী ক'রে সেগুলি তৈরি হয় নি, তখনকার মানুষ ইচ্ছে ক'রেই তাদের এত সুন্দর ক'রে বানিয়েছিল।

সুশোভনবাবু বললেন, কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত ক'রে মানুষ যখন ঘর বেঁধে বসবাস শুরু করল, তখনই সত্যিকারের সভ্যতার আবির্ভাব বলা যেতে পারে।

আমার মনে পড়ল আফ্রিকার কথা। বললাম, সে-দেশে দেখা যায় হয়তো একটি জাতি সম্পূর্ণ কৃষি-নির্ভর, আর তারই পাশাপাশি বাস করছে আর-এক জাতি যারা শুধু বনের জানোয়ার শিকার ক'রে খায়। অথচ এরা একেবারে ভিন্ন, এক জাতের উপর আর-এক জাতের এতটুকু প্রভাব দেখা যায় না।

এরপর আর-একজন মত দিলেন, সত্যিকারের সভ্যতার নিদর্শন কৃষি নয়, সেচ। সভ্যতার মাপকাঠি জীবনযাত্রার সরলতায় না জটিলতায়—এই নিয়ে এরপর প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হ'ল। মোটের ওপর দেখা গেল, সভ্যতার সংজ্ঞা সম্বন্ধে কারো সঙ্গে কারো মতের মিল নেই।

সভা ভাঙবার আগে সুরাওয়ার্দি জিজ্ঞাসা করলেন, আগামী 'শিক্ষা-সপ্তাহ' (এডুকেশন উইক) উপলক্ষ্যে তাঁকে যে-বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হয়েছে, তার প্রসঙ্গ যদি হয় 'শিল্প ও যাযাবর জীবন' তা কেমন হবে? আমরা প্রায় একবাক্যে এই প্রসঙ্গটির সমর্থন করলাম।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অন্তত একটি বিষয়ে আমাদের মতের মিল আছে।

৪ ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

সুরেন মৈত্র মহাশয় পরিচয়-সভায় যাবার পথে আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন।

মল্লিকদা ব্যাখ্যা করলেন ইণ্ডিয়ান আর্ট সম্বন্ধে সাহেদের কী বক্তব্য। এই নিয়ে শুরু হ'ল তর্কাতর্কি। হিরণের কী একটা মন্তব্য শুনে সুধীনবাবু বললেন, একেবারে বোকার মতন কথা—ছেলেমানুষেরও অযোগ্য। সুধীনবাবু আজ একটু তিরিক্ষি মেজাজেই ছিলেন, কেননা এর একটু পরেই আইয়ুবকে শুনতে হ'ল যে সাহেদের বক্তব্য তিনি একেবারেই ধরতে পারেন নি। সুধীনবাবুর চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা সত্ত্বেও তাঁকে ভালো না-লেগে পারে না। কেননা তাঁর বলার ধরন আর তাঁর বক্তব্য দুই-ই সমান মনোগ্রাহী।

সুধীনবাবুর ভাষ্য শুনে সাহেদের কথা যা-বুঝলাম তা মোটামুটি এই যে ইণ্ডিয়ান আর্টের যা বিশেষত্ব তার সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ-সাধনার খুব মিল দেখা যায়। যোগ-সাধনার অবলম্বন দেহ, কিন্তু এই দেহের মাধ্যমে প্রকাশ পায় অনেক উচ্চতর আদর্শ। তেমনি ভারতীয় শিল্পী কাঠ বা পাথর ব্যবহার করেছে স্থূল উপকরণ হিসেবে ও এই মাধ্যমে যে-সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু উপলক্ষ্য, শিল্পীর আসল লক্ষ্য তার অন্তরের গূঢ় উপলব্ধির প্রকাশ। তাই রূপ-সৃষ্টির চরমে পৌঁছে শিল্পী রূপকে উপেক্ষা করতে পেরেছেন বিনা দ্বিধায়। তার স্থূল উপকরণ, কাঠ, পাথর, ধাতু বা মাটির তোয়াক্কা না-রেখে ভারতীয় শিল্পী বলেছেন, 'দেখো, তোমাদের নিয়ে আমি বানর বা শিব যা-ইচ্ছে গড়তে পারি।'

নীরেনবাবু বললেন, এই ব্যাখ্যা মোটামুটি ঠিক হলেও পুরো ব্যাখ্যা নয়, কেননা শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর যে-আনন্দ তা-ও আমাদের মেনে নিতে হবে।

৫ ৬ই মার্চ ১৯৩৬

আজ আমাদের সভা বসেছিল প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে। বাংলার পরিভাষা নিয়ে কথা হতে-হতে, উঠল আইনস্টাইনের প্রসঙ্গ। জার্মানির বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের প্রস্তাব সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সমীচীন হচ্ছে কিনা, এ নিয়ে হ'ল আলোচনা। দেখা গেল কারো-কারো মত এই যে জার্মানিকে দুষ্টগ্রহের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ মোটেই অসঙ্গত নয়। তবে ফ্রান্স-এ ব'সে আইনস্টাইনের এই মত ঘোষণা করা যে খুব যুক্তিযুক্ত হয় নি, এই বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হলাম।

এরপর উঠল ফ্রান্স-এর কমিউনিস্ট নেতাদের কথা। কে যেন বলল, রম্যাঁ র'ল্যা তেমন দৃঢ়চিত্ত নয়।

৬ ১৩ই মার্চ ১৯৩৬

আজকের সভায় বেশ লোক হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন হাম্‌ফ্রে হাউস, কিরণ মুখুজ্জে, হুমায়ুন কবির। কবির ও হাউস তাঁদের অক্সফোর্ড-এর চেনা লোকেদের কথা আলোচনা করছিলেন। এঁদের মধ্যে একটি মজার লোকের কাহিনী শুনলাম। তিনি দাঁত মাজার এক নতুন আঙ্গিক উদ্ভাবন করেছিলেন

—দাঁতের ওপর ব্রুশ না-চালিয়ে, ব্রুশটা এক জায়গায় আটকে রেখে তারই ওপর দাঁত ঘষতেন বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে-নেড়ে।

কথায়-কথায় সুধীনবাবু বললেন হপ্‌কিন্‌স্ বুঝতে তাঁকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়, আর নীরেনবাবুর যে কেন হপ্‌কিন্‌সকে ভালো লাগে তা তিনি মোটেই বুঝতে পারেন না।

৭ ২০শে মার্চ ১৯৩৬

চারু দত্ত মশায়ের বাড়িতে আমাদের অধিবেশন হ'ল। অপূর্ব চন্দ এত কথা বলছিলেন যে আর-কেউ মুখ খুলবার সুযোগই পাচ্ছিল না। মনে হ'ল চারুবাবুও যেন জামাইয়ের বাগ্মিতায় একটু বিব্রত। হাউস উপস্থিত ছিলেন, মনে হ'ল তাই সকলেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবার জন্যে এত ব্যস্ত। কিন্তু আলোচনা একেবারে জমছিল না, মনে হ'ল না যে তাতে সুশোভনবাবুর কিছু এসে যায়, যেমন আলোচনাই হোক তিনি নির্বিকারভাবে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু নীরেনবাবু মনোমতো কথাবার্তা না-হলে যে বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

কথাবার্তা প্রায় ঝিমিয়ে আসছিল এমনসময়ে সাহেদ গিরগিটি-জাতীয় এক বিচিত্র প্রাণীর বর্ণনা ক'রে আমাদের সজাগ ক'রে তুললেন। কোথায় এইরকম এক প্রাণী তিনি যেন দেখেছিলেন। কিন্তু অপূর্ববাবু দমবার লোক নন। অমনি তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর জন্মভূমি শিলচরে যে-সব অদ্ভুত জীব দেখেছেন তাদের কাহিনী। টেলিফোনে ডাক পড়াতে তাঁকে উঠতে হ'ল, তাতে অন্যেরা আবার সুযোগ পেল কথা বলার।

৮ ২৭শে মার্চ ১৯৩৬

আজকের সভায় একটি নতুন লোককে দেখলাম—হীরেন মুখুজ্জে। চা ও খাবারের সঙ্গে নির্বাচন-ঘটিত নানা খোসগল্প চলছিল, তারপর উঠল সাম্রাজ্যের কথা। কে যেন বলল, অশোকের সাম্রাজ্যকে সত্যি সাম্রাজ্য বলা যায় কিনা, এ-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। প্রবোধ বাগচী চীন সাম্রাজ্যের কথা তুললেন। তারপর উঠল পলিটিক্স-এর কথা। সবারই মত হ'ল এই যে, ফ্রান্স ও জার্মানিতে লড়াই বাধবে যদি ইংল্যাণ্ড তা চায়, নতুবা নয়।

নানা আজেবাজে কথার পর সুশোভনবাবু বললেন যে অধ্যাপক ফিসার-এর

মত এই যে, যারা বহু দেবতায় বিশ্বাসী তারা স্বভাব-উদার, আর যারা একেশ্বর-বাদী তাঁরা অত্যন্ত গোঁড়া ও অসহিষ্ণু।

মল্লিকদা জিজ্ঞাসা করলেন যে, শাক্ত বা বৈষ্ণবদের বহুদেবতার বিশ্বাসী বলা যায় কিনা। মল্লিকদার কথায় কেউ তেমন কান দিল না। কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, শাক্ত ও বৈষ্ণবে তফাৎ কী? হিরণ উত্তর দিল, পাঁঠা আর লাউয়ের যা-তফাৎ, শাক্ত ও বৈষ্ণবে তফাৎও ঠিক তাই। আমাদের হাসিতে বিন্দুমাত্র না-দ'মে মল্লিকদা আরো জাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভিন্ন-ভিন্ন দেবতা যেমন ভিন্ন-ভিন্ন স্তরের, সত্যের উপলব্ধিরও সেইরকম ভিন্ন-ভিন্ন স্তর আছে কিনা।

যথেষ্ট রাত হয়েছিল, তাই মল্লিকদার এই জটিল প্রশ্নের আর মীমাংসা হ'ল না।

৯ ১৭ই এপ্রিল ১৯৩৬

আজকের পরিচয়-এর অধিবেশনে একগাদা লোক হয়েছিল। হীরেন মুখুজ্জে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের নানা মুখরোচক গল্প বললেন। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন যে, ভারতবর্ষে কমিউনিজম্ প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

নীরেনবাবু জানতে চাইলেন জওহরলাল নেহরুর কথা। তাঁর মতে কংগ্রেসের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে নেহরু মোটেই ভালো কাজ করেন নি, কেননা এতে কমিউনিজম্ প্রসারে বাধা ঘটতে বাধ্য।

সুশোভনবাবু ও হীরেনবাবুর মত হ'ল এই যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রগতিপন্থীদের পক্ষে কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মই সবচাইতে প্রশস্ত।

এরপর সুধীনবাবু বললেন যে, মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে যে শ্রেণী-সংগ্রাম ব'লে কিছু আছে তা তিনি বিশ্বাসই করেন না।

এই কথা শুনে নীরেনবাবুর দুই চোখ জল-জল ক'রে উঠল। তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন যে, তিনি মজ্জায়-মজ্জায় উপলব্ধি করেন যে যাঁরা তাঁর চাকরির মালিক, তাঁরা তাঁকে রীতিমতো শোষণ করছেন ও তিনি তাঁদের চাইতে একেবারে ভিন্ন শ্রেণীর লোক।

হাউস নীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বাড়ির চাকরদের তিনি যে শোষণ করছেন এই কথাও তিনি মজ্জায়-মজ্জায় উপলব্ধি করেন কিনা।

নীরেনবাবু একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিলেন, মাঝে-মাঝে সচেতন মুহূর্তে তিনি তা উপলব্ধি করেন।

নীরেনবাবুর সঙ্গে তাঁর ওপরওয়ালাদের যে শ্রেণীগত পার্থক্য আছে, সুশোভনবাবু তা মানতেই চাইলেন না।

মল্লিকদা বললেন যে, আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম প্রথা এত প্রবল যে, এখানে শ্রেণী-বিরোধ কোনদিন মাথা তুলতে পারবে না।

এরপর সুধীনবাবু বললেন যে তাঁর মোটরগাড়ির ড্রাইভার ও তিনি এক-জাতের লোক হলেও তার সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে খাওয়া তাঁর কল্পনাতীত। হারীতদা খুব গর্বের সঙ্গে বললেন যে, তাঁর এক ভাইয়ের ড্রাইভারের সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে তিনি খেয়েছেন।

নানা এলোমেলো কথার পর সভা ভঙ্গ হ'ল।

১০ ৮ই মে ১৯৩৬

পরিচয়-এ যাবার পথে ট্রামে ব'সে পড়ছিলাম ডক্টর ফুলার-এর উপদেশ: চোখ খুলে বিয়ে করবে আর বিয়ে হবার পর চোখ আধা বুঁজে থাকবে।

ভাবলাম, পরিচয়-সভায় গিয়ে এই জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনাব, কিন্তু তার আর সুযোগ হ'ল না। পরিচয়-সভায় গিয়ে দেখি হীরেন মুখুজ্জে একটি ইস্তাহার পড়ছেন: সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর আক্রমণের প্রতিবাদ। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের দশজন সেরা সাহিত্যিকের দস্তখত জোগাড় ক'রে এই ইস্তাহারটি প্রচারের প্রস্তাব হয়েছে। সবাই জিজ্ঞাসা করল, কোন দশজন? বাংলা দেশ থেকে যাঁদের স্বাক্ষর নেবার কথা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর নাম ছিল। ধূর্জটিবাবু তাতে আপত্তি ক'রে বললেন যে, অনুরূপা দেবীর বইয়ের যতই কাটতি হোক-না কেন, বাংলার বাইরে তাঁকে কেউ চেনে না।

শোনা গেল, আরো একটি প্রস্তাব হয়েছে যে নাম-করা সাহিত্যিকদের জিজ্ঞাসা করা হবে তাঁরা কেন ও কার জন্যে লেখেন এবং তাঁদের জবাব একত্র জড়ো ক'রে একটি জুতসই ভূমিকা জুড়ে ছাপা হবে। ফ্রান্স-এ কমিউনিস্টরা নাকি ইতিপূর্বেই এইজাতীয় প্রচারকাজে হাত দিয়েছেন।

১১ ৭ই অগস্ট ১৯৩৬

আলোচনা শুরু হ'ল কাণ্ট ও হেগেল্‌কে নিয়ে। একেবারে পণ্ডিতি আলোচনা। ক্রমে মার্কস্‌-এর কথা উঠতে নীরেনবাবু প্রভৃতি যাঁরা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন তাঁরা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। আলোচনা একটু জমতে হীরেন মুখুজ্জে বললেন, সুধীনবাবু খুব বেশি শ্রেণী-সচেতন। আর যায় কোথা! সুধীনবাবু বললেন, কথাটা নিছক বোকামি। সুশোভন ও আইয়ুব-এর মত হ'ল এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন-কোন শাখায় শ্রেণী-চেতনার প্রভাব খুব স্পষ্ট, আবার কোন-কোন শাখায় শ্রেণী-চেতনার প্রভাব প্রায় নেই বললেও হয়। সুধীনবাবু এই কথা শুনে বললেন, সর্বনাশ! আইনস্টাইনের আবিষ্কারের মধ্যেও কি শ্রেণী-চেতনা ফুটে উঠেছে?

একটু পরে প্রসঙ্গটা পাল্টে উঠল টি. ই. লরেন্স-এর 'সেভেন পিলার্স অফ উইসডম্‌' বইটির কথা। বেশিরভাগেরই মত হ'ল যে বইটি একেবারে উচ্চতম স্তরের সাহিত্য।

১২ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

নীরেনবাবু আজ উল্লেখ করলেন 'ক্রাইটেরিয়ন' পত্রিকার একটি সদ্য-প্রকাশিত প্রবন্ধের কথা। লেখক তাতে বলেছেন যে, শেক্সপীয়র যখন নিজেকে উপলব্ধি করলেন সম্পূর্ণভাবে, তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের যখন গূঢ় যোগ হ'ল, তখন হঠাৎ তিনি লেখা বন্ধ করলেন।

হাউস সাহেব ও সুধীনবাবু দু'জনেই বললেন, কথাটা তাঁদের কাছে খুব পরিষ্কার হ'ল না। তখন নীরেনবাবু আরম্ভ করলেন যোগের ভিত্তি কী তাই ব্যাখ্যা করতে। যোগ সম্বন্ধে হাউস কোন মন্তব্য করতে রাজি হলেন না।

ক্রমে কথা উঠল শেক্সপীয়রের কয়েকটি চরিত্রের, বিশেষ ক'রে ম্যাকবেথ-এর। দেখা গেল কীভাবে 'ম্যাকবেথ' পড়ান উচিত, এ-বিষয়ে নীরেনবাবু ও হাউস-এ আমূল মতভেদ।

এরপর উঠল চার্লি চ্যাপলিন-এর 'মডার্ন টাইম্‌স্‌' ছবিটির কথা। সুধীন-বাবুর তা খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু চ্যাপলিন-এর ছবি সম্বন্ধে হাউস উদাসীন।

আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন হাউস, সুরেন মৈত্র, বটকৃষ্ণ ঘোষ, বিষ্ণু দে, নীরেন রায়, সুমন্ত্র মহলানবিশ। আর বেশ মোটাসোটা এক তরুণ কবি, তাঁর চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল।

একটু পরে সুরেন গোস্বামী এসে প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের জন্যে প্রত্যেকের কাছে একটি ক'রে টাকা আদায় করতে শুরু করলেন।

ফেরার পথে বিষ্ণু দে বলছিলেন কল্লোল-সঙ্ঘের কথা। 'বেশ মজার দিন ছিল—একেবারে বোহেমীয় জীবন, কোন কিছুতেই বাদবিচার ছিল না।'

আস্তে-আস্তে টিপে-টিপে কথা বলেন বিষ্ণু দে, কিন্তু মাঝে-মাঝে কথায় বেশ হুল থাকে। শুনতে লাগে ভালো। বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখ ক'রে বিষ্ণু দে বললেন যে, পরিচয়-এর বুর্জোয়া পিউরিটিন্যাজিম্-এর প্রভাবে তিনি নাকি এতদূর আচ্ছন্ন হয়েছেন যে সমর সেনের একটি কবিতায় নারীদেহের বর্ণনা তাঁর কাছে অশ্লীল ব'লে মনে হওয়ায় তিনি সেটা 'কবিতা' কাগজে ছাপতে চান নি। বেচারি সমর সেন তাতে এমনি মুষড়ে পড়েছিল যে সটান সে বিষ্ণুবাবুর কাছে আসে সান্ত্বনার জন্যে।

সুরেন গোস্বামী ও হীরেন মুখুজ্জে এক মুসলমান বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলেন। একসময়ে ইনি ছিলেন অমৃতসরের কোন কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল, এখন জওহরলালের প্রাইভেট সেক্রেটারি। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি কথাবার্তা।

কে যেন প্রশ্ন তুলল, 'প্রগতিশীল লেখক' বলতে কী বোঝায়? এই নিয়ে আরম্ভ হ'ল উৎসাহিত আলোচনা।

নীরেনবাবু এই নবাগত ভদ্রলোকটিকে (নাম বোধহয় মামুদ হবে) জিজ্ঞাসা করলেন, প্রগতিশীল ইংরেজ লেখক একটিরও নাম করা যায় কিনা।

মামুদ বললেন, ফর্স্টার-এর শেষদিককার লেখাগুলি নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল, কেননা এগুলিতে পাওয়া যায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি।

নীরেনবাবু সহজে ছাড়বার লোক নন। তিনি মামুদের জবাবে বললেন যে, ফর্স্টার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ওপর চটা হলেও ভারতীয়দের প্রতি কোন সহানুভূতি তাঁর নেই। এরপর 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' বইটির কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। নীরেনবাবু বললেন, এই বইটিতে এমন একটি ভারতীয় চরিত্র নেই যার মধ্যে যথেষ্ট মর্যাদা ফুটেছে।

একটু পরে দেখা গেল ফর্স্টার কোথায় ভেসে গেছেন, কমিউনিজম্ নিয়ে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড বাগ্‌যুদ্ধ নীরেনবাবুর সঙ্গে বাদ-বাকি সকলের। মামুদের যুক্তি যেমন মনোগ্রাহী, তেমনি ভদ্র তাঁর কথা বলার রীতি। কিন্তু কমিউনিজম্-এর প্রসঙ্গ উঠলে সুধীনবাবু যেমন মারমূর্তি হয়ে ওঠেন, আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

আধুনিক দু'চারজন কবির নাম ক'রে সুধীনবাবু বলেছিলেন যে, তাঁদের ছন্দ-রচনার হাত নেই ব'লেই তাঁরা গদ্য-কবিতা লিখছেন, যা একেবারে অপাঠ্য। নীরেনবাবু এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এরপর তুমুল তর্ক হ'ল, আর দেখা গেল দু'জনেই সমান ডগ্‌ম্যাটিক।

আমরা তো হাল ছেড়ে ব'সে আছি, এমনসময়ে একটি মজার কথা শোনা গেল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হালের এক পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন ছিল: আকাশে আশ্চর্য জিনিস দেখা যায় কী-কী? একজন পরীক্ষার্থী নাকি এর উত্তরে লিখেছিল, এরোপ্লেন। হাউস-এর মত যে, এ-কথা যে লিখেছে তার পুরো নম্বর পাওয়া উচিত। নীরেনবাবু বললেন, কখনই নয়। আমি হাউস-কে সমর্থন করলাম, কিন্তু বাকি সবাই নীরেনবাবুর সঙ্গে একমত হলেন।

সুধীনবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেখি বেশ জোর সভা জমেছে। রহিম* ব'লে একজন নবাগত প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক প্রোলেটেরিয়ান মুভ্‌মেণ্ট সম্বন্ধে বলতে-বলতে উত্তেজনার আবেগে মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে উঠছিলেন।

অপূর্ববাবুর বোধহয় এইসব কড়া কথা পছন্দ হচ্ছিল না, তাই মাঝে-মাঝে তিনি চেষ্টা করছিলেন দু'চারটে হাল্কা কথা ব'লে প্রসঙ্গটাকে পাল্টে দিতে। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। ধূর্জটিবাবু দু'চারবার চেষ্টা করলেন কথার ফাঁকে দু'একটা মন্তব্য করার। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কান দিল না।

* মুসলমান নেতা সার আবদুর রহিম-এর ছেলে মজিদ রহিম, আই. সি. এস.।

সাহেদ সুরাওয়ার্দিকে এত উত্তেজিত হতে কখনো দেখেছি মনে পড়ে না। তাঁর কথায় বোঝা গেল সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে তাঁর কীরকম তীব্র ঘৃণা। ভারতবর্ষও যে একদিন রাশিয়ার পথে যেতে পারে এই কথা ভাবতেও নাকি তাঁর মন বিষিয়ে ওঠে।

পাঠকগোষ্ঠী

বাল্বিক ভাষা-সম্মেলন

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল মহাশয়ের 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর' সাগ্রহে পড়ছি —পরিচয়-এর কথা বলেও আর হিরণবাবুর লেখা বলেও।

গল্প যখন জমে উঠছে তখন রসভঙ্গ করতে চাই না গল্পের মাঝখানে বাধা দিয়ে। কিন্তু হিরণবাবু আড্ডা-রসিক, তাই কথার মধ্যে কথা পেলে তা মানিয়ে নিয়ে রসিয়ে তুলতে জানেন নিজের কথাকে। তাই একটু বাধা দিচ্ছি —অগ্রহায়ণের 'আবির্ভাব' পর্বটিতে তাঁর কথা যখন এগিয়ে গিয়েছে 'পৌষে'-র ফসলের খোঁজে।

পরিচয়-এর ঢাক পিটানোর কাজ করেছিলেন শ্রীযুক্ত নীরেন রায়। ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভালো লাগে। কিন্তু তবু চাই ঢাকী—যে-কোনো উৎসবের উদ্বোধনে। ও-বাজনা নাকি উৎসাহ-সঞ্চারের পক্ষে অপরিহার্য। ঢাকী অত্যুৎসাহী হলে হয়ত সভাক্ষেত্র শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু কুড়ি বৎসরেও যখন সভাক্ষেত্র একবারও ভাঙেনি, কেউ এসেছেন, কেউ গিয়েছেন, মোটের উপর পরিচয়-এর আসর খালি পড়ে নেই, তখন মানতেই হবে—ঢাকীর উৎসাহটা তেমন মারাত্মক হয়নি—উৎসবের মন্দা এসেছে মাঝে-মাঝে হয়ত ওস্তাদের অভাবে আর উৎসবেরই নিজস্ব নিয়মে।

ঢাকের বাজনা যখন কানেও আর নেই, আছে কাগজের পাতায় স্মরণীয় হয়ে, তখন শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল তাঁর উৎসাহী বন্ধু শ্রীযুক্ত নীরেন রায়ের সঙ্গে তাঁদের চিরদিনকার কথা-কাটাকাটির পালা অগ্রহায়ণের সংখ্যায় শুরু করতে উৎসাহী হয়েছেন। ওঁদের বন্ধুত্বরসের প্রকাশ 'করকম্পনে' নয়, কর-মর্দনে, তাই পাঠকগোষ্ঠীর দুর্ভাবনার কারণ নেই, যে, এ করমর্দন বুঝি হাতাহাতিরই উপক্রম। অন্তত আমার তা নেই। কারণ, আমি দু'জনাকেই হাতে হাত মিলিয়েও দেখেছি কথার লড়াইতে অপরিশ্রান্ত। তাই বুঝছি—কথা এবার জমছে।

কিন্তু পাঠক হিসাবে কথার মাঝখানে একটি কথা তবু বলবার কৌতূহল বোধ করছি। "এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা

ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে।" —শ্রীযুক্ত নীরেন রায়ের এই আশাটা কিন্তু 'অসংযত কলমের' লেখা নয়, 'অসম্ভাব্য পরিণতির কথাও' নয়, আর 'দুঃস্বপ্নও' নয়। ওতে আছে সেই সুদূর সম্ভাবনারই আভাস যা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ক্ষেত্র থেকেও পাওয়া যায়। স্তালিন জাতীয় ভাষা ও জাতীয় চেতনার আশ্রয়েই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বহু-জাতির দেশকে সাম্যবাদী পরিণতির দিকে—একথা আমরা জানি। কিন্তু তিনিই বলেছেন পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রবর্তিত হলে মানুষের নানা দেশের ভাষা মিলে যাবে কোনো একটা আন্তর্জাতিক সম্মিলিত ভাষায়। *On Linguistics* (কমরেড এ. খোলোপোফের উত্তরে লেখা) থেকে সেই অংশটির বাংলা অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি :

"যে-অংশে বিভিন্ন ভাষা একটি সাধারণ ভাষায় লীন হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, ষোড়শ পার্টি-কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে আহৃত স্তালিনের সেই অপর সাধারণ সূত্র (formula) সম্পর্কে বলা চলে যে, সেটি একটি সম্পূর্ণ পৃথক যুগ সম্বন্ধে, অর্থাৎ, সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্রের জয়ের পরেকার যুগ সম্পর্কেই সেটি প্রযোজ্য : দুনিয়ায় যখন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব নেই ; শোষক শ্রেণীগুলির উচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছে ; জাতীয় ও ঔপনিবেশিক অত্যাচারের অবসান ঘটেছে ; জাতিগত বিচ্ছিন্নতা এবং জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক ভুল বোঝা-বুঝির স্থান গ্রহণ করেছে জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার মনোভাব ; জাতিগত সাম্য যখন বাস্তবে পরিণত ; বিভিন্ন ভাষার স্বাধীনতা হরণ ও তাদের বিলোপসাধনের নীতিই বিলুপ্ত হয়েছে ; জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বর্তমান এবং যখন বিভিন্ন জাতীয় ভাষার পক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরস্পরকে যথেচ্ছ ঐশ্বর্যশালী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। সে-রকম অবস্থায় স্বভাবতই কোনো ভাষার স্বাধীনতা হরণ বা পরাজয় কিংবা অপর কোনো ভাষার জয়ের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এখানে আমরা এমন দুটি ভাষা নিয়ে আলোচনা করছি না, যাদের একটি, ধরুন, হার স্বীকার করছে আর অপরটি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে জয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে, এখানে আমরা আলোচনা করছি এমন শ'য়ে শ'য়ে জাতীয় ভাষা নিয়ে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে দীর্ঘদিনের পারস্পরিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ফলে যাদের মধ্যে থেকে সেদিন প্রথমে দেখা দেবে প্রত্যেক অঞ্চলে একটিমাত্র সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা এবং তার পরে সেই আঞ্চলিক

ভাষাগুলি লীন হয়ে যাবে এমন একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক ভাষার গর্ভে—যা না-জার্মান না-রুশ না-ইংরেজি—জাতীয় এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলির শ্রেষ্ঠ সম্পদ আত্মস্থ করে যা হয়ে উঠবে একটি সম্পূর্ণ অভিনব ভাষা।"

[সোভিয়েট লিটারেচার, ১৯৫০ সালের ৯ম সংখ্যা, পৃ ৩০-৩১ দ্রষ্টব্য]

এই দ্বান্দ্বিক ভাষা-সম্মেলনের আশাকে 'দুঃস্বপ্ন' বললে তা 'অবাস্তব' হবে, তবে আজকের অবস্থায় তা 'অমার্জনীয়' হবে না।

আমার কথাটি ফুরোলো, কিন্তু চলুক হিরণবাবুর কথা, আর তাঁর বন্ধু-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর দ্বান্দ্বিক কর-সম্মেলন। সাগ্রহে থাকব তাঁর লেখার জন্য। ততক্ষণ করজোড়ে জানাই নমস্কার।

গোপাল হালদার

লেখকের উত্তর

পাঠকগোষ্ঠীতে গোপালবাবু আমার পিঠ চাপড়েছেন ও সেই সঙ্গে কানও মলেছেন। এতে প্রমাণ হয় যে তিনি যেমন সহৃদয় তেমনি কর্তব্যপরায়ণ। আমারও কর্তব্য ঘটনাটির পুরোপুরি বিবরণ এই কাহিনীর অন্তর্গত ক'রে নেওয়া, নইলে সত্য গোপন করার দায়ে আমি দায়ী হব।

মোট কথা এই যে, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এই রচনার তৃতীয় কিস্তিতে আমার গুরুতর স্খলন ঘটেছিল। পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় অবতরণিকায় নীরেন লিখেছিল : "এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে।" নীরেনের এই কল্পনাকে আমি অসম্ভাব্য ও অবাস্তব ব'লে পরিহাস করে-ছিলাম। এই পরিহাস ফিরে এসে লেগেছে আমারই গায়ে। গোপালবাবু আমার ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন স্টালিনের নজির উদ্ধার ক'রে। ভাষা-সমস্যা সম্বন্ধে স্টালিনের যে-সব মত ও মন্তব্য অল্পদিন হ'ল প্রকাশিত হয়েছে তাতে এক জায়গায় আছে ঐ-জাতীয় পরিণতিরই কথা। নীরেন রায়ের কুড়ি বছর আগেকার ও স্টালিনের হালের কল্পনায় দেখা যায় হুবহু মিল।

আমার শুধু একটি নিবেদন আছে মার্কসবাদী বন্ধুদের কাছে। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে স্টালিন যে-সব মতামত প্রকাশ করেছেন তাদের সঙ্গে ঐ-উক্তির কি কোন ন্যায়গত ও অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে? যদি না-থাকে, তাহলেও কি এই উক্তিকে মেনে নিতে হবে সুচিন্তিত মার্কসীয় মত ব'লে? স্টালিনের কথার

কথা বা ওবিটার ডিকটাস ব'লে এই উক্তিকে বর্ণনা করলে কি প্রত্যবায় ঘটবে? আমি মন্তব্য করছি না, প্রশ্ন করছি।

যাই হোক, কানমলার জন্যে গোপালবাবুর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। কেননা বয়সে ছোটো হলেও তাঁকে গুরু ব'লে মেনে নিয়েছি বহুদিন হ'ল, যেমন মেনেছি বয়সে বড়ো নীরেন রায়কে ও ছোটো-বড়ো আরো অনেককে। মাঝে-মাঝে বচনে ও রচনায় যদি গুরুমারা বিদ্যা জাহির করার দুষ্প্রবৃত্তি জাগে তাতে ভয়ের কারণ নেই, কেননা তার দৌড় মাত্র দু'চার গজ।

'পরিচয়-এর কুড়ি বছর' প্রসঙ্গে

...পরিচয়ের মাঘ সংখ্যা আসামাত্র স্বভাববশত পড়ে ফেললাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজে বেরুতে হবে, নচেৎ অনেক কথাই লিখতে পারতাম। কেবল হিরণকুমার সান্যালের "পরিচয়-এর কুড়ি বছর" সম্বন্ধে যৎসামান্য মন্তব্য করবার সময় আছে।

ছোট কথা দিয়ে আরম্ভ করি। হিরণ লিখছে, "ধূর্জটিবাবুর উপর ভার পড়েছিল এই বইগুলির (বারবুস্, ডিউই, ড্রাইজার ও রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া সংক্রান্ত রচনার) আলোচনার।" আমার উপর কোন 'ভার' পড়েনি, দেওয়া হয়নি, চাপান হয়নি; স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আলোচনা করেছিলাম।

কথাটা ছোট এবং ব্যক্তিগত বটে, কিন্তু ঐ 'ভার পড়েছিল' শব্দের প্রয়োগ থেকেই হিরণকুমারের ইতিহাস বর্ণনার দোষ ধরা পড়ে। হিরণকুমার প্রধানত সাহিত্যিক; এবং রস সাহিত্যে হাত তার এতই পাকা যে মাত্র বস্তুনিষ্ঠ হতে তার বেগ পেতে হয়। অথচ ইতিহাস লিখছে সে পরিচয়ের, ও পরিচয়ের পৃষ্ঠায়! তাই সন্দেহ হয় যে তার বর্ণনা উপভোগ্য হলেও 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে না। এ যেন অচিন্ত্যকুমারের কল্লোল যুগের বর্ণনার সংযত সংস্করণ। তাই কি তোমরা চাইছ?

পরিচয়-গোষ্ঠীর প্রত্যেকের স্টাণ্ডার্ড ছিল, কিন্তু গোষ্ঠী হিসেবে তার কোনো ইডিয়লজি ছিল না, যদিও প্রত্যেকে আইডিয়ার ব্যবসায়ী ছিল। ঐ সাধারণ স্টাণ্ডার্ড-এর ওপর ভর করেই কাজ চালানো গিয়েছিল। সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ডই ছিল সবচেয়ে উঁচু, আমাদের কারুরই স্টাণ্ডার্ড নিচু ছিল না; কিন্তু আমরা জ্ঞানত ও অজ্ঞানত সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ড বজায় রাখতে চেষ্টা করতাম। একদিনও

সে সম্পাদকী কর্তৃত্ব ফলায়নি; আমরাও কোনোদিন আচারে-ব্যবহারে তাকে জানবার অবসর দিইনি যে সেই সম্পাদক। অথচ, বহু রচনার সম্পাদন সে করেছে। একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিতের প্রকাণ্ড লেখা সে ও সত্যেন বসু (আরও একজন বোধ হয় গিরিজাপতি) কেটে ছেঁটে ছোট করে ছাপিয়েছে। এও জানি যে ছাপবার পূর্বে ও পরে তারা ভয়ে ও লজ্জায় পালিয়ে বেড়িয়েছে। গল্প ছেড়ে দেওয়া যাক। মোদ্দা কথা, পরিচয়ের স্টাণ্ডার্ড আমাদের সম্মিলিত স্টাণ্ডার্ড কিন্তু তার মধ্যে সুধীনের স্টাণ্ডার্ড সবচেয়ে উঁচু ও যুক্তিসাপেক্ষ ছিল বলেই সেই সম্মিলিত স্টাণ্ডার্ড ছিল উর্ধ্বমুখী। এটা কেবল তার অধীত বিদ্যার জন্য নয়। আমরা সকলেই খুব পড়তাম; সন্দেহ হয় সুবোধবাবু, সত্যেন বসু, বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি পণ্ডিতরা আমাদের চেয়ে বেশিই পড়েছিলেন, এমন কি সুধীন্দ্রেরও চেয়ে। তবু যেন সুধীন্দ্রের মানদণ্ডটা ছিল তর্কবুদ্ধি ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া সে একটা সমন্বয় করতে পারত যেটা আমরা অনেকেই পারতাম না। এই আভ্যন্তরীণ প্রকরণেই পরিচয়-গোষ্ঠীর মানদণ্ড খাড়া ও উঁচু থাকে। আমি প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনা-প্রক্রিয়া কি ছিল জানি; কিন্তু পরিচয়ের সম্পাদনায় সম্পাদকের 'হাত' ছিল সকলের জানা উচিত, কেবল সে হাত কেউ টের পেত না।

সময় হল যাবার। ফ্যাসিবাদের জন্ম কোন্ মনোভাবে? হতাশায়, বীতশ্রদ্ধায়, ঘৃণায়, ভয়ে, দায়িত্বহীনতায়, বিরক্তিতে, disillusionment-এ, frustration-এ? কোন্‌টায়, কোন্ কোন্‌টার মিশ্রণে? "সুধীন দত্ত জ্ঞাতসারে ফ্যাসিবাদ অবলম্বন না-করলেও যে-মনোবৃত্তি থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম, তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি।" এ-ধরনের মন্তব্যের সদর্থ খুঁজে পাই না; অবশ্য একটা সাধারণ অর্থ আছে, এবং সে-অর্থ ব্যবহার করা হিরণের পক্ষে অযোগ্য। সুধীন্দ্রের পরিচয়ে প্রকাশিত ও তার ঈষৎ পূর্বযুগে রচিত কবিতায় মূল সুর ছিল যাকে গ্রীক ড্রামায় বলে pathos; অর্থাৎ মহানিয়তির অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুবর্তিতার সম্মুখে ব্যক্তির অক্ষমতা ও তজ্জনিত বিষাদ। গ্রীক ড্রামার নিশ্চয়তা-বোধের পরিবর্তে সুধীন্দ্রের কবিতায় সংশয়-বোধের লক্ষণই বেশি। 'তবে কি' এই দুটো কথা সে প্রায় ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় প্রভেদ সুধীনের ডায়ালেক্‌টিক্ চিত্তবৃত্তিতে। 'অথচ' কত বারই না সে লিখেছে, যার সাক্ষাৎ পুরাতন সাহিত্যে আমি তো দেখিনি। সুধীন্দ্রের রচনায় এই দ্বন্দ্ব-বোধ পাক খেতে খেতে ওপরে ওঠে, সেখানে হিন্দু দর্শনের তত্ত্বকথা খুঁজে পাওয়া

কঠিন নয়। আমি লিখছি 'তত্ত্ব', কেবল পৌরাণিক কিংবা বৈদিক উপমা ও প্রতীক নয়। সুধীন্দ্র আচারে সাহেব, কিন্তু অন্তরে একেবারে হিন্দু; তার ওপর তার পিতার প্রভাব খুবই আন্তরিক। যদি 'মনোবৃত্তির' দ্বারাই সুধীনকে বুঝতে হয় তবে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কি ছিল বুঝতেই হবে। সেই সঙ্গে আরও ধরতে হবে কালচারের দ্বন্দ্ব। মাইকেলের কালচারে যে-বিরোধ সেইটাই নবরূপে ফুটে উঠেছে সুধীন্দ্রের মাইকেলী বলিষ্ঠ গঠনের কবিতায়। সুধীন্দ্রের মনোবৃত্তিতে যে নতুনত্ব সেটা পশ্চিমী সভ্যতায় প্রথম যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য, যে অধ্যায় থেকে পশ্চিমের বিংশ শতাব্দীর শুরু। অবশ্য সুধীন্দ্রের কবিতায়, অন্তত গোড়ার দিকে, রোমান্টিক ভাব একটু বেশি। কিন্তু সেটা বুদ্ধদেব প্রভৃতি খ্যাতনামা কবির রোমান্টিসিজম্ থেকে ভিন্ন। হাঁ, আরেকটি কথা। সুধীন্দ্রের গদ্য রচনায় ফ্যাসি মনোভাবের জড় কোথায়? সুধীন্দ্রকে কবি হিসেবে দেখলে কিছুতেই চলবে না, তাকে গদ্যলেখক এবং একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ও সমালোচকও ভাবতে হবে। আমি যতদূর মার্কসিজম্ বুঝেছি তাতে মনে হয় মার্কসিস্ট দৃষ্টি সমগ্র, আংশিক নয়, মনোবৃত্তি নিয়েই তার কারবার নয়। আংশিক আলোচনার জন্যই মার্কসিস্ট সাহিত্যবিচার হাস্যাস্পদ হয়েছে। তোমরা Hauser-এর *Social History of Art* পড়েছ? তার দ্বিতীয় ভলুমটা পড়ে সমালোচনা কর না কেন? (কুড়ি বছর আগে আমরা ঐ কাজ করতাম।) পড়লে বুঝবে কাকে social criticism বলে।

আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বহু ফরাসী লেখক ও চিত্রকরের রচনায় frustration-এর অগণ্য নিদর্শন ছিল; অথচ তাদেরই মধ্যে একাধিক ব্যক্তি প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিলে, পরেও কমিউনিস্ট রইল। কিন্তু মালরো, যে ছিল কমিউনিস্ট সাহিত্যের ধুরন্ধর, যার নভেল তখনকার প্রগতিশীল সাহিত্যিকের কণ্ঠমালা ছিল, সে আজ কোথায় দাঁড়িয়ে! হামসুনের *Growth of the Soil* নিয়ে কি এককালে বাড়াবাড়ি করিনি আমরা? অথচ সে গেল Quisling-এর সঙ্গে। এর ব্যাখ্যা মনোবৃত্তির সাহায্যে পাবে কি?

ভাবছ বোধ হয় সুধীন্দ্রের তরফদারি করছি। তাই যদি ভাব, তবু লজ্জিত হব না। ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে: তোমাদের মার্কসিস্ট আলোচনাও আংশিক এবং রসালোচনাও কেবল মুখরোচক। বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?...

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ইতিপূর্বে গোপালবাবুর কাছে কানমলা খাওয়ার কথা কবুল করেছি (ফাল্গুন ১৩৫৮)। অতঃপর গত মাঘ সংখ্যায় তথ্য ও তত্ত্ব-ঘটিত গুরুতর ত্রুটির জন্যে ফাল্গুন সংখ্যার পাঠকগোষ্ঠীতে ধূর্জটিবাবু আমাকে তিরস্কার করেছেন। তিরস্কারের অধিকার তাঁর আছে, অজুহাতও পেয়েছেন; কিন্তু 'মাত্র আধঘণ্টা' সময়ের মধ্যে এই অধিকার প্রয়োগ করতে হয়েছে ব'লে আমি এ-যাত্রা অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়েছি।

তথ্যের ত্রুটি এই: পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম যে ধূর্জটিবাবুর ওপর 'ভার পড়েছিল' রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' ও ডিউই, বারবুস্, ড্রাইজার-এর রাশিয়া-বিষয়ক বইগুলির আলোচনার। ধূর্জটিবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, এই উক্তি অতথ্য; কেননা ভার নিয়েছিলেন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। কথাটা 'ছোটো' এবং 'ব্যক্তিগত' হলেও এতে নাকি সাব্যস্ত হয় যে রসসাহিত্যে হাত পাকানোর ফলে 'মাত্র বস্তুনিষ্ঠ' হতে আমাকে বেগ পেতে হয়। অবশ্য হয়, কিন্তু রস-সাহিত্যে যদি-বা হাত পাকিয়ে থাকি তো তার কুফলে নয়। ঐ দুয়ে যে কোন বিরোধ নেই তার প্রমাণ, বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার পক্ষ থেকে ধূর্জটিবাবুর এই প্রতিবাদ রসিকজনের উপভোগ্য হয়েছে।

অতঃপর তত্ত্বের বিকার। পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় সুধীন করেছিলেন মালরো প্রভৃতি ফরাসি লেখকদের একগাদা বইয়ের সমালোচনা। সুধীন-মালরো প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করেছিলাম:

“সম্পাদকীয় পরিভাষা খুব পরিষ্কার নয়, তাই সম্পাদকীয় পক্ষপাতের সূত্র ধ'রে ঐ-যুগের মালরোর রচনা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা হয়তো সঙ্গত হবে না।” ছাপাখানার জাদুতে 'পক্ষপাতের' কথাটি উবে গিয়ে আমার বাক্যটি একটু বেখাপ্পা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর লিখেছিলাম, “সুধীন দত্ত জ্ঞাতসারে ফ্যাসিবাদ অবলম্বন না-করলেও যে-মনোবৃত্তি থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি।”

এই ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক শুরু হ'লে তার শেষ হবার সম্ভাবনা কম। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই: এখন যে-সব মতবাদের চেহারা আমাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট, পরিচয়-এর আদিযুগে ভাবগঙ্গার ঘোলাটে জলে তখন তারা

ছিল আবছায়ার মতন। 'গোষ্ঠী হিসাবে পরিচয়-এর কোন ইডিয়লজি ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকেই ছিল আইডিয়ার ব্যবসায়ী।'—ধূর্জটিবাবুর এই কথা মানি। এই ব্যবসায়-সূত্রে ঐ-সব আবছায়ার প্রতিঘাতে বিভিন্ন মনে বিভিন্ন সাড়া জাগিয়েছিল। তারই বৃত্তান্ত দিতে গিয়ে আমার বক্তব্যে 'আংশিক মার্কস্‌বাদ'-এর মোহে যে-বিকার ঘটেছে তাই হয়েছে ধূর্জটিবাবুর আধঘণ্টা-ব্যাপী উত্তাপের কারণ। এই মোহমোচনের উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে লক্ষ্য ক'রে নিক্ষেপ করেছেন তাঁর মোহমুদ্গার। এই মুদ্গারের মধ্যেও মোহের উপাদান অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু তা শিরোধার্য করলাম এই আশায় যে, ভূতগ্রস্ত সরষে দিয়ে ভূত ছড়ানোর চেষ্টায় যদি সমধিক বিপদ ঘটতে পারে তবু এ-ক্ষেত্রে হয়তো-বা বিষে বিষক্ষয় হয়ে আমি মোহমুক্ত হতে পারি।

অন্যান্য স্মৃতিচিত্র

পরিচয়-এর আড্ডা

আড্ডার রাজা আমি বলি সত্যেন বোসকে। একসময় ছিল যখন তিনি কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতেন শুধু আড্ডার লোভে—হয়তো একেবারে হাঁটাপথেই। শেষজীবনে যখন তিনি আর হাঁটতে পারতেন না, আড্ডা জমত তাঁর বাড়িতেই প্রতি শনিবার বিকালে চা ও ঘুগ্‌নির সঙ্গে। বাড়ির তৈরি অপূর্ব ঘুগ্‌নি। এ-আড্ডাকে সাহিত্যিক আড্ডা নিশ্চয় বলা চলে এবং বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক আড্ডা; কেননা এমন বিষয় নেই যা নিয়ে এখানে আলোচনা হ'ত না, আর এ-সব বিষয়ে সত্যেনবাবুর মন্তব্য শুনলে মনে হ'ত উনি বিজ্ঞান ছাড়া আর-সব বিষয়েই পারদর্শী, কেননা বিজ্ঞান নিয়ে তর্কাতর্কি হ'ত খুব কমই।

সত্যেনবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল পঞ্চাশ বছরেরও আগে। ঢাকায় ওঁর বাড়িতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করি বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায়ের নির্দেশে। নীরেনের পরামর্শ দেওয়া বা অনুরোধ করার ধাতই ছিল না—ও দিত সোজাসুজি নির্দেশ। সত্যেনবাবুর সঙ্গে কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল বছর-দশেক পরে যখন পরিচয় প্রকাশিত হ'ল আর নীরেন এসে জুটল সুধীনের সঙ্গে পরম উৎসাহে। নীরেনকে জোটালেন বোধহয় সত্যেনবাবুই কিংবা হয়তো গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, আর নীরেন আনল সুশোভন সরকারকে ও আমাকে, পরে ওর ছাত্র বিষ্ণু দে-কে। পরিচয় প্রকাশের সময় সত্যেনবাবু ছিলেন ঢাকাতে এবং সুশোভনও। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লখ্‌নৌ থেকে কলকাতায় এলেই পরিচয়-এ শুক্রবারের বৈঠকে এসে জুটতেন।

সাহিত্যিক আড্ডায় আমার হাতে-খড়ি হয়েছিল পরিচয়-যুগের বহু আগে সেই 'মান্‌ডে ক্লাব' থেকে শুরু ক'রে। মান্‌ডে ক্লাবের কথা একাধিকবার বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক লেখা হয়েছে। এটা ছিল রীতিমতো ক্লাব অর্থাৎ খাতায় নাম-লেখা সভ্য যাঁদের প্রত্যেককে মাসে চার আনা ক'রে চাঁদা দিতে হ'ত। সভ্যদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সভা বসত, আর যার বাড়ি, খাওয়ানোর ভার তার ওপর। প্রশান্ত মহলানবিশ খুব আপত্তি জানিয়ে একদিন বললেন, "এত খাওয়া-

দাওয়া হলে কোন গুরুতর আলোচনা সম্ভব হয় না, সুতরাং আগামী সপ্তাহে আমার বাড়িতে যে-অধিবেশন হবে তাতে শুধু চা আর শস্তার বিস্কুট থাকবে।" সবাই ভাবল ঠাট্টা। কিন্তু দেখা গেল পরের অধিবেশনে সত্যিই শুধু চা আর ক্ষুদে-ক্ষুদে জেম বিস্কুট। সভ্যদের প্রবল আপত্তিতেও প্রশান্তবাবু রইলেন অটল। তখন সুকুমার রায় আমাকে চুপি-চুপি বললেন, "দেখ, প্রশান্তর বাড়ির ভিতরে গিয়ে আমার নাম ক'রে বলো বেশ-কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে।" আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম। চট্‌পট্ তাতাদা'র অর্থাৎ সুকুমার রায়ের হুকুম তামিল করলাম এবং ফলে অল্পক্ষণ পরেই যখন শ্রীমানী বাজারের 'চিরপরিচিত' গিরিশ চক্রবর্তীর চপ্ ও অন্যান্য খাবার এসে হাজির হ'ল তখন এমন হুল্লোড় উঠল যে প্রশান্তবাবু আর একটি কথা কইবার অবসর পেলেন না। আমি আড্ডার কথা লিখতে গিয়ে কোন ব্যক্তিগত মন্তব্য করতে চাই নে কিন্তু সত্যের খাতিরে শুধু এই কথা বলতে চাই প্রশান্ত মহলানবিশই মান্‌ডে ক্লাবের আর-এক অধিবেশনে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বাড়িতে এতগুলো ল্যাংড়া আম খেয়েছিলেন যা সংখ্যাতাত্ত্বিকের গড়পড়তা হিসাবে অসম্ভব গরমিল ঘটায়।

মান্‌ডে ক্লাবের কথা আর-একদিন না-হয় বিস্তৃত ক'রে বলা যাবে, কিন্তু আর-একটি নির্দিষ্ট দিনের আড্ডার কথা বলি: ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই সংগীত শিল্প প্রভৃতি শেখবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার সঙ্কল্প করেন। নন্দলাল বসু ঐ-সূত্রেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে ছবি আঁকা শেখাতে শুরু করেন—শান্তিনিকেতনে যান তিনি আরো পরে। ঐ-সময়ে ছেলেদের ও মেয়েদের দু'টি আলাদা সাপ্তাহিক অধিবেশন আরম্ভ হয় নানাবিধ আলাপ-আলোচনার জন্য। ছেলেদের অধিবেশনটিকে বলা হ'ত 'বৈঠক', মেয়েদের সভাটির নাম তাঁরা নিজেই দিয়েছিলেন 'আলাপিনী'। শুনে কবি মন্তব্য করেছিলেন, নামটি ভালো হয়েছে কেননা আলাপিনী মানে বীণা। কখনো-কখনো একত্রে ছেলেমেয়েরা মিলে বড় সভা জমাতেন। পরে এই বৈঠক ও আলাপিনীর মিলিত অধিবেশনের নামই দাঁড়িয়েছিল 'বিচিত্রা', যার জন্য জোড়াসাঁকোর লাল বাড়ি—যেখানে প্রায়ই অধিবেশন বসত—আজও বিচিত্রা নামে পরিচিত।

এই বিচিত্রা প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে শনিবারের চিঠি-র আড্ডার কথা। এই আড্ডার কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় ছিল না। দৈনিক খবরের কাগজগুলোতে কাজের চাপ প্রচণ্ড, কিন্তু সাপ্তাহিক বা মাসিক কাগজগুলোর হাল অন্যরকম,

কাজও চলে আর সঙ্গে-সঙ্গে আড্ডা। পরিচয়-এর অফিসে এখনো রোজ সন্ধেতেই আড্ডা জমে—কখনো কম কখনো বেশি। ভারতী-র আড্ডার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু কখনো যাই নি। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ভারতী নয়, নবপর্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের ভারতী। সবুজপত্র-এর আড্ডার কথাই-বা কে না-জানে। আর যে যমুনা কাগজে গল্প লিখে শরৎবাবু প্রথম নাম করেন, শুনেছি তার অফিসেও বেশ সাহিত্যিক আড্ডা জমত। এ-সব ঘটনা হ'ল মান্‌ডে ক্লাবেরই প্রায় সমসাময়িক।

এর বছর-দশেক পর অর্থাৎ শনিবারের চিঠি যখন প্রথম প্রকাশ হয়, পটুয়াটোলা লেনে সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাসের বাড়িতে কল্লোল কাগজের রীতিমতো আড্ডা বসত। আমি সেখানে খুব কমই গিয়েছি—যেটুকু মনে আছে তা আড্ডার নয়, আলুর দমের। অপূর্ব আলুর দম করতেন দীনেশ-বাবুর বউদি। দীনেশবাবুর বোন, শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর আদিবাসী শ্রীমতী নিরুপমা দেবী—'নিরুদি' ব'লে যাকে সবাই জানে—তাঁর বউদির রান্নার হাত যে অনেকটা পেয়েছেন, তা না-বললে সত্যের অপলাপ হয়। একেবারে পা পিছলে আলুর দম—কেননা আমি যাচ্ছিলাম অন্য পথে, অর্থাৎ বিচিত্রা-র প্রশস্ত হল-এর সঙ্গে সবুজপত্র-এর কী যোগসূত্র তাই বলতে। তাহলে সে-কথাটা এবার বলা যাক। এই বিচিত্রা হল-এই একটি সভা আহ্বান করা হয় রবীন্দ্র-নাথের নির্দেশে। আলোচ্য বিষয় ছিল আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতা। আধুনিক সাহিত্য বলতে বোঝাত প্রধানত কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের গল্প-উপন্যাস। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় বয়েসের বিষম তারতম্য সত্ত্বেও রচনাবৈশিষ্ট্যে ওদের সমগোত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ-সভায় অবশ্য তিনি আসেন নি।

কল্লোল-এর অন্যতম লেখক বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ঢাকায় অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দের প্রিয় ছাত্র। অপূর্ববাবুই রবীন্দ্রনাথকে ব'লে বিচিত্রা হল-এ ঐ-আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেন। এ আর আড্ডা নয়, দস্তুরমতো বিচারসভা! দুই পক্ষই রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের বক্তব্য জানান এবং রবীন্দ্রনাথ দুই পক্ষকেই কিছু কড়া কথা শোনান। আমার কেবল একটি ঘটনা মনে পড়ে: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কোন-একটি গল্পে আকাশের বর্ণনা ছিল 'বিশ্রী' ব'লে—ঐটুকু প'ড়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে সতরঞ্চি চাপ্‌ড়ে বললেন: "আকাশকে বিশ্রী বলা হয়েছে সাহিত্যে এই প্রথম।" শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীও ঐ-সভায় উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। এ-কথা আজ হয়তো অনেকে

ভুলে গিয়েছেন যে নীরদবাবুর বাংলা সাহিত্যে হাতে-খড়ি হয় বীরবলকে আক্রমণ ক'রে একটি ব্যঙ্গরচনা লিখে। নীরদবাবু বীরবলের প্রতি সুবিচার করেন নি, কিন্তু লেখাটিতে ছিল আশ্চর্য নিপুণ হাতের ছাপ। এরপর নীরদবাবু ইংরেজি লেখার উপর এত ঝোঁক না-দিলে বাংলা গদ্য আরো সমৃদ্ধ হতে পারত।

শনিবারের চিঠি-র সঙ্গে আমার যেটুকু যোগাযোগ ছিল তা ক্রমশ ঘুচে গেল পরিচয় প্রকাশের পর। পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৯৩১)। আড্ডা বসতে শুরু হয় প্রতি শুক্রবার, এর কিছু আগে থেকে। উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু আড্ডা নয়—কাজ। অর্থাৎ রচনার নির্বাচন, রচনা সংগ্রহের ব্যবস্থা ও এই উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ। সুধীন কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করত প্রত্যেক অধিবেশনে। কিন্তু এইভাবে সমিতির আকারে যার পত্তন, কিছুদিন যেতে-না-যেতে তা গিয়ে দাঁড়াল নিছক আড্ডায়, আর যে-সব রচনা সম্বন্ধে সম্পাদক অর্থাৎ সুধীন মত স্থির করতে পারত না সেগুলি যাদের যোগ্য বিবেচনা করত তাদের দিত মতামতের জন্য। বিবাহ-বিষয়ক দুটি রচনা এসে পৌঁছল। একটির রচয়িতা প্রখ্যাত পণ্ডিত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অপরটির যুগ্ম লেখক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শান্তিপ্রিয় বসু। দু'জনেই তখন অখ্যাত ও তরুণ। পরিচয়-এর অধিবেশনে দুটি লেখাই পড়া উচিত ছিল কিন্তু আড্ডার তাগিদে কী ক'রে তা সম্ভব হয়? সুতরাং বিচারের ভার পড়ল নীরেন্দ্রনাথ রায় ও আমার ওপরে, এই যুক্তিতে যে, আমরা দু'জনেই অবিবাহিত সুতরাং নিরপেক্ষ বিচার আমাদের দ্বারাই সম্ভব।

পরিচয়-এর আড্ডায় অবিবাহিত আরো কেউ-কেউ ছিলেন: যেমন, বয়সে আমাদের চেয়ে ক'বছরের বড় সাহেদ সুরাওয়ার্দি কিংবা বছর-কয়েকের ছোটো বিষ্ণু দে। আর বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী রাধারমণ মিত্র—যদিও প্রথম দিকে তিনি খুব বেশি আসতেন না। বিষ্ণু দে এসেছিলেন পরিচয় শুরু হবার কিছুদিন পরেই। সাহেদ সুরাওয়ার্দিও আসতে শুরু করেন শুরু হবার অল্পদিন পর থেকেই, বোধহয় তাঁর অক্সফোর্ড-এর বন্ধু অপূর্বকুমার চন্দের নিমন্ত্রণে। কিন্তু দেখতে-দেখতে সুধীনের সঙ্গে তাঁর এমন জ'মে গেল যে মনে হ'ত দু'জন অবাল্য বন্ধু। সাহেদ ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলতেন। অমন চোখা-চোখা কথা খুব কমই শোনা যায়। দু'একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে:

সুরাওয়ার্দির শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল খুব বিস্তৃত আর বিদেশে বহুদিন বাস করার পর কলকাতায় আসেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টের অধ্যাপক হয়ে। আমি একদিন কথায়-কথায় ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ভাস্কর এপ্‌স্টাইন খুব উঁচুদরের শিল্পী কিনা। সাহেদ তৎক্ষণাৎ বললেন: "Yes, but only in England, just as our friend Apurba flourishes as a scholar in Chittagong." অপূর্ব চন্দ তখন ছিলেন চট্টগ্রাম গভর্নমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ। একদিন সুধীনের গাড়িতে আমি ও সুধীন সুরাওয়ার্দির বাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁকে পৌঁছে দিতে। সেখানে ওঁর কাকা স্যর আবদুল্লা সুরাওয়ার্দির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে উনি বললেন: "Returning to India after many years abroad I find that every scoundrel in my community has became a front-rank polititian." স্যর আবদুল্লা এই শুনে আমাকে বাংলাতেই বললেন, শুনছেন মশায়, ভাইপো হয়ে খুড়োকে কী বলছে? সুরাওয়ার্দি কিছুদিন শান্তিনিকেতনেও অধ্যাপনা করেছিলেন এবং সেখানকার অধ্যাপকদের নাকি contract bridge শিখিয়েছিলেন।

সুরাওয়ার্দি প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যে পরিচয়-সভায় অক্সফোর্ড-ফেরত গুণীদের প্রাধান্য ছিল সবচাইতে বেশি, অন্তত সংখ্যায়, যেমন: সুরাওয়ার্দি, অপূর্ব চন্দ, তুলসী গোঁসাই, সুশোভন সরকার, হুমায়ুন কবির, হীরেন মুখুজ্জে এবং পালের গোদা বসন্তকুমার মল্লিক—যাঁকে আমরা বরাবর জেনেছি মল্লিকদা ব'লে একেবারে প্রথম পরিচয় থেকে। অধ্যাপক কিরণ মুখোপাধ্যায় মাঝে-মাঝে আসতেন। ইনি অক্সফোর্ড-এ গ্রীক ভাষা ও দর্শনে কৃতিত্ব অর্জন ক'রে অল সোল্‌স্ কলেজ-এর ফেলো হয়েছিলেন। সুরাওয়ার্দি তাই এঁকে ঠাট্টা ক'রে 'প্লেটো' ব'লে ডাকতেন।

পরিচয়-সভায় যাঁরা মাঝেসাঝে আসতেন, তাঁদের মধ্যে সবচাইতে বয়সে বড় ছিলেন বোধহয় প্রমথ চৌধুরী মশায়। তার পরেই চারুচন্দ্র দত্ত। চারুবাবুর 'পুরানো কথা' পরিচয়-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে পরে ছাপা হয় বই আকারে। এরকম বই বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। চারুবাবু যে অসাধারণ মজলিসি লোক ছিলেন তার সাক্ষ্য দেবেন তখনকার যুগের শান্তি-নিকেতনের যাঁরা আজও বেঁচে আছেন। কেননা ইনি রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে বেশ-কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলেন সেখানকার পরিচালনা-ভার

নিয়ে। সেকালের সিভিলিয়ান, সুতরাং পাকা সাহেব বলতে যা বোঝায় তাই – কিন্তু ফিরিঙ্গিয়ানার রেশমাত্র ছিল না চারুবাবুর আচার-ব্যবহারে। আর কী গল্পই-না তিনি করতে পারতেন। তার সাক্ষ্য আছে 'পুরানো কথা'র পাতায়-পাতায়। এই বইটি বাংলা সাহিত্যের একটি রত্ন। দুটি গল্পের বইও তিনি লিখেছিলেন, 'কৃষ্ণরাও' ও 'দুনিয়াদারী'। এই বইদুটিও উপেক্ষার জিনিস নয়।

প্রমথবাবু ও চারুবাবুকে বাদ দিলে জ্যেষ্ঠতম ছিলেন মল্লিকদা। প্রথম দিন থেকেই তিনি জ্যেষ্ঠের অধিকার কিছুমাত্র সংকোচবোধ না-ক'রে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। অর্থাৎ কেউ কোন আল্‌গা কথা বললেই মল্লিকদা গুরুমশাইয়ের মতো তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতেন। মল্লিকদা হাল্‌কা কথা একেবারেই পছন্দ করতেন না। উনি চাইতেন সব বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা। হয়তো এরকম আলোচনা জ'মে উঠছে, এমনসময় সামান্য একটা কথার সূত্র ধ'রে অপূর্ববাবু হেসে উঠলেন হো-হো ক'রে। এরকম মাঝে-মাঝেই ঘটত, আর তখন মল্লিকদার গম্ভীর মুখ হ'ত আরো গম্ভীর। কিন্তু সুধীন বা সুরাওয়ার্দি এবং কখনো-কখনো সুশোভনও মল্লিকদাকে ছেড়ে কথা কইত না। সুধীনের অভ্যেস ছিল কথার ত্রুটি নিয়ে প্যাঁচ কষা। আমি মল্লিকদার বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে তিনি মাঝে-মাঝে বলতেন, "দেখ, আমি বারো বছর অক্সফোর্ড-এ কাটিয়েছি আর অনেক জ্ঞানীগুণী লোকের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু এখানকার মতো তর্ক ওরা করে না, বরঞ্চ ওরা প্রতিপক্ষকে অনেকসময় তথ্য এবং কথাও জুগিয়ে দেয়।" মল্লিকদা ছিলেন দর্শনের ছাত্র, বাংলা ভাষা বা সাহিত্যে ওঁর দখল বিশেষ ছিল না। দর্শন সম্বন্ধেও ওঁর সব মতামত ছিল অদ্ভুত। তবে রাধাকৃষ্ণণ বা কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই দর্শনের সূত্রেই মল্লিকদার বেশ ভাব জমেছিল। মাত্র ছ'বছর তো যোগ ছিল পরিচয়-এর সঙ্গে মল্লিকদার, কিন্তু এই ছ'বছরেই তিনি আমার এবং অন্য কারো-কারো জীবনে বেশ-একটা গাঢ় ছাপ রেখে গেছেন। ১৯৩৭ সালে আমরা ওঁকে জাহাজে তুলে দিলাম খিদিরপুর ডক-এ গিয়ে; ওঁর সঙ্গে এই শেষ দেখা। শেষজীবনে উনি আবার অক্সফোর্ডবাসী হন এবং সেখানেই ওঁর শিষ্য-শিষ্যা দেখাশোনার ভার নেন। গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ও শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ অক্সফোর্ড-এ বেড়াতে গিয়ে মল্লিকদার কাছে পরম আদরযত্ন পেয়েছিলেন। মল্লিকদা অক্সফোর্ড-এ তাঁর দার্শনিক মত দিয়ে একাধিক বইও লেখেন। আমি

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সুপণ্ডিত কালিদাস ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছি যে মল্লিকদার দর্শনের বৈশিষ্ট্য – তা বেদান্ত-ভিত্তিক নয় এবং এই স্বকীয়তা নাকি অন্য কোন ভারতীয় দার্শনিকের মধ্যে দেখা যায় না।

মল্লিকদার প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে হীরেনবাবুর কথা। রাজনৈতিক বিষয়ে হীরেনবাবুর প্রবল মতামত তিনি প্রবলভাবেই প্রকাশ করতেন তাঁর বক্তৃতায়। কিন্তু কথায়বার্তায় হীরেনবাবু কোনদিনই খুব উগ্র নন। মল্লিকদার মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে বিশেষ আসক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল না – কমিউনিজম্‌কে উনি একটি বিজাতীয় ব্যাপার ব'লেই মনে করতেন, কিন্তু খুব বেশি না-জেনে। মনে পড়ছে একদিন উনি হীরেনবাবুকে চেপে ধরলেন মার্কস্‌বাদ কী বুঝিয়ে দেবার জন্যে। হীরেনবাবু বলতে শুরু করলেন: ক্লাস বলতে কী বোঝায় তারই ব্যাখ্যা দিয়ে। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেন নি। আমার অভিজ্ঞতায় সাহিত্যিকদের আড্ডায় কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনাতেই বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। কেননা সাহিত্য এমনি সর্বগ্রাসী ব্যাপার যে পাঁচজন সাহিত্যিকের পক্ষে একজোট হয়ে এক বিষয়ে আলোচনা করা খুবই মুশকিলের কথা।

হীরেনবাবুর মতনই বাগ্মিতায় একদিন অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তুলসীচন্দ্র গোস্বামী – আগেকার যুগে। কিন্তু পরিচয়-এর আসরে যখন তাঁর কথাবার্তা শুনলাম, মনে হ'ল এইরকম সংযতবাক্ লোক বোধহয় আর দ্বিতীয়টি নেই। তুলসী গোঁসাই খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছিলেন। খ্যাতি তাঁর বাগ্মিতা ও দেশভক্তির জন্যে, আর অখ্যাতির কারণ হ'ল ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা যার উল্লেখ অপ্রীতিকর হবে। কিন্তু এ-কথা মুক্তকণ্ঠে বলব শুধু শিষ্টতায় নয়, মনের উদারতায় তুলসীবাবুর সমকক্ষ ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখেছি। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি: একদিন মল্লিকদার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে চা খাচ্ছি এমনসময় একটি প্রবীণ ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। কথায়বার্তায় বুঝলাম তিনি তুলসীবাবুরই সমগোত্র বড় এক জমিদার। তখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন আসন্ন। ভদ্রলোকটি তুলসীবাবুকে জানালেন যে, তিনি যদি জমিদারদের প্রতিনিধি হতে রাজি হন তা হলে তখনকার বাংলা দেশের জমিদার মহলের সাগ্রহ সমর্থন পাবেন। তুলসীবাবু অত্যন্ত নম্রভাবে বললেন যে, এইজাতীয় বিশেষ আসন গণতন্ত্র-বিরোধী, অতএব এই প্রস্তাবে তিনি রাজি হতে পারেন না। আসলে তুলসীবাবু ছিলেন যাকে ইংরেজিতে বলে লিবারল। তবে ট্রেইস্তিবাদের

দিকে তাঁর একটু ঝোঁক ছিল। বিধানসভার বক্তৃতায় যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন শাণিত বাক্যের তীরন্দাজ হিসেবে তাঁকে কিন্তু কখনো শুনি নি কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কটূক্তি তো দূরের কথা, সামান্য অশ্রদ্ধাসূচক কথা বলতে। তবে একদিন তাঁকে উত্তেজিত হতে দেখেছি। ১৯৩১ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের যখন অবসান হ'ল গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে, ঠিক তার পরবর্তী পরিচয়-এর অধিবেশনে তুলসীবাবু আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন গান্ধিজী কীভাবে এই চুক্তির দফায়-দফায় আরউইনের কাছে হার মেনেছেন ও ফলে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ হ'ল ব্রিটিশ কূটনীতির কৌশলে অহিংসা ও সত্যের পরাজয়।

অক্সফোর্ড সূত্রে আর দু'জনের কথা বলা দরকার: অবনী বাঁড়ুজ্যে ও হাম্‌ফ্রে হাউস। অবনীবাবু পেশায় ব্যারিস্টার হলেও ওঁর ঝোঁক ছিল সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি — বিশেষ ক'রে শিল্পের প্রতি। পরিচয়-এর অধিবেশনে তিনি প্রায়ই আসতেন এবং শিল্প-সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলে উৎসাহে যোগ দিতেন। অবনীবাবুর বাংলায় লেখার হাত বিশেষ ছিল না তবে তিনি তখনকার ইংরেজি 'ফরোয়ার্ড' কাগজের যে সাপ্তাহিক সংস্করণ বেরোত — তাতে মাঝে-মাঝে গল্প-প্রবন্ধ লিখতেন।

পরিচয়-এর অধিবেশনে কী বিষয় নিয়ে না আলোচনা হ'ত! তবে একটি শিল্পপ্রসঙ্গের কথা বিশেষ মনে পড়ে। তখন যামিনী রায়ের নামডাক প্রবল হয়ে উঠেছে। এইসময়ে সুধীন ও সাহেদ নন্দলালবাবুর সঙ্গে যামিনী রায়ের তুলনা ক'রে প্রায় জোর গলায় বলত যামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠতার কথা। তাঁদের একটি যুক্তি ছিল যে অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল বেশিরভাগ সময় ছবি এঁকেছেন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয় নিয়ে, কিন্তু যামিনীবাবুর ছবি হ'ল বিশুদ্ধ ছবি — সাহিত্যিক ছবি নয়। এঁদের প্রতিপক্ষ ছিল নীরেন, কিন্তু নন্দলালবাবুর সমর্থনে নয়; নীরেনের শিল্প-সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি ছিল সম্পূর্ণ মার্কসীয়। ভাবটা এই, ছবি হোক বা সাহিত্য হোক তার একটা সামাজিক উদ্দেশ্য থাকা দরকার এবং এই উদ্দেশ্য একটা বিশেষ বিষয় অবলম্বন ক'রেই ফুটে ওঠে। বিশুদ্ধ শিল্পকলা নিছক বিলাস, অতএব অশ্রদ্ধেয়। আমি এই তর্কে সাহস ক'রে যোগ দিয়ে এই কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে, জগতের অনেক বিখ্যাত শিল্পসৃষ্টি বাতিল হয়ে যায় যদি নীরেনের বা সুধীন-সাহেদের কথা পুরো মেনে নিতে হয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

সুরাওয়ার্দি এই তর্কে বেশ-একটু উত্তেজিত হয়ে চোখা-চোখা কথা শোনাচ্ছিলেন আর সুধীনের যখন তর্কের নেশা পেত, তখন তার সামনে দাঁড়ায় কে? নীরেনও খুব কম যেত না — কিন্তু এ-ক্ষেত্রে খুব সুবিধে করতে পারে নি।

সুধীনের মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান ও বিদগ্ধ ব্যক্তি নিশ্চয় বিরল কিন্তু ঐরকম মর্মঘাতী ব্যঙ্গ আমি খুব কম লোকের মুখেই শুনেছি। নীরেন রায় নিশ্চয় আমাদের বিদ্বৎসমাজের একটি রত্ন। কিন্তু তাকেও কেউ ঠাণ্ডা মেজাজের লোক বলবে না। মাঝে-মাঝে কড়া কথা শোনাবার লোভ যে সুশোভনের নেই তা বলব না। আর মল্লিকদা যেন বেত হাতে নিয়েই কথা বলতেন। কিন্তু তাঁর মুখে আলগা কথা কখনো বেরোত না। এইসব বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে মিশে আমি বুঝতে পারি টি. এস. এলিয়ট-এর *Confidential Clerk* নাটকের লেডি এলিজাবেথের উক্তির যাথার্থ্য:

well-bred people
Are sometimes far from intellectual
And what's less surprising — intellectual people
Are often ill-bred.

কিন্তু সুধীন দত্তের গালিগালাজের মধ্যেও এমন-একটা কেতা থাকত যে মনে হ'ত তা যেন অভিনয়দুরস্ত। মনে পড়ছে আমাকে প্রায় রসাতলে পাঠিয়ে সুধীন আবু সয়ীদ আইয়ুবের এক মন্তব্যের উত্তরে বললেন: "I am afraid Mr. Ayyub you have not understood a single word of what Sahéd has written about Art." আইয়ুবের মতন বিদ্বান ও সজ্জন বিরল। সুধীন তখন তাঁর কাছ থেকে দর্শনের পাঠ নিত। গুরুমারা বিদ্যে হয়তো সে অর্জন করে নি কিন্তু বিদ্যা অর্জন না-ক'রেও তো গুরুকে মারা যায়!

পরিচয়-এর সভায় ইংরেজ যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে হাম্‌ফ্রে হাউসের নাম আগেই করেছি — ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গোছের মানুষ। শিক্ষিত ইংরেজ সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এ দেশে যাঁরা এসেছেন হাম্‌ফ্রে হাউস তাঁদেরই অন্যতম। আর-একজন ইংরেজ মাঝে-মাঝে আসতেন তাঁর নাম ম্যালকম্‌ ম্যাগারিজ। ইনি এদেশে আসেন *Statesman*-এর সহকারী সম্পাদক হয়ে। কিন্তু বেশিদিন এ-দেশের জলবায়ু সহ্য হয় নি। অল্পদিন পরে দেশে ফিরে গিয়ে সাংবাদিক জগতের বড়-বড় ধাপ এক-এক লাফে পেরিয়ে বিখ্যাত *Punch* পত্রিকার সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত হন। ম্যাগারিজের কলম যে কীরকম ধারালো

তার নমুনা ইংলণ্ডের রাজপরিবার ও রাজভক্ত প্রজারা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু পরিচয়-এর আসরে ম্যাগারিজের একটিমাত্র কথা আমার মনে পড়ে। প্রসঙ্গ ছিল ভালোবাসা। সুধীনের বিস্তৃত সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ম্যাগারিজ বললেন: "It is much better to fall in love than to talk about it." বোধহয় সেইদিনই পুরুষ ও নারীর দেহসৌষ্ঠব প্রসঙ্গে সুধীন বলেছিল: "The male form is much more beautiful than the female; women are lump."

ম্যাগারিজ ছিলেন কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রিধারী। কেম্‌ব্রিজের ছাপ-মারা আরো দু'জন সভ্য ছিলেন পরিচয়-সঙ্ঘের। একজন সার আবদার রহিমের ছেলে মজিদ রহিম, আই. সি. এস., আর-একজন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, যাঁকে ছেলেবেলা থেকে সুরেনকাকা ব'লে ডেকে এসেছি। বলতে ভুলে গিয়েছি যে, ইনিই হলেন আমাদের মধ্যে চারুবাবু বাদে বয়সে জ্যেষ্ঠতম। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ-পদ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে ইনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পরিচয়-এর সভায় যোগ দেন বোধহয় আমারই সঙ্গে এসে। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদে এঁর নিপুণ ক্ষমতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ ছিল বহুকাল থেকে; রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে সেকালের শান্তি-নিকেতনে গিয়ে তিনি কিছুদিন পদার্থবিদ্যা শিখিয়েছিলেন ছাত্রদের।

রহিম ছিলেন কাস্টমস্‌ বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তি। পদাধিকারে ইনি সুযোগ পেতেন এমন-সব অতি-গরম রাজনৈতিক বই পড়বার যা সরকারি পাহারা এড়িয়ে এদেশী পাঠকদের হাতে পৌঁছত না। এইসব নিষিদ্ধ বইয়ের খবর আমরা পেতাম স্বয়ং পাহারাদারের কাছ থেকে। রহিম ছিলেন যেমন সুদর্শন তেমনি সদালাপী। ভারত বিভাগের পর তিনি কোথায় যে তলিয়ে গেলেন কে জানে।

অক্সফোর্ড-এর দল সংখ্যায় ভারী হলেও পরিচয়-এর আসরে ফরাসি সংস্কৃতি প্রায়ই কেন্দ্রায়িত হয়ে উঠত। এর মহানায়ক বলা যায় সাহেদ সুরাওয়ার্দিকে। অক্সফোর্ড ত্যাগের পর ইনি বাসা বেঁধেছিলেন প্যারিস শহরে আর তাঁর মন ছিল সেখানেই প'ড়ে। ফরাসি পানীয়ের আস্বাদন গিরিজাবাবু পেয়েছিলেন একেবারে উৎসে গিয়ে। তা ছাড়া ছিলেন ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও পরিচয়-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি ছিলেন সংস্কৃত ও ফরাসি উভয় ভাষাতেই দক্ষ।

বটকৃষ্ণ ঘোষের কথা আজ আর কে মনে রেখেছে? ইনি বাল্যকাল থেকে বাড়িতে জার্মান ভাষা শিখে অতি অল্পবয়সে প্রায় পাকা পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর জার্মানিতে গিয়ে এই পাণ্ডিত্যে পালিশ লাগান। কিন্তু ফরাসি ভাষাতেও ওঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার ছিল; তাই ওঁর পক্ষপাত ছিল যে কোন্‌দিকে তা বলা কঠিন। পরিচয়-এ ওঁর কয়েকটি বৌদ্ধ দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী দু'জনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

প্রমথবাবুর কথা বলতে আবার মনে পড়ল যে, বয়সের হিসাব ধরলে ইনিই তো ছিলেন জ্যেষ্ঠতম, কিন্তু সুধীনের বাড়ি ইনি এসেছেন কদাচিৎ। তবে মাসে একবার প্রবোধবাবুর বাড়িতে যে অধিবেশন হ'ত—তিনি নিয়মিত আসতেন।

চারুবাবুর বাড়ি ও আমার বাড়িতেও মাঝে-মাঝে সভা বসত।

ফরাসি বনাম জার্মান ভাষা-সাহিত্যের প্রশ্নে প্রমথবাবু অবশ্য রায় দিতেন ফরাসি পক্ষে—আর প্রতি অধিবেশনেই তিনি কোন-একটি বিশিষ্ট ফরাসি ভাষাতত্ত্ববিদের উল্লেখ করতেন—এঁর কখনো ব্যতিক্রম হয় নি। সুধীন ফরাসি ও জার্মান উভয় ভাষাই আয়ত্ত করেছিল—এ-দেশে ব'সেই। কিন্তু প্রবোধবাবুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে যখন তর্কাতর্কি হ'ত, তার ঝোঁক পড়ল জার্মানদের দিকে। প্রবোধবাবুর লেখাপড়া ছাড়া আরো অনেক বিষয়ে আগ্রহ ছিল। আর মাঝে-মাঝে তিনি মজার-মজার কথা বলতেন, যেমন: নানাসাহেব নাকি তখনো জীবিত, দেরাদুনের উত্তরে যে অরণ্য অঞ্চল—সেখানে তাঁকে নাকি মাঝে-মাঝে দেখা গিয়েছে। আর ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি নাকি একটা উপকথা, তাকে নাকি গোপনে মুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ইয়োরোপে। প্রবোধবাবুর মতে রিলেটিভিটি-তত্ত্ব সম্বন্ধে নাকি প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত নাগার্জুন সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সুতরাং আইনস্টাইনকে এই তত্ত্বের জনক বলা সঙ্গত নয়। সত্যেনবাবু এ-সব কথা শুনলে একটু মৃদু হাস্য করতেন। তবে মাঝে-মাঝে তিনিও উৎসাহে যোগ দিতেন। বিখ্যাত Bose Statistics প্রকাশিত হবার পরে সত্যেনবাবু ফরাসি দেশে গিয়ে কিছুদিন গবেষণা করেছিলেন ও সেখানকার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের নানা গল্প রসিয়ে-রসিয়ে মাঝে-মাঝে বলতেন।

তর্কেবিতর্কে সুধীনকে হারানো মুশকিল ছিল, কেননা তার কথায় ধার ও ভার দুই-ই থাকত। অবশ্য সর্বসময়ে যুগপৎ নয়। তবে একটি তর্কে অন্তত প্রতিপক্ষের নিছক ভারে সে নিতান্ত অসহায়ভাবে পিষ্ট হয়েছিল। বিষয়টি

ছিল বিলিতি আসবাবপত্র। অতএব স্বভাবতই উঠল বিখ্যাত চিপেন্‌ডেল্‌-এর নাম। সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন নির্মলচন্দ্র মৈত্র, ইতিহাসের কৃতী ছাত্র, কিন্তু বিচিত্র বিদ্যায় পারঙ্গম, প্রায় নীরদচন্দ্র চৌধুরীর দোসর। নির্মল মন্তব্য করল যে, চিপেন্‌ডেল্‌-এর মূলে রয়েছে চৈনিক প্রভাব। সুধীন কথাটা উড়িয়ে দিল স্বভাবসুলভ তীব্র ব্যঙ্গ ক'রে। এর পরদিনের অধিবেশনে নির্মল এল গোটাকয়েক রোগা-মোটা বই নিয়ে। এমন-সব বাঘা লেখকদের লেখা যে তাদের কথা উড়িয়ে দেওয়া সুধীনের পক্ষে অসম্ভব। এদের সকলেরই সাক্ষ্য নির্মলের পক্ষে। সুতরাং সুধীন হ'ল নির্বাক্‌।

আমার এক-একসময় দুঃখ হয়, যদি ডায়রি রাখতাম তাহলে শুধু পরিচয়-এর নয়, আরো বহু বিষয়ের ইতিহাস থাকত আমার কবলে। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন নিয়মিত ডায়রি রাখতেন, তাঁর নাম শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ। শ্যামলবাবুকে পরিচয়-এর দলে ভর্তি করেন নীরেন, যে ছিল আমাদের দলের পাকা ছেলে-ধরা। শুধু ছেলে-ধরা নয়, তাদের মানুষ করার দিকেও তার নজর কম ছিল না। পরিচয় কাগজে আমার হাতে-খড়ি নীরেনের খোঁচাতেই। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে শ্যামলবাবুকে দিয়েও নীরেন বাংলা লেখাতে শুরু করল। ছেলেবেলা থেকে আফ্রিকাতে মানুষ হয়েছিলেন ব'লে ইনি বাংলা লেখায় অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু গল্প করবার শক্তি এঁর অদ্ভুত, আর এমন-সব আজব গল্প যা শুনলে তাজ্জব বনতে হয়। যেমন আফ্রিকার মানুষখেকো কুমিররা নাকি গাছে উঠে লুকিয়ে থাকে রাতে আর ভোরবেলায় যে-সব মানুষ গাছতলা দিয়ে যায় তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়ে টেনে নিয়ে যায় হ্রদ বা নদীর জলে। আর আফ্রিকার গরিলাদের দেখে সিংহেরা ভয়ে এমন কাবু হয়ে পড়ে যে গোদা গরিলারা নাকি কান ধ'রে তাদের যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারে। আমার এ-সব কথা মনে পড়ে আবছামতো। সুতরাং যাথাযথ্য সম্পর্কে হলফ ক'রে কিছু বলতে পারি না। তবে শ্যামলবাবু যে ডায়রি রাখতেন তা একেবারে দিনগত পাপক্ষয়। সুতরাং তাতে ভুলচুক হবার সম্ভাবনা খুব কম। তবে উনি অনেক গোপন মন্তব্য লিখে রাখতেন এই ডায়রিতে এবং নিজস্ত্রী বা পরস্ত্রী কারো সম্বন্ধেই রাখ্‌-ঢাক্‌ ক'রে কিছু লিখতেন না। আমার প্রতি বিশেষ সদয় হয়ে এই ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালের কয়েকটি দিনের ডায়রির কয়েকটি পাতা আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন আমি যখন পরিচয় কাগজেই 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর' লিখতে আরম্ভ করি তখন, কিন্তু এই অঙ্গীকারে যে শ্যামলবাবুর গোপন কথা আমি

প্রকাশ করব না, শুধু আমার স্মরণশক্তি একটু শানিয়ে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু গোপন কথার ভার একা বহন করা আমার দুর্বিষহ বোধ হওয়াতে আমি পরিচয়-এর পাঠকদের সহযোগিতা না-চেয়ে পারি নি। যেমন আজকে চাচ্ছি দেশ পত্রের পাঠকদের সহযোগিতা। আশা করি তাঁরা আমার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে এ-সব কথা কোথাও ফাঁস করবেন না।

[শ্যামল ঘোষের ডায়রির জন্য দেখুন : বর্তমান গ্রন্থের ১২২–৩৪ পৃষ্ঠা]

শ্যামল ঘোষের ডায়রি থেকে এইজাতীয় বিবরণ আরো অনেক সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু এই ডায়রি এখন আমার নাগালের বাইরে। অপূর্ব চন্দ বলতেন, সুধীনের চুম্বকের মতো ক্ষমতা আছে সাহেবদের আকর্ষণ করার। শ্যামলবাবুর ক্ষমতা আরো আশ্চর্য। চুম্বকের মতো আকর্ষণের শক্তি তাঁরও আছে—কিন্তু তাঁর আকর্ষণে ধরা দেয় জগতের যত ডাকিনী-যোগিনী। এক-একসময় তিনি যখন গল্প বলতে শুরু করেন মনে হয় আদিম আফ্রিকার অতলস্পর্শ অন্ধকার থেকে উঠে এসে এইসব অলৌকিক জীবেরা ভিড় করেছে তাঁর চারপাশে। সে-সব গল্প শ্যামলবাবুই হয়তো একদিন লিখবেন, কিন্তু পরিচয়-এর আড্ডার এক অতি স্মরণীয় অধিবেশনের কথা শ্যামলবাবুর ডায়রি থেকে আমি উদ্ধার করতে পারি নি ব'লে যেটুকু নিজের মনে আছে তাই বলছি।

১৯৩৯ সালের জুন মাস। আমাদের আড্ডা বসেছিল সুধীনের হাতিবাগানের বাড়ির বিরাট বৈঠকখানা ঘরে। সেদিন সভা জমিয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু। সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা শুনে হাজার-হাজার লোক মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু ছোটখাটো আসর তিনি যেভাবে জমাতেন তা আরো উপাদেয়। একটার পর একটা মজার গল্প ক'রে তিনি ঘর-ভরা লোককে মজিয়ে দিতে পারতেন। সেদিনকার গল্প দু'একটা বলি।

হায়দ্রাবাদের নিজামের পুত্রবধূ যাঁর সরকারী খেতাব ছিল প্রিনসেস্‌ অব বেরার—ছিলেন নাকি অপরূপ সুন্দরী। একদা তিনি যান রবীন্দ্র-দর্শনে এবং রবীন্দ্রনাথ যে গদি-আঁটা চেয়ারে বসেছিলেন তারই পায়ের কাছে গালিচার ওপর ব'সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকেন কবির মুখের দিকে। কবি নির্বাক্‌। খানিকক্ষণ পরে সম্মোহিত রাজকুমারী কবিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "পোয়েট, ইউ আর বিউটিফুল।" কবি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "প্রিনসেস্‌, ইউ আর অল্‌সো বিউটিফুল।"

আর-এক দিনের কথা। সুভাষ নির্বাচিত হলেন দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি। গান্ধিজীর আপত্তি সত্ত্বেও। এরপর শুরু হ'ল সুভাষকে সরানোর চক্রান্ত যার সফল পরিণতি দেখা দিল কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে। সরোজিনী নাইডু ও বিধান রায়ও যে ছিলেন ঐ-চক্রান্তের মধ্যে তা কে না-জানে। বেশ উল্লাসের সঙ্গে তিনি বললেন, অধিবেশনের পর যখন তাঁরা বেরোচ্ছেন একে-একে, তখন ক্ষিপ্ত বাঙালি জনতার মধ্যে একজন তাঁকে দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল 'হারামজাদী' ব'লে। এত বড় খেতাব তাঁর কপালে আর-কোনদিন জোটে নি ব'লেই বোধ-হয় তাঁর অত উল্লাস। কিন্তু সেদিনকার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পালা শেষ হতে আরো একটু বাকি ছিল। বিধান রায়ের বাড়ির সামনে যে প্রকাণ্ড ঘড়িটা এখন দেখা যায় তিন তলায়, সেটা তখন ছিল একতলার সদর দরজার মাথায়। খানিকক্ষণ পরেই তা চুরমার হ'ল জনতার লোষ্ট্রাঘাতে। কিন্তু মজা এই—সরোজিনী নাইডু বেশ রসিয়ে-রসিয়ে বললেন—এই ঘটনার অল্পক্ষণ আগেই নাকি বিধানবাবুকে বাংলা কংগ্রেসের একজন নেতা টেলিফোনে দুঃখ ক'রে বলেন যে তাঁর বাড়ির ঘড়িটা নাকি রাস্তার লোকেরা ভেঙে দিয়েছে। বিধানবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন, না সেরকম কিছু হয় নি তো! এর প্রায় মাসখানেক পরে সরোজিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভুল ক'রে যাকে হারীন্দ্র বলা হয়) পরিচয়-এর আড্ডায় এসেছিলেন আমার সঙ্গে এবং আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন গান গেয়ে ও কবিতা আবৃত্তি ক'রে।

পরিচয়-এর আড্ডার কথা টেনে আনা গেল ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এরপর বাজল যুদ্ধের দামামা। সারা জগৎ জুড়ে শুরু হ'ল যে-তোলপাড় তাতে সেই পুরনো দিনের পরিচয় অটল থাকতে পারে নি। যুদ্ধের মাঝামাঝি পরিচয়-এর পরিবর্তন হ'ল প্রায় আমূল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে 'পরিচয়'-এর আড্ডা চলেছিল অব্যাহত। এই আড্ডায় যোগ দিতেন অনেক ইংরেজ ও আমেরিকান যাঁরা এদেশে এসেছিলেন বিদেশী সেনাবাহিনীর সঙ্গে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমেরিকার বিখ্যাত বামপন্থী লেখক হাওয়ার্ড ফাস্ট।—শ্যামলবাবুর ডায়রি হাতড়ালে এঁদের বিবরণ কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে।

সুকুমার রায়

সুকুমার রায়, যাঁকে তাতাদা ব'লেই আমরা বরাবর জেনে এসেছি, তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবে হ'ল তা বলা খুবই কঠিন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরিবারের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই ছিল ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের পরিচিত, তাদের মধ্যে চোখের সামনে জলজল করতেন তাতাদা।

প্রথমেই বলি উপেন্দ্রকিশোরের কথা। আমরা যখন শিশু তখনই তাঁর কথা শুনতাম। এগারোই মাঘের সকালের অনুষ্ঠানে, তিনি যতদিন সুস্থ ছিলেন, বেহালা বাজাতেন। হয়তো শাস্ত্রীমশায় বেদীতে বসেছেন, উপেন্দ্র-কিশোর বেহালা বাজাচ্ছেন; আর যেটি বিশেষ ক'রে মনে পড়ে তাঁর একটি গান 'জাগো পুরবাসী'—ওর আর জুড়ি হ'ল না—সে-গানটি এখনো গাওয়া হয় এগারোই মাঘের উৎসবের সূচনায়।

তাতাদা অবশ্য তখন যুবক যখন প্রথম আমার চোখে পড়লেন, উনি আর ওঁর ছোটো ভাই সুবিনয় রায়, যাঁর ডাক নাম ছিল মণি। তারপর ইস্কুলে ভাব হ'ল ওঁদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে—ডাক নাম নান্কু ও পান্কু, একজন নিজের ও আর-একটি খুড়তুতো। তাদের কাছে বাড়ির গল্প খুব শুনতাম। বাড়ির গল্প মানে বেশিরভাগই তাতাদার গল্প।

ইতিমধ্যে ১৯১৫ সাল আন্দাজ অন্য একটি সূত্রে সুকুমার রায়ের সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠতা হ'ল। কালিদাস নাগ তখন আমার অন্যতম অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আমাদের একটা সমিতি করবার কথা হচ্ছে, যদিও তুমি খুব ছেলেমানুষ তবু তোমাকে সমিতির সভ্য করা হবে। সোমবার-সোমবার সভা হবে। তোমার বাড়ির কাছেই।' যদিও প্রথমে সমিতির কোন নাম দেওয়া হয় নি কিন্তু সোমবার মিটিং হ'ত ব'লে নাম দাঁড়িয়ে গেল 'মান্ডে ক্লাব'। আমি তখন ঝামাপুকুরের গলিতে থাকতাম। কাছেই বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটে সতীশ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বাড়িতে শান্তিনিকেতন ছেড়ে এসে অজিত চক্রবর্তী মশাই রয়েছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন ঐ-

সমিতির বোধহয় দুই প্রবীণতম সদস্য। সতীশ চট্টোপাধ্যায় তখনকার খ্যাতনামা অধ্যাপক। বরিশালের লোক, অশ্বিনীবাবুর কাছে তাঁর দীক্ষা, আবার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। তাঁর পুত্র হরিপদ চট্টোপাধ্যায় একসময়ে নাম করেছেন রবীন্দ্র-সংগীতের গায়ক ব'লে। অবশ্য তখন সে খুবই ছোটো।

ঐ-বাড়িতে পত্তন হ'ল মান্‌ডে ক্লাবের। শিশিরকুমার দত্ত ওরফে খোদন-বাবু হলেন সম্পাদক। চার আনা ক'রে মাসে চাঁদা। গুটিকয়েক লোক নিয়ে আরম্ভ, পরে সদস্যসংখ্যা অনেক বেড়েছিল। সূত্রপাত ওখানে হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাতাদার গড়পাড়ের বাড়িতে হ'ল অধিবেশন, খোদনদার বাড়িতেও হ'ল, তারপর ঘুরে-ঘুরে হতে লাগল এক-একজন সভ্যের বাড়িতে। এইসূত্রে তাতাদাকে আরো বেশি ক'রে জানলাম। যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। আগেই বলেছি তিনি আমাদের চোখের সামনে জলজল করতেন। তিনি দাঁড়াতেন যেখানে আমরা সব তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতাম। ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা প্রবীণ সদস্য ছিলেন—কৃষ্ণকুমার মিত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাশ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি—এঁদের প্রত্যেকেরই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। এঁরা সমাজের কাজেকর্মে, উৎসবের সময়ে যখন দাঁড়াতেন এসে, তাঁদের ঘিরে ছোটখাটো ভিড় জমত। তেমনই যুবকদলে ছিলেন সুকুমার রায়। তিনি যেখানেই দাঁড়াতেন যেন চুম্বকের আকর্ষণের মতো লোক টেনে আনতেন। নানা বিষয়ে নানারকম কথাবার্তা হ'ত। সবসময়ে যে মজার কথা বলতেন তা নয়; কোথাও কোন অন্যায়ের রেশ দেখলেই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। অন্যায় সহ্য করা তাঁর ধাতে ছিল না।

দেখতে-না-দেখতে তাতাদা মান্‌ডে ক্লাবে জাঁকিয়ে বসলেন। মান্‌ডে ক্লাবে শুধু আড্ডা নয়, ক্লাবে আমাদের ঠিক হয়েছিল প্রত্যেকদিন কোন-না-কোন বিষয়ে একজন সভ্য হয় পড়বেন কিংবা কিছু বলবেন। সে-সবের তালিকাও ছাপা হয়েছে। তবে সেইসময়ে বা কিছু পরে অজিত চক্রবর্তী মশায়ের রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত যে-সব লেখা পরে বই হয়ে বেরিয়েছে—সে-সব লেখা একটির পর একটি সভায় পড়েছেন।

এইসময়ে 'বিচিত্রা'র অধিবেশন হ'ত রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে। তার আগে সেখানে হ'ত 'বৈঠক' আর মেয়েদের জন্যে ছিল 'আলাপিনী'; রবীন্দ্রনাথ এ-দুটি সমিতি করেছিলেন। পরে 'আলাপিনী' আর 'বৈঠক' মিলে 'বিচিত্রা' হ'ল।

'বিচিত্রা'র সেই অধিবেশনটি হয়েছিল আবার সোমবারে। সেদিন খোদনবাবুর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে ছিল মান্‌ডে ক্লাবের সভা। অজিতবাবুর সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম 'বিচিত্রা'য়। প্রবন্ধটি পাঠ ক'রেই রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম ক'রে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ না-দিয়ে আমরা জোর পায়ে হেঁটে চলে এলাম মান্‌ডে ক্লাবে। এসে আমরা ঢুকতেই হৈ-হৈ কাণ্ড। সকলেই, বিশেষ ক'রে তাতাদা আর দ্বিজেনকাকা বললেন, 'কোথায় তোমরা গিয়ে-ছিলে? আমাদেরও তো যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই মান্‌ডে ক্লাব আগে, না, বিচিত্রা আগে? দেখ, তোমরা ঐ জমিদার বাড়িতে গিয়ে যা খেয়েছ—আমরা এই পাশের দোকানের গরম-গরম কচুরি আর আলুর দম খেয়েছি, তার থেকে কি বিশেষ ভালো হবে?' শেষে কালিদাস নাগ বললেন, 'শাস্তি দিয়ে কাজ নেই—একটা ভোট অব সেন্‌সর দিয়ে ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক।'

বলেছি তাতাদা সবসময়ে জমিয়ে রাখতেন। অনেক লেখাই তিনি মান্‌ডে ক্লাবে পড়েছেন। ওঁর মতামত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর বলবার ভঙ্গিতে একটা নিজস্বতা থাকত। এখনকার দৃষ্টিতে তাকে খুব প্রগতিশীল বলব না, তবে তখনকার পরিবেশে বোঝা যায় খুব লিবারল আদর্শ দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ।

আর-একটা বলবার কথা এই যে, সুকুমার রায় এখন খ্যাতি লাভ করেছেন আশ্চর্য সব ছড়ার রচয়িতা হিসেবে। কিন্তু ওঁর মনটা যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক, কেননা একটা বিজ্ঞান-শিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন। এবং বিলেতে গিয়ে যে-বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন সেটা আমাদের বুঝিয়েছিলেন। হাফটোন ব্লকের উন্নত কৌশল শেখবার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন, তখন একটা বিশেষ প্রণালী তার নাম বোধ হয় ফোটো ক্রেসিস—সেটা ছিল তাঁরই উদ্‌ভাবিত।

সেই কারণে সুকুমার রায় যে-বিষয়েই লিখুন, শিল্পকলা হোক সাহিত্য হোক—তার মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক মনের দীপ্তি পাওয়া যায়। অথচ সেই সঙ্গে সাহিত্যরস। একেবারে জাত সাহিত্য যাকে বলে। এই দুটো জিনিসের সংমিশ্রণ দেখেছি তাঁর লেখায়। মান্‌ডে ক্লাবে তাঁর যে-সব প্রবন্ধ পড়া হ'ত সেগুলি ছিল সাধুভাষায় লেখা। তখন পর্যন্ত তারই চল ছিল।

একদিন 'আর্ট'-সংক্রান্ত একটি কথা তাতাদা বলেছিলেন, সেটা অনেকদিন মনে দাগ কেটে রেখেছিল। বলেছিলেন যে, চিত্রকর আঁকছে নিসর্গ দৃশ্য, আমরা মনে করি সে প্রকৃতিকে অনুসরণ করছে। এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন রাস্কিনের কথা। রাস্কিন একদিন কনস্টেবলের ছবি আঁকা দেখছেন পেছনে

দাঁড়িয়ে। তিনি আঁকছেন ঘরবাড়ি গাছপালা—কিন্তু এগুলো নিয়ে ওরকম মোচড় দিচ্ছেন কেন? একটা গাছ ওখানে ছিল সে একটু পিছিয়ে গেল, রাস্তাটা স'রে গেল আর-একটু ডান থেকে বাঁ দিকে। যে-লোক দেখবে সে দেখবে তার চেনা জায়গারই ছবি; কিন্তু একটু নজর করলে বুঝবে যে সেই চেনা জায়গাগুলোই ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নড়িয়ে দিয়েছেন। সে ভাববে, বাঃ, এ-আর্টিস্ট তো বেশ মজা করেছেন! ঘরের আসবাবপত্র সেরকমই থাকল কিন্তু সামান্য ডান দিকে বাঁ দিকে সরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটাকে একটু অন্য-রকম ক'রে সাজানো। তাই বললেন যে, এই যে মনে করা যাচ্ছে যে, আর্টিস্ট প্রকৃতির হুবহু নকল করছে, ঠিক তারা তা করে না।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যে 'বৈঠক' ছিল, সেখানে তাতাদা আর্ট সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলেন। সে-প্রবন্ধটা পাওয়া গেছে কিনা জানি না—কিন্তু সেখানে ঐ-প্রবন্ধটার ওপর কিছু আলোচনাও হয়েছিল।

মান্‌ডে ক্লাবে যে-সব প্রবন্ধ তাতাদা পড়েছিলেন তার মধ্যে যেটি আমাদের মাৎ ক'রে দিয়েছিল সেটি হচ্ছে বীরবলকে ব্যঙ্গ ক'রে লেখা: 'ক্যাবলের পত্র'। এটি পড়া হয়েছিল আমাদের সভ্য জীবনময় রায়ের বাড়িতে। জীবনময় রায় ছিলেন প্রশান্তচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাতাদার থেকে অল্প একটু ছোটো; ছেলে-বুড়ো সকলের সমান প্রিয়। একসময়ে তাঁর মুখে যে-রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনেছি এখনো তা মনে রয়েছে। তেমন গান আর কারো মুখে শুনি নি। ব্রাহ্মসমাজের পাশেই তাঁর বাড়িতে 'ক্যাবলের পত্র' পড়া হ'ল। বীরবলের ভাষা কীভাবে তাতাদা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন ভাবলে বিস্ময় হয়।

তা এই প্রবন্ধটিতে ঐ বীরবলের লেখার মধ্যে যে-সব চালাকি থাকত, তার সম্বন্ধে একটা উক্তি শুধু মনে পড়ে। বীরবল খুব ফরাসি সাহিত্য দর্শন পড়েছিলেন, তাঁর লেখায় সে-সবের যথেষ্ট উল্লেখ থাকত। কথায়-কথায় বের্গসঁ, আরো দু'চারজনের কথাও থাকত। ঐ ক্যাবলের পত্রে ক্যাবল লিখছেন—শুনেছি বিখ্যাত দার্শনিক বের্গসঁ বলেছেন যে, মানুষ আর যাতেই বাঁচুক, মাথা কেটে ফেললে আর বাঁচে না। এইধরনের কথার অনেক ছড়াছড়ি ছিল। এই প্রবন্ধটি প্রবাসী-তে বেরিয়েছিল, তারপর লোকে ভুলে গিয়েছিল। পরে আমার কথায় সজনীকান্ত দাস খুঁজে-খুঁজে সেটি প্রবাসী থেকে উদ্ধার ক'রে আবার শনিবারের চিঠি-তে ছাপেন। সকলে সেদিন এই প্রবন্ধটি শুনে এমন মাৎ হয়ে গেলেন যে, আর আলোচনার অবকাশ ছিল না।

প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সেদিন কেউ কিছু বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন নি কেন, সে-কথা বলতে গিয়ে যেটি বলতে হবে তা খুব প্রীতিকর নয়। প্রীতিকর নয়, তবে জানবার মতো। আমাদের দেশে গোষ্ঠীগত যে-দ্বন্দ্ব বরাবর রয়েছে তার প্রকাশ এখানেও। রবীন্দ্র-গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি দল ছিল। একটি সবুজপত্র বা প্রমথ চৌধুরীর গোষ্ঠী। মান্‌ডে ক্লাব যে-সময়ে শুরু হয় সে-সময়েই সবুজ-পত্র-এরও সূচনা। সবুজ-গোষ্ঠীর সঙ্গে এই মান্‌ডে ক্লাবের যাঁরা রবীন্দ্র-নিষ্ঠ ছিলেন, অনেকেই ছিলেন যেমন তাতাদা প্রশান্ত মহলানবিশ অজিত চক্রবর্তী কালিদাস নাগ অমল হোম ইত্যাদি—এঁদের কোথায় যেন একটা বিরোধ ছিল। এখানে বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী ইন্দিরা দেবীর মতো সত্যিকারের সজ্জন খুব কম দেখেছি। প্রমথ চৌধুরীর লেখায় কারো সম্বন্ধে যদি খোঁচা থাকত সেটা তাঁর অন্তরের কথা নয়; কারো সম্বন্ধে তিনি কখনোই শত্রুতার ভাব পোষণ করতেন না। তাই বিরোধটা কিসের বলতে পারব না। মনে হয় একান্ত ব্যক্তিগত; এঁরা যে পছন্দ করতেন না প্রমথ চৌধুরীকে তার কারণ বোধহয় বীরবলের ভঙ্গিদোষ—একটু অতিরিক্ত চোখা-চোখা কথা, খুব বলবার কিছু না-থাকলেও।

মান্‌ডে ক্লাবের মিটিঙের নোটিস বেশিরভাগই ছাপা হ'ত তাতাদাদের অর্থাৎ ইউ. রায় অ্যাণ্ড সন্‌স্‌-এর বিখ্যাত ছাপাখানায়। এই সুযোগে তাতাদা এইসব নোটিসে তাঁর মন্তব্য জুড়ে দিতেন; বেশিরভাগ সময়ে কবিতায়। যেমন মাঝখানে কাজেকর্মে খোদনবাবু বাইরে গিয়েছিলেন—ফিরে এসেই সভার নোটিস হাতে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বললেন তোমার এতদিনের চাঁদা বাকি, আর অমুক দিন অধিবেশন। সেই নিমন্ত্রণপত্রে তাতাদা লিখলেন:

'শুনেছিনু নেই নেই
শুনেছিনু গিয়েছে সে—
দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায়
শনিবার তেইশে।'

খোদনবাবুর দাড়ি ছিল।

প্রত্যেকবারই খাওয়াদাওয়া হ'ত। তবে প্রশান্তচন্দ্র একদিন ডেকে বললেন, 'খাওয়াদাওয়া হলে আর কোন আলোচনা হয় না। তোমরা খাওয়াদাওয়া ক'রে এত সময় নষ্ট কর কেন? আমি তোমাদের শুধু চা দেব আর শস্তার বিস্কুট।' তাঁর বাড়িতে সেদিন সভা। তখন ক্ষুদে-ক্ষুদে জেম বিস্কুট পাওয়া

যেত—সেগুলো পোষা কুকুর-বেড়ালকেই খেতে দেওয়া হ'ত। সকলে হাঁউমাউ ক'রে উঠল। তখন তাতাদা দেখলেন হাঁউমাউ ক'রে কিছু হবে না, প্রশান্ত শুনবে না। আমাকে ডেকে কানে-কানে বললেন, 'যাও তো, ভিতরে গিয়ে প্রশান্তর বোনকে বলো যে, এরকম একদল লোককে প্রশান্ত চা খেতে নেমন্তন্ন করেছে কিন্তু কিছু খাবার জোগাড় করে নি। তুমি শুধু এইটুকু ব'লে এসো।' মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে অনেকরকম খাবার চ'লে এল। তাই দেখে প্রশান্তচন্দ্র বললেন, 'একি! এ-সব কে আনল?' তাতাদা উত্তর দিলেন, 'তোমার তাতে দরকার কি? খাবার এসেছে, এখন আমরা খাব।'

মাঝে-মাঝে হঠাৎ আমাদের গানের প্রবল বেগ আসত। সেদিন আলোচনা-টনা রেখে শুধু গান হ'ত। আর যে-গানটা আমাদের প্রায় জাতীয় সঙ্গীত হয়ে দাঁড়াল, সেটা হচ্ছে 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল'। এই গানের দলে সবচেয়ে ভালো ও জোরালো গলা ছিল ছোটকুদার অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্তের। তাই তাতাদা একদিন বললেন, 'দেখ, আমাদের আসলে এটা যাত্রার দল। ও-সব লেখাপড়ার কথা ছেড়ে দাও। এই যাত্রার দলের অধিকারী হলেন খোদন। অতএব, আমরা সকলে মিলে ওঁকে খেতাব দেব শ্রীশিশিরকুমার দত্তাধিকারী।' সেই থেকে এই নামেই পরিচিত হলেন তিনি। মাঝে-মাঝে খোদনবাবু গা-ঢাকা দিতেন, আগেই বলেছি; একবার বেশ কিছুদিন পাটনায় কাটিয়ে তিনি ফেরার পর তাতাদার ছড়া তৈরি হ'ল:

'ক্লাবটিরে মারি
হল অধিকারী
মাস তিন চারি
বিহার-বিহারী।
বিরহেতে তারি
ব্যথা পেয়ে ভারি
নিঃশ্বাস ছাড়ি
ভিজাইল দাড়ি
যত বুড়ো ধাড়ি
সভ্যের সারি।
ঘোর বাড়াবাড়ি!'

আমি ছেলেমানুষ ও ছাত্র ব'লে আমার বাড়িতে একবারই অধিবেশন

হয়েছিল। সেখানে ডালপুরি আর মাছের একটা নতুন তরকারি খেয়ে তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন। তাতাদা বললেন, আমি প্রস্তাব করছি—এর পরদিন ক্লাবের আলোচ্য বিষয় হবে কী করিয়া এইরকম ডালপুরি আর মাছের তরকারি তৈরি করিতে হয়। আমাকে বললেন, তুমি তোমার মার কাছ থেকে একটু লিখে আনবে।

খাওয়াদাওয়ার কথায় মনে পড়ল, মান্‌ডে ক্লাবের একটি নিমন্ত্রণপত্রে ছিল 'খাওয়া গুরুতর হইবার আশঙ্কা আছে'—সেটা ওঁদের গড়পাড়ের বাড়িতে অধিবেশনের কথা। ওঁদের বাড়ির রান্নার একটা বিশেষত্ব ছিল, বিশেষ ক'রে টুলুদি অর্থাৎ তাতাদার স্ত্রীর রান্না। বাঙাল দেশের লোক ছিলেন তিনি। অবশ্য বাঙাল দেশের এঁরাও ছিলেন, কিন্তু সেদেশের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। উপেন্দ্রকিশোর যদিও নিজেদের মধ্যে বাঙাল কথা বলতেন, তাঁর ভাইরাও বলতেন—কিন্তু তাতাদা বা নান্‌কুদার মুখে আমরা কখনো বাঙাল কথা শুনি নি। তাঁরা মৈমনসিং-এর পরিবেশ থেকে অনেক দূরে চ'লে এসেছিলেন। মান্‌ডে ক্লাব থেকে একবার স্টিমার পার্টিতে যাওয়া হয়েছিল রূপনারায়ণের ধারে, কোলাঘাটে। সেখানে একদিন থাকবারও কথা ছিল। যাওয়ার পথে খাওয়া হ'ল টুলুদির হাতের তৈরি মাংস আর লুচি—অপূর্ব তার স্বাদ। সেখানে একটা খালে আমরা নৌবিহার করতে গেলাম। জ্যোৎস্না-রাত ছিল, আর ছিল—একটির পর একটি গান, অতুলপ্রসাদের নিজের কণ্ঠে—অবশ্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতও বাদ যায় নি। অতুলপ্রসাদ তাঁর বিখ্যাত 'বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে' গানটি রচনার গল্প আমাদের সেদিন শুনিয়েছিলেন: লখ্‌নৌ থেকে গিয়েছিলেন তিনি মফঃস্বলে একটি মামলায়। ডাকবাংলায় রাতে ঘুম আসছিল না। তখন এই গানটি তিনি রচনা করেন।

মান্‌ডে ক্লাবের অধিবেশনে ধরা পড়ত, সুকুমার রায় আর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মধ্যে একটা আত্মিক যোগসূত্র; প্রশান্তচন্দ্র অনেকসময় যেন সুকুমার রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। অনেকসময় যখন কোন কথাবার্তা উঠত, প্রশান্তচন্দ্রকে ব্যঙ্গ ক'রে বা তিরস্কার ছলেই তাতাদা বলতেন 'আরে প্রশান্ত থামো থামো!' অনেকসময়ই প্রশান্তর কথাবার্তা কেউ বুঝে উঠতে পারতেন না, কিন্তু সেটা তাতাদা চট্‌ ক'রে ধরতে পারতেন। একটা ব্যাপার মনে পড়ে ভারি মজার। একবার চাঁদা বাড়ানোর প্রস্তাব হ'ল ক্লাবের; প্রশান্তচন্দ্র হঠাৎ বললেন, 'আমার এস্থেটিক অবজেকশন আছে।' শুনে তো

সবাই প্রায় চিংপটাং—সে আবার কি ? চাঁদা বাড়াতে এস্‌থেটিক অবজেকশন কী হতে পারে ? এবং এই নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক চলল। প্রশান্তচন্দ্র অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগলেন। তখন তাতাদা বললেন, 'দেখো, ও কী বলতে চাচ্ছে আমার মনে হয় আমি ধরতে পেরেছি। ওর বোধহয় বক্তব্য এই যে, এই প্রস্তাবে ওর সেন্স অব প্রপ্রাইটি আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্‌নেস্‌-এ আঘাত লাগছে। চাঁদা বাড়ানোটা, সোজাসোজি বললেই হয়, বাঞ্ছনীয় নয়—কিন্তু ও তো ওভাবে কথা বলে না। কী প্রশান্ত—তাই না ?' প্রশান্ত বললেন, "হ্যাঁ, খানিকটা তাই বটে।" প্রশান্তচন্দ্রেরও ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কিন্তু সুকুমার রায়ের মতো ছিল না। তাতাদার আকর্ষণী শক্তি ছিল অনেক বেশি।

মান্‌ডে ক্লাব কিছুদিন পরে উঠে গেল। সভা ক'রে ঠিক হয় নি, আপনা থেকেই যেন উঠে গেল। এইসময়ে অন্য একটি ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের ব্যক্তিত্ব যেন আরো বেশি ক'রে প্রকট হয়েছিল ও আমাদের আশ্চর্যভাবে স্পর্শ করেছিল। ওঁকে আরো বেশি ক'রে 'আরো বড় ক'রে' পেলাম। সেই ক্ষেত্রটি হ'ল ব্রাহ্মসমাজ।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মনে হ'ল ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-সাধন প্রয়োজন, তাকে আরো প্রগতিশীল করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব হ'ল এই যে ব্রাহ্মসমাজের সংশ্লিষ্ট ছাত্রসমাজ নামক প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদের জন্য আবেদনপত্রে সই করতে হ'লে মেনে নিতে হবে কতকগুলি কড়া নিষেধ, যেমন, মদ খাব না, সিগারেট খাব না, পাবলিক থিয়েটারে যাব না ইত্যাদি। যুবকের দল এই নেতিবাচক প্রতিজ্ঞাগুলি বর্জন করতে চাইলেন। এই সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য করবার প্রস্তাবও তাঁরা আনলেন। এই নিয়ে শুরু হ'ল তুমুল আন্দোলন। প্রতিবাদ উঠল কৃষ্ণকুমার মিত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাশ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং আরো বহু প্রবীণ ব্রাহ্মের তরফ থেকে। প্রশান্তচন্দ্র এই আন্দোলনের ছিলেন স্ট্র্যাটেজিস্ট কিন্তু সুকুমার রায় ছিল এর প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু এই তীব্র বিরোধের মধ্যেও প্রবীণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সমাজ-মন্দিরে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে তাতাদার আলোচনার কথা। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলো তো সুকুমার, জীবনের আদর্শ কি ? সুকুমার উত্তর দিয়েছিলেন,

সিরিয়াস ইন্টারেস্ট ইন লাইফ। উত্তরটা শুনে হেরম্বচন্দ্র এতই খুশি হলেন যে তখুনি সন্দেশ আনিয়ে সকলকে খাওয়ালেন।

মনে রাখতে হবে এই ঘটনার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে দুই দলের বিরোধ তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। তাতাদাই আমাদের উদ্দীপনা জোগাতেন এবং আমাদের শক্তির কেন্দ্রও ছিলেন। আবার মাঝে-মাঝে প্রবীণদের মুখে কোন অযথা অভিযোগ শুনলে তিনি অধৈর্য হয়ে উঠতেন। একবার তো রেগেমেগে মিটিং থেকে হন্‌হন্‌ ক'রে বেরিয়ে গেলেন। প্রশান্তচন্দ্রের অবশ্য মিটিং ত্যাগের ইচ্ছা ছিল না। তাতাদা বেরিয়ে যেতেই তাঁকেও খাতাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই হ'ল। এইসময় যুবসমাজ আলাদা উৎসব করল সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে। তখন কৃষ্ণকুমার মিত্র এসে প্রায় রোজই বোঝাতেন। তাতাদা তাঁকেই আমন্ত্রণ জানালেন, আমি আচার্য হয়ে উপাসনা করলে আপনারা আসবেন না ? কৃষ্ণকুমার বললেন, সুকুমার, তুমি যে আমাদের একজন আচার্য, তুমি বেদীতে বসলে আমরা তোমার কথা শুনব না তা কি হতে পারে ? প্রবীণ ব্রাহ্ম নেতা কৃষ্ণকুমারের এই উত্তর সেদিন উপস্থিত যুবকদের মর্ম স্পর্শ করেছিল। কিন্তু বিরোধ তখন মেটে নি ; যুবকদের স্বতন্ত্র উৎসব সাফল্যের সঙ্গে হয়েছিল। প্রবীণতম আচার্য আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাতে উপস্থিত ছিলেন। এরপর সভার পর সভা হ'ল। ব্রাহ্মসমাজে তৃতীয়বার ভাঙন ধরবার আশঙ্কা দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুবকদেরই জয় হ'ল। প্রবীণ দল মেনে নিলেন যুবকদের দাবি।

১৯১৫ সালে আমার প্রথম শান্তিনিকেতন যাত্রা 'ফাল্গুনী' অভিনয় দেখতে। দলে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, অমল হোম, সুকুমার রায় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সারাক্ষণ থাকতাম না আমরা—যখনই খুব একলা হয়ে পড়তাম তাতাদা আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। সেবারে তিনদিন কাটিয়ে ভোরবেলায় ট্রেন ধরবার জন্য তাতাদার পরামর্শে আমরা সকলে বিছানাপত্তর ঘাড়ে ক'রে তাঁর নেতৃত্বে দস্তুরমতো মার্চ করতে-করতে স্টেশনে এসেছিলাম মনে পড়ে।

আর-একদিকে তাতাদার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আসর-জমানোর। মান্‌ডে ক্লাবে যেদিন বিশেষ-কোন আলোচ্য বিষয় না-থাকত, তিনি নানারকম গল্প ব'লে আমাদের মাৎ ক'রে রাখতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ প্রচারকদের

নিয়ে অনেক মজার গল্প করতেন ; কিন্তু তাতে কোন বিদ্বেষ বা নিন্দার স্পর্শ থাকত না ; মজার-মজার গল্পই তিনি সাধারণভাবে করতেন।

ছোটো বড় সকলের সঙ্গে তিনি সহজে যোগাযোগ ক'রে ফেলতে পারতেন। সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা প্রবীণ, যাঁদের সঙ্গে তীব্র বিরোধ ছিল ওঁদের— যখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাতাদা, তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন। সুকুমারের প্রতি তাঁদের যে গভীর স্নেহ তা তাঁদের কথায় বারবার প্রকাশ পেত। সেটা শুধু উপেন্দ্রকিশোরের ছেলে ব'লে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিল এমন যা সকলকে আকর্ষণ করত। এই সুকুমারও যে তাঁদের বিরোধিতা করবে এই ছিল তাঁদের দুঃখ।

সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হবে এই আশা ছিল অনেকেরই। কিন্তু কালাজ্বরের কালো ছায়া আচ্ছন্ন করল তাতাদাকে। তখন এই রোগ ছিল দুরারোগ্য। যখন শীর্ণ হ'তে শীর্ণতর হয়ে তিনি প্রায় বিছানায় মিলিয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ এসে তাঁর পাশে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে তাঁকে শোনালেন গানের পর গান।

সুকুমার রায়ের নাম থাকবে তাঁর লেখার মধ্যে। সে-লেখাগুলি শুধু ছড়া নয়। ছোটো-ছোটো গদ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যেও পাওয়া যায় নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহের পরিচয়। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, আমার মতে আবোল-তাবোল-এর শেষ কবিতা। এটি তিনি লিখেছিলেন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে। তাঁর জীবনের এই হ'ল চরম মজা।

"আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে—
রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্,
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।"

এরপর :

"ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।"

এই আশ্চর্য কবিতাটি রচনার অল্পদিন পরেই তাতাদা ঘুমিয়ে পড়লেন চিরদিনের জন্যে।

অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদের গান 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' শুনেছিলাম শৈশবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সে-সময়ে বাংলা দেশে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকেছিল আর সমগ্র বাঙালি জাতি মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করেছিল যে বাঙালি এক, বাংলা দেশ এক। তারপর ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হয়েছে একাধিকবার ও দেখতে-দেখতে কেটে গেছে ছেষট্টি বছর। আজ অতুলপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে বাংলাভাষাভিত্তিক বাংলাদেশের বাস্তবতা সমগ্র পৃথিবীর কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বাঙালির রক্তের লিখনে। বাঙালি আজ উদাত্তস্বরে গান করছে অতুলপ্রসাদের গান 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।' বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে যে সংগ্রামের শুরু তারই পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ। ইতিহাসের এই নতুন অধ্যায়ের সূচনায় যাঁদের নাম স্মরণীয় অতুলপ্রসাদ সেন তাঁদের অন্যতম।

আমার পরম সৌভাগ্য এই যে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছে। একেবারে ছেলেবেলায় অতুলপ্রসাদের গানের মধ্যে শুনেছিলাম 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' যার কথা উপরেই লিখেছি, আর 'কাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা'। প্রথমটি স্বদেশীযুগে গাওয়া হ'ত প্রায় সর্বত্রই, আর দ্বিতীয়টি শুনেছিলাম রেকর্ডে, গেয়েছিলেন তখনকার বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ গুপ্ত। এই দুটির কথাই মনে পড়ে বিশেষ ক'রে।

সশরীরে অতুলপ্রসাদকে দেখেছিলাম কবে ও কোথায় তা ঠিক মনে পড়ে না —সম্ভবত মেয়ো হাসপাতালে দ্বিজেনকাকা অর্থাৎ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িতে। দ্বিজেনকাকার স্ত্রী লীলাকাকিমা ও অতুলপ্রসাদ ছিলেন মাসতুত ভাইবোন।

এরপর যখন একটু বড় হয়েছি কালিদাস নাগ, যিনি ছিলেন একাধারে আমার বন্ধু ও গুরু, একদিন আমাকে বললেন, 'আমরা একটা সাপ্তাহিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করেছি যাতে নানা বিষয়ের আলোচনা হবে। তুমিও এই অধিবেশনে আসতে পারো, ভালো লাগবে।' এ তো নিমন্ত্রণ নয়, গুরুর

আদেশ – অমান্য করার জো নেই। সোমবার-সোমবার অধিবেশন হ'ত ব'লে কিছুদিন পরেই নাম দাঁড়াল 'মান্‌ডে ক্লাব'। প্রবীণতম সভ্য ছিলেন অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠতম আমি। সভ্যের মধ্যে কালিদাসবাবু বাদে সুকুমার রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, জীবনময় রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অমল হোম এবং আরো কেউ-কেউ। সবচেয়ে উৎসাহী সভ্য ও সম্পাদক ছিলেন লীলাকাকিমার ভাই শিশিরকুমার দত্ত যিনি 'খোদন' ডাকনামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর 'ভাইদা' বা অতুলপ্রসাদকে তিনিই নিয়ে আসেন মান্‌ডে ক্লাবে। তখনো অতুলপ্রসাদ ছিলেন লখ্‌নৌবাসী।

কিছুকাল পরে অতুলপ্রসাদ কলকাতায় এসে প্র্যাক্‌টিস শুরু করলেন হাইকোর্টে ও বাসা বাঁধলেন ওয়েলেসলি ম্যানসনে এক ফ্ল্যাটে। মান্‌ডে ক্লাবে তখন তো তিনি নিয়মিতই যোগ দিতে পারতেন। ঐ-সময় মান্‌ডে ক্লাবের এক স্টীমার পার্টির আয়োজন হয়েছিল কলকাতা থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত। সকালে চ'ড়ে বিকেলে নামা; তারপর কোলাঘাটের সেচবিভাগের বাংলোয় রাত্রিযাপন। মেদিনীপুরের খাল এসে যেখানে রূপনারায়ণে পড়েছে বাংলোটি ঠিক সেই জায়গায়। স্টীমারে আসতে লুচি ও মাংস খেতে যেটুকু সময় লেগেছিল তা বাদে বাকি সময় ভ'রে দেওয়া হয়েছিল গানে – রবীন্দ্রনাথের ও অতুলপ্রসাদের। অতুলপ্রসাদের মুখে সেদিন যে-গানগুলি শুনেছিলাম তার মধ্যে মনে পড়ে 'কি আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়' আর 'জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী'।

সে-রাতে ছিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সন্থতোলা রূপনারায়ণের ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবার পর আমরা গেলাম ঐ-খালে নৌবিহারে। আবার গানের পালা। আজ মনে পড়ছে শুধু দুটি গানের কথা – রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ বলেছে যাব যাব' ও অতুলপ্রসাদের 'বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে'। অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন যে ঐ-গানটি তিনি রচনা করেন মফঃস্বলে একটি মামলায় গিয়ে – রাত্রে ডাকবাংলোয় কিছুতেই ঘুম হচ্ছিল না সেইসময়ে।

অতুলপ্রসাদ কলকাতার পাট গুটিয়ে ফিরে গেলেন লখ্‌নৌতে। মান্‌ডে ক্লাবও ক্রমে-ক্রমে যেন উবে গেল। কিন্তু অতুলপ্রসাদ কলকাতায় যাতায়াত করতেন। তারপর ১৯২২ সালে দিলীপকুমার রায় বিলেত থেকে ফেরার পর আসরের পর আসর জমাতে লাগলেন নানা জায়গায়, তখন নতুন ক'রে চর্চা শুরু

হ'ল অতুলপ্রসাদের গানের। এইরকম অনেক আসরেই আমি উপস্থিত থেকেছি।

অতুলপ্রসাদের গানে দিলীপকুমার বিশেষ রস পেয়েছিলেন, তাই অনেক-সময়ে তিনি শুধু অতুলপ্রসাদের গান গাইতেন না, যারা শিখতে চাইত তাদের অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে শেখাতেন। এই জন্যে অতুলপ্রসাদের গানের সমঝদারের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল – তবে অতুলপ্রসাদের বা রবীন্দ্রনাথের গান দিলীপকুমার গাইতেন বেশ বিস্তার ক'রে সতান আবেগে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুরের নড়চড় হলে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হতেন, সুতরাং কেউ তাঁর গান ওস্তাদি গানের মতন বিস্তার ক'রে গাইবে এটা তাঁর কাছে একেবারে অসহনীয় ছিল। দিলীপকুমারের গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত অবশ্য অনেকে পছন্দ করতেন, কিন্তু আমার মতো অনেকেই ছিলাম সম্পূর্ণ রবীন্দ্রপন্থী। তাই কখনো-কখনো দিলীপকুমারের গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আমিও আপত্তি জানিয়েছি।

অতুলপ্রসাদের গান সম্বন্ধেও ঐ একই যুক্তি খাটে, কেননা তার বৈশিষ্ট্য কথা ও সুরের সামঞ্জস্যে। মনে পড়ে, একটি ছোটখাটো আসরে আমি দিলীপকুমারকে বলেছিলাম, 'তুমি অতুলবাবুর গান এত তান দিয়ে গাও কেন? উনি তো নিজে তা করেন না। এতে কথাগুলো কি চাপা পড়ে না?' দিলীপকুমার উত্তর দিলেন, 'অতুলদার গলায় ঠিক তান আসে না, কিন্তু আমার গলায় যখন আসে আমি কেন তান দেব না? তাতে মনে হয় ওঁর গানের বৈশিষ্ট্য কিছু ক্ষুণ্ণ হয় না, বরঞ্চ আরো ফোটে।' অতুলপ্রসাদ নিজে এই আসরে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে একটিও কথা বলেন নি, শুধু মুচকি-মুচকি হাসছিলেন।

এইরকম নানা আসরেই অতুলপ্রসাদের সাক্ষাৎ লাভ করেছি ও তাঁর প্রথম গানের বই 'কয়েকটি গান' যখন বেরুল, নিজে হাতে নাম লিখে আমায় একখানি দিয়েছিলেন। সে-কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমৃত্যু মনে রাখব। ১৯৩৩ সালে আমি একডালিয়া রোডে নতুন বাড়িতে উঠে আসার পর অতুলপ্রসাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি আমার বাড়ির অত্যন্ত কাছাকাছি, তাঁর মামাতো ভাই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়িতে। এই বাড়িটির পাশে এখন হয়েছে 'ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘে'র বাড়ি। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও তখন সবে একডালিয়া রোডে নতুন বাড়ি করেছেন এবং লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি হলেই সেখানে এসে থাকতেন। একদিন তিনি এসে বললেন, 'তুমি কখনো সাইগলের গান শুনেছ?'

আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'বড়ো ওস্তাদ নয়, কিন্তু মিষ্টি গায়, অতুল-দাকে শোনাবার জন্য সাইগলকে আসতে বলেছি। তুমি আমার সঙ্গে এসো।' সাইগলের গান ঐ প্রথম শুনলাম। অতুলপ্রসাদও খুবই তারিফ করলেন।

অতুলপ্রসাদের মুখে তাঁর গান শেষবার শুনেছি আমার এই বাড়িতেই। আমার নতুন বাড়ি দেখতে এসেছিলেন সুশোভন ও রেবা সরকার একদিন বিকেলবেলায়। অতুলপ্রসাদ সামনের পথে পায়চারি করছিলেন, বললাম, 'গান শোনাতে হবে, যদি অন্য বিশেষ কাজ না-থাকে।' বললেন, 'আচ্ছা চলো, তোমার নতুন বাড়িটা তো দেখি।' তারপরে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলাম তাঁরই দেওয়া 'কয়েকটি গান' বই। বেশ কয়েকটি গান শুনিয়েছিলেন সেদিন।

অতুলপ্রসাদের শরীর সে-সময়ে খুব সুস্থ ছিল না, কিন্তু বাইরে থেকে তা একেবারেই বোঝা যেত না। এমন স্বাচ্ছন্দ্য, এমন মাধুর্য খুব কম লোকের ব্যবহারে আমি দেখেছি। অতুলপ্রসাদ যে কৃতী ব্যারিস্টার ছিলেন এবং ব্যারিস্টারসুলভ সাহেবিয়ানাও ওঁর পুরোপুরি ছিল সে-কথা যারা জানত না, তাদের পক্ষে ঠাহর করার উপায় ছিল না। মনে হ'ত যেন এই গানবাজনাই ওঁর পেশা। অবশ্য এ-বিষয়ে সন্দেহ কী তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর গান। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে অতুলপ্রসাদের উজ্জ্বল স্বাক্ষর থেকে গেছে তাঁর গানের পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

একসময়ে রবীন্দ্রনাথের মুখে আক্ষেপ শুনেছি যে প্রবোধচন্দ্র বাগচী অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ ক'রেও বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন নি। রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপের কারণ প্রবোধচন্দ্র মোচন করেন নি। কেননা তিনি বিশ্বভারতীতে যোগ দেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। কিন্তু যোগ দেবার পর শুধু অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে সন্তুষ্ট না-থেকে তিনি মনপ্রাণ নিয়োগ করেছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কর্তব্য সম্পাদনে। এই কাজে গুরুতর রোগকে উপেক্ষা করার ফলেই তাঁর আয়ুর অকস্মাৎ অবসান ঘটল। বিশ্বভারতীর উপাচার্য-পদে যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটবে ব'লে মনে হয় না—অতটা দুরবস্থা এখনো আমাদের হয় নি। কিন্তু সাহিত্য ও গবেষণাক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু যে-শূন্যতার সৃষ্টি করল তা বিশেষভাবে শোচনীয় এই কারণে যে বিশ্বভারতীর কাজের চাপে তিনি গুরুতর রক্তের চাপ অবহেলা না-করলে, ঐ-শূন্যতা সম্ভবত ঘটত না।

পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে প্রবোধবাবুর এককালে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই যোগের সূত্র ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। তখনকার পরিচয়-এর সাপ্তাহিক অধিবেশন মাসে অন্তত একবার হ'ত প্রবোধবাবুর বাড়িতে ও এইখানে নিয়মিত আসতেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। ফরাসি সংস্কৃতির উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এঁরা দু'জনেই। অপরপক্ষে, সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন ফরাসির তুলনায় জার্মান সংস্কৃতি যে অনেক উঁচুদরের এই নিয়ে তর্ক করতেন, তখন আসর জমত ভালোই। তখনকার পরিচয়-এর অধিবেশনে দেখা যেত বটকৃষ্ণ ঘোষকে —প্রবোধবাবুর বহু আগেই তাঁর আয়ু ফুরিয়েছে। অনেকের মনে থাকতে পারে একসময়ে 'শনিবারের চিঠি'তে বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রবোধবাবুকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু পরিচয়-এর সভায় এঁদের দু'জনের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ছাড়া আর-কিছু দেখি নি। প্রবোধবাবুর বিতর্কের কলম যে বেশ জোরাল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আশানন্দ নাগের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কে তিনি কখনো সৌজন্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি।

তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

প্রায় বছর-চল্লিশ আগেকার কথা। তুলসীচন্দ্র গোস্বামী তখন বোধহয় বছর-তিরিশেক বয়সের যুবক। ঐ-বয়সেই ভারতীয় পলিটিক্স্-এ কংগ্রেস-মণ্ডলীর বাইরে যাঁরা ছিলেন অগ্রগণ্য, তাঁদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন বিদ্যা বৈদগ্ধ্য ও বাগ্মিতার সমাবেশের ফলে। কেন্দ্রীয় বিধানসভায় তুলসীচন্দ্র ও তাঁর প্রায় সমবয়স্ক বন্ধু দেওয়ান চমনলাল দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভারত সরকারের প্রতিনিধি জাঁদরেল সাহেবসুবোদের জব্দ করতে ছিলেন ওস্তাদ। খবরের কাগজে তার বিবরণ প'ড়ে আমাদের রোমাঞ্চ হ'ত। এর ওপর ছিল তুলসীচন্দ্রের বিপুল বৈভব আর বংশমর্যাদা। অক্সফোর্ড-এ ছাত্রাবস্থায় তিনি ঘোরাফেরা করতেন তখনকার দিনের ঐশ্বর্যের প্রায় চরম প্রতীক রোল্স্ রয়েস্ মোটরগাড়িতে। স্বভাবতই আমাদের অনেকেরই যারা আগে তাঁকে দেখে নি, ধারণা জন্মেছিল যে তুলসীচন্দ্র গোস্বামী শুধু মেধাবী নন মেজাজীও এবং এমন স্তরে তিনি বিচরণ করেন যেখানে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তারপর একদিন তুলসীচন্দ্রের আবির্ভাব হ'ল পরিচয়-এর সাপ্তাহিক আড্ডায়, উনিশশো একত্রিশ সালের মাঝামাঝি পরিচয় প্রথম প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিন পরেই। অক্সফোর্ড-এ তুলসীবাবুর সমসাময়িক ছিলেন অপূর্বকুমার চন্দ, সাহেদ সুরাওয়ার্দি ও বসন্তকুমার মল্লিক যিনি বয়সে এঁদের চাইতে অনেক বড় ছিলেন। পরিচয়-সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মীয় অপূর্ববাবু পত্রিকা প্রকাশের প্রথম থেকেই পরিচয়-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সাহেদ সুরাওয়ার্দি, বসন্তকুমার মল্লিক (আমাদের সকলের মল্লিকদা) ও তুলসীবাবুকে তিনিই নিয়ে আসেন আমাদের আড্ডায়।

জানাশোনা হবার পর তুলসীবাবু সম্বন্ধে ভুল ভাঙল। বিধানসভার বক্তৃতায় উনি ছিলেন যেমন গরম কথার ওস্তাদ তেমনি নম্র ধীর ও সহিষ্ণু ছিলেন সাধারণ কথাবার্তায়। আর এই-যে নম্রতা এ ছিল তাঁর একেবারে অন্তরের জিনিস—প্রকৃত আভিজাত্যের নিদর্শন। পরিচয়-এর আড্ডায় যখন কোন বিতর্ক চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে তখন অনেকসময়ে দেখেছি তুলসী-

বাবুর ব্যর্থ চেষ্টা শান্তভাবে নিজের বক্তব্য শোনানো। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে চান, দু'চারজন ছাড়া, যেমন আবু সয়ীদ আইয়ুব, হুমায়ুন কবির ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি তুলসীবাবুরই মতো গরম পলিটিক্যাল বক্তৃতার পসারী।

হীরেনবাবুর সঙ্গে তুলসী গোঁসাই-এর তুলনা করেছি। কিন্তু এঁদের দু'জনের মিল সম্পূর্ণ বাইরের। বামপন্থী পলিটিক্স্-এর প্রতি তুলসীবাবুর যেটুকু টানের পরিচয় পেয়েছি তা ট্রট্স্কি-ঘেঁষা, অন্তত ট্রট্স্কি সম্বন্ধে তাঁর মনে এক-সময়ে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তবে মোটের ওপর তুলসীবাবু ছিলেন লিবারল—তখনকার মাপকাঠিতে। একেবারে খাঁটি লিবারল। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। তুলসীবাবুর বালিগঞ্জের বাড়িতে একদিন তুলসীবাবু, মল্লিকদা ও আমি গল্পসল্প ও চা পান করছি এমনসময়ে এক প্রবীণ ও সেকেলে গোছের ভদ্রলোক এসে নিজের পরিচয় দিলেন। শুনলাম তিনি তুলসীবাবুরই সমগোত্রীয় এক বড় জমিদার। তখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন আসন্ন। একটু পরেই প্রবীণ ভদ্রলোকটি জানালেন যে তুলসীবাবু যদি জমিদারদের প্রতি-নিধিরূপে নির্বাচনপ্রার্থী হতে রাজি হন তা হলে বাংলার সমস্ত বড় জমিদার ওঁকে সমর্থন করবেন। অত্যন্ত নম্রভাবে তুলসীবাবু উত্তর দিলেন যে কোন সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ আসনের বিধান গণতন্ত্রের বিরোধী, সুতরাং জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

স্বাধিকারপ্রমত্ততা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নি।

তুলসীবাবুর কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে পলিটিক্স্ ক্লাবের কথা। পলিটিক্স্ ক্লাবের জন্ম হয় পরিচয়-এর জন্মের অল্পদিন পরেই—যতদূর মনে পড়ে দু'তিন বছরের মধ্যে। এর প্রতিষ্ঠাতা আমার মাতুল সুধীরকুমার লাহিড়ী, যিনি ৬০।৬৫ বছর আগে ছিলেন লাহোরের বিখ্যাত 'পাঞ্জাবী' নামক দৈনিকের সম্পাদক, বিখ্যাত অধ্যাপক ও দেশভক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমন তাঁর যোগ্য পুত্র অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাছাড়া কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ ও আরো দু'চারজন একেবারে প্রথম থেকেই এর সভ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। সুশোভন সরকার ও কলকাতায় থাকলে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও এই ক্লাবের সভায় যোগ দিতেন। তারপর মল্লিকদাও আমাদের সঙ্গে জুটে গেলেন। সুতরাং পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে এই ক্লাবটির গোষ্ঠীগত না-হলেও ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল বলা যেতে

পারে—যাকে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় পার্সোন্যাল ইউনিয়ন। বোধহয় এই সূত্র ধ'রেই তুলসীবাবুও পলিটিক্স্ ক্লাবে উৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন—কবে ও কীভাবে এই যোগাযোগ ঘটেছিল তা মনে নেই। তবে এ-কথা মনে পড়ে তাঁর রেনি পার্ক-এর বাড়িতে এই ক্লাবের একাধিক অধিবেশন হয়েছে।

পলিটিক্স্ ক্লাব-এ আমাদের আলোচনা হ'ত ব্রিটিশ ভারতের শাসননীতির নানা দিক। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়েও তুমুল আলোচনা হয়েছে। এইসব আলোচনায় যোগ দিতে তুলসীবাবু মনে হ'ত বিশেষ আনন্দ পেতেন, অবশ্য আমরাও পেতাম, কিন্তু এই নতুন পরিবেশে নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম, আলাপ-আলোচনায় তাঁর অসাধারণ সংযম ও সৌজন্যের—যা বাঙালি তথা ভারতবাসীদের মধ্যে কমই দেখা যায়।

তুলসীবাবুর আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই পরিবেশে ভালো ক'রে ফুটে উঠেছিল—তীব্র ব্রিটিশ-বিদ্বেষ। তুলসীবাবু গান্ধিবাদী পলিটিক্স্-এ বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তবু ১৯৩১-৩২ এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে সারা দেশবাসীর মতন তাঁরও মনে সাড়া জেগেছিল। কিন্তু যখন এই আন্দোলনের অবসান হ'ল গান্ধি-আরউইন চুক্তিতে, তুলসীবাবুকে যেভাবে ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি তা তাঁর পক্ষে ছিল বিরল। যতদূর মনে পড়ে পরিচয়-এর প্রথম দিকের এক অধিবেশনে তিনি গান্ধি-আরউইন চুক্তি বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের বোঝালেন কী ক'রে এই চুক্তির একটির পর একটি দফায় গান্ধিজী মেনে নিয়েছেন আরউইনের অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের দাবি।

ঐ-সময়ে তুলসীবাবুর শরীর প্রায় ভেঙে পড়েছিল। তাই বিধানবাবুর নির্দেশে তাঁকে থাকতে হ'ত খুব কড়া নিয়মে। ওঁর বাড়িতে পলিটিক্স্ ক্লাবের অধিবেশনের সময়ে তাই আমরা একটু সঙ্কুচিত হতাম পাছে নিয়মের অপলাপ ঘটে। মনে আছে একদিন ওঁর খাবার সময় হ'তে আমরা প্রস্তাব করলাম সভা ভঙ্গ করা হোক। তুলসীবাবু কিন্তু কিছুতেই রাজি না-হয়ে বললেন, বিধানবাবু আমার যে-পথ্যের ব্যবস্থা করেছেন তা সারতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না, সুতরাং আপনারা যদি পাঁচ মিনিটের জন্যে আমায় মাপ করেন, আমি আবার এসে যোগ দিই। সুতরাং সভা চলল আরো অনেকক্ষণ।

এইসব আলোচনায় তুলসীবাবু বেশি কথা বলতেন না। বিধানসভায় যাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য একসময়ে সারা ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করত, এইসব ঘরোয়া বৈঠকে

তিনি যেন চাইতেন নিজে যত পারেন কম কথা ব'লে অন্যের কথা শুনতে। অবশ্য যেটুকু কথা বলতেন তা ছিল শোনবার মতন।

তুলসীবাবুকে একসময়ে লোকে জানত অসাধারণ ভাগ্যবান ব'লে—যেমন তাঁর ছিল বৈভব তেমনি বিদ্যা। কিন্তু ভাগ্যের স্রোতে একদিন ভাঁটা পড়ল। তাঁর স্বাস্থ্য হ'ল ভঙ্গ, বৈভবও হ'ল লোপ। কিন্তু তিনি জীবনের সংগ্রামে ভাগ্যের কাছে পরাভব মানেন নি। রেনি পার্ক-এর প্রাসাদোপম বাসভবন ছেড়ে শেষজীবন তিনি কাটান ডোভার লেনের একটি মাঝারি গোছের বাড়িতে। ঐ-সময়ে কিছুকাল তিনি বঙ্গীয় বিধানসভার সভ্য হয়েছিলেন। মোটামুটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। পেট্রোলের দারুণ অভাব। তাই অনেক রথী তখন বাধ্য হয়ে হয়েছেন ঠিক পদাতি না-হলেও মহাযানপন্থী অর্থাৎ বাসের বা ট্রামের যাত্রী। একদা রোলস্ রয়েস্-বিহারী তুলসীবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা ট্রামে। বসবার জায়গার অভাবে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে—শুধু দাঁড়িয়ে নয়, দুই হাতে মোটা-মোটা রাজনীতি সমাজনীতি বিষয়ে কয়েকটি বই নিয়ে। বললেন, 'বিধানসভার লাইব্রেরিতে ফেরত দিতে যাচ্ছি।' বললাম, 'আমাকে দুটো বই দিন, ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে যাই।' রাজি হলেন না। বললাম, 'আপনাকে ট্রামে দেখে একটু আশ্চর্য লাগে। তবে পেট্রোল র‍্যাশনিং-এর দৌরাত্ম্যে আপনাদের বন্ধু নলিনী সরকারও তো কাগজে পড়লাম ট্রামে যাতায়াত করছেন।' একটু হেসে তুলসীবাবু বললেন, 'নলিনী আর ট্রামে চড়া ছেড়েছে ক'দিন?'

তুলসীবাবুকে অনেক-কিছুই ছাড়তে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চরিত্র, আর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কোনদিন ম্লান হয় নি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

And now that thou art lying, my dear old Carian guest,
A handful of grey ashes, long, long ago at rest,
Still are thy pleasant voices, thy nightingles, awake,
For Death, he taketh all away, but them he cannot take.

—Heraclitus: William (Johnson) Cory.

The rest is silence.—Hamlet.

মল্লিকদা বলতেন, ওদের জীবন হ'ল মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট—মুহূর্তকে নিয়ে ওরা পাগল, মুহূর্তের পর মুহূর্ত, কিন্তু সমগ্র জীবনের কথা ওরা ভাবে না। মল্লিকদা অর্থাৎ বসন্তকুমার মল্লিক। বারো বছর অক্সফোর্ড-এ কাটানোর পর দেশে ফিরে নিয়তির অনিবার্য বিধানে তিনি এসে জুটেছিলেন আমাদের পরিচয়-চক্রে। পরিচয়-এর বয়স তখন বেশি নয়, বছরখানেক হবে। মল্লিকদার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুধীন সুশোভন আমি ছিলাম ত্রিশ-বত্রিশ। নীরেন একটু বড়। তার চাইতেও বছর তিন-চার বড় ধূর্জটি মুখুজ্যে, গিরিজা ভট্টাচার্য ও সত্যেন বসু। এই চক্রে এসে জেঁকে বসলেন মল্লিকদা; বোধহয় অপূর্ব চন্দ তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক মনে নেই। তবে অপূর্ব চন্দ, সাহেদ সুরাওয়ার্দি ও তুলসী গোঁসাই, পরিচয়-চক্রের এই ত্রয়ীর সঙ্গে অক্সফোর্ড-এ থাকতে মল্লিকদার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, যার ফলে তিনি মল্লিকদা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পরিচয়-চক্রে যোগদানের পর মল্লিকদার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল সুধীনের ও আমার: তিনি হয়ে উঠলেন একাধারে আমাদের বন্ধু ও নৈতিক অভিভাবক। মল্লিকদার নীতিজ্ঞান ছিল প্রখর, আর অভিভাবকত্ব করার তাগিদ ছিল সহজাত। এই তাগিদেই তিনি সুধীনদের অর্থাৎ সুধীন, সাহেদ সুরাওয়ার্দি ও সম্ভবত অপূর্ব চন্দর—কিন্তু প্রধানত সুধীনের মনোবৃত্তি ও জীবনের হালচাল লক্ষ ক'রে প্রচার করতেন ঐ মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট থিওরি।

আজ প্রায় ত্রিশ বছর পরে সুধীনের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল মল্লিকদার ঐ-মত। সুধীনের জীবন পৌঁছে গেল তার চরম মুহূর্তে, তারপর আর একটি মুহূর্তও যে বাকি রইল না। এরপর নিঃসীম নীরবতা, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস (যদিও আমি হ্যামলেট নই) আর সুধীনেরও যতদূর জানি ঐ-বিশ্বাসই ছিল।

কেন বলতেন মল্লিকদা ঐ-কথা? এমন কী তিনি লক্ষ করেছিলেন সুধীনের জীবনে যা আমাদের পাঁচজনের ও অবশ্য তাঁর নিজের জীবন থেকে স্বতন্ত্র? মল্লিকদার জীবন তো ছিল—সে-কথা আমাদের দলের কে না-জানে?—ইংরেজিতে যাকে বলে একেবারে হ্যাণ্ড টু মাউথ। কিন্তু তা হ'ল জৈবিক ব্যাপার, দার্শনিক নয়। সুধীনের মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট জীবনের কথা তিনি বলতেন দার্শনিক অর্থে; তাঁর দর্শন নয়, সুধীনের দর্শন। ব্রাউনিঙের মোমেণ্ট ইটারন্যালের কথা কি মল্লিকদার মনে ছিল? হয়তো সে-কথা তিনি শোনেন-ই নি। ব্রাউনিং-দর্শন সুধীনকে কি স্পর্শ করেছিল? গ্ল্যাড্ অ্যাণ্ড ব্যাড্ হওয়ার ঝোঁক সুধীনের তখনকার জীবনে যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু ব্রাউনিঙ ও সুধীনের মাঝখানে ছিল যুগযুগব্যাপী মহাসমুদ্রের ব্যবধান।

সুধীনের প্রাক্-পরিচয় জীবনের কথা আমি বিশেষ জানি না, কেননা দু'-একবার রবীন্দ্রনাথের কাছে ওকে দেখলেও তখনো ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি। লোকের মুখে শুনেছিলাম ছেলেটি গুণী, সাহিত্যে অগাধ অনুরাগ। এরপর যখন আলাপ হ'ল তখন গুণ যাচাই করার প্রবৃত্তি হয় নি। কী ক'রে হবে? এত অল্পদিনের মধ্যে এত সহজভাবে সুধীনের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল যে লোকটি ভালো না মন্দ, গুণী না গুণহীন সে-সব কথা ভাববার অবকাশই হয় নি। এরপর দেখেছি এইভাবে সুধীনের মায়াজালে জড়িয়েছে আরো বহু ব্যক্তি, স্বদেশবাসী ও বিদেশী, বিদ্যায় ও মননশীলতায় যাঁরা আমার চাইতে অনেক উঁচু স্তরের। আশ্চর্য লেগেছে এই কথা ভেবে যে এত বিচিত্র ব্যক্তিকে কী বিচিত্র আকর্ষণে সে এত আপন করতে পারল। মুহূর্তের পর মুহূর্তকে আঁকড়ে যে-জীবন প্রসারিত হয়েছে দিনের পর দিন, কী এত জাদু ছিল সেই জীবনে!

কেননা এ-কথা আজ না-মেনে পারছি না যে মল্লিকদার কথার মধ্যে অনেকটা সত্য ছিল। পরিচয়-এর আদিযুগের সুধীনের কথা বলছি। একদিকে সমাহিত সাহিত্য-সাধনা আর-একদিকে অবিরত অস্থিরতা—এই

ছিল তার জীবন। কোথাও সে যেন স্থির আশ্রয় পায় নি, আর এই আশ্রয় খোঁজার জন্যে সে যেন নিরন্তর ব্যগ্র। স্বাদেশিক, সামাজিক এমন-কি পারিবারিক পরিবেশও যেন তার কণ্টকশয্যা। কিন্তু এ-কথা অর্ধসত্য। কেননা আত্মীয়-পরিজন বন্ধুবান্ধব সকলের প্রতি তার সহৃদয়তাও স্মরণীয়। এই সহৃদয়তা মৌখিক নয়, আন্তরিক। ত্রিশ বছর ধ'রে দেখেছি, যাকে সে একবার কাছে টেনেছে তার প্রতি সে কখনো বিমুখ হয় নি। হয়তো মনোমালিন্য ঘটেছে, এমন-কি কলহ: সুধীনের অভিমানবোধ ছিল প্রখর আর অনেকসময়ে তা তীব্রভাবে প্রকাশ পেত। কিন্তু এ-সব সাময়িক ব্যাপার। মোট কথা সুধীন মানুষ ভালোবাসত—সবরকমের মানুষ।

প্রাক্-পরিচয়-যুগে সুধীনের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই যে খুব মননশীল তা নয়। কিন্তু এঁদের নিয়ে আড্ডা জমাতে ও মাঝে-মাঝে হৈ-হুল্লোড় করতে সুধীনের উৎসাহের অভাব ছিল না। এরপর জ'মে উঠল পরিচয়-এর আড্ডা। সে এক নক্ষত্রসভা। বসন্ত মল্লিক, সাহেদ সুরাওয়ার্দি, সত্যেন বসু, ধূর্জটি মুখার্জি, হুমায়ুন কবির, সুশোভন সরকার, তুলসী গোঁসাই, আবু সয়ীদ আইয়ুব, নীরেন রায়, হীরেন মুখার্জি—প্রচণ্ড ইণ্টেলেক্চুয়্যাল ব'লে এঁরা সকলেই ছিলেন খ্যাত। বিষ্ণু দে তখন ছেলেমানুষ, পরিচয়-এর আড্ডায় নিয়মিত এলেও সে প্রায় মুখ বুঁজেই থাকত, এমন-কি সামনে খাবার ধরলেও। কখনো-কখনো আসতেন একদা অক্সফোর্ড-এর অল্ সোল্স্ কলেজের ফেলো কিরণ মুখুজ্যে—সাহেদ সুরাওয়ার্দি তাঁকে ডাকতেন 'প্লেটো' ব'লে। মাঝে-মাঝে আমরা পেয়েছি সুধীনের মেসোমশায় চারুচন্দ্র দত্তকে। ঐ এক আশ্চর্য লোক। সেকালের আই. সি. এস., অতএব সাহেব। কিন্তু একেবারে খাঁটি ভারতীয় মন। গালগল্পে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, যেমন কথায় তেমনি লেখায়। এই ছিল আমাদের পরিচয়-চক্র।

মাঝে-মাঝে বিদেশী কেউ-কেউ আসতেন। অপূর্ব চন্দ বলতেন, সুধীন সাহেবদের আকর্ষণ করে চুম্বকের মতো। লোকে সুধীনকেও তো বলত সাহেব। কথায়বার্তায় বাংলার চেয়ে ইংরেজি বলাই ছিল তার বেশি অভ্যাস। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পেয়েছিলাম যে ছেলেবেলায় কাশীতে আনি বেসাণ্টের ইস্কুলে প'ড়ে তার ইংরেজি বলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অথচ এই ইংরেজিদুরস্ত লোকটি যখন বাংলা লিখতে শুরু করল তখন মনে হ'ল সে চিরজীবন শুধু সাধনা করেছে সংস্কৃত ভাষার। সুধীন

আমাকে বলেছিল তার প্রথম বই 'তন্বী'তে যেটুকু রবীন্দ্র-প্রভাব ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার চেষ্টায় সে নতুন এক রচনারীতি সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মাইকেলের বেলায় তো এই যুক্তি খাটে না। তিনিও তো ছিলেন ইংরেজিদুরস্ত। এই দু'জনেরই রচনারীতির বিবর্তনে একটু ঐতিহাসিক সাদৃশ্য আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে সুধীন মাইকেলের বিশেষ সমঝদার ছিল।

কিন্তু কোথায় মাইকেল আর কোথায় পরিচয়-যুগ! আমরা আচ্ছন্ন ছিলাম রবীন্দ্র-সম্মোহনে। ঠিক হয়েছিল, এই সম্মোহন কাটিয়ে দেশবিদেশের সাহিত্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে আমাদের পত্রিকা। তাই নামকরণ হয়েছিল 'পরিচয়'। আরো ঠিক হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা লেখা চাইব না। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন, তারপর তাঁকে ঠেকায় কার সাধ্য? কিন্তু দেশবিদেশের সাহিত্য ও চিন্তাধারা যে প্রতিফলিত হয়েছিল পরিচয়-এর সংখ্যায় তা তো আজ অবিসংবাদিত ইতিহাস। আর এই প্রতিফলনের উজ্জ্বলতম অংশ ছিল সুধীনের নিজের রচনা। টি. এস. এলিয়ট বা ইয়েট্স্-এর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় থাকলেও ক'জন রাখত ভালেরি বা মালরোর খবর? আর মার্কিন ঔপন্যাসিক ফক্নার তো তখন ইয়োরোপ-আমেরিকাতেও ছিলেন প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল। পরবর্তী কালে ফক্নারের বিপুল প্রতিষ্ঠা সুধীনের যুগান্তপ্রসারী সাহিত্যবীক্ষার পরিচায়ক।

এইসময় সুধীনকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল বিজ্ঞান ও দর্শন। পরিচয়-সভায় বহুদিন দেখেছি আইয়ুব বা কবিরের কাছে সুধীন ইয়োরোপীয় দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান নিচ্ছে। বিজ্ঞানচর্চা সুধীন করে নি, কিন্তু পদার্থ বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা তাকে স্পর্শ করেছিল, বিশেষ ক'রে বৈজ্ঞানিকরা যাকে বলেন এনট্রোপি তারই ধারণা। এনট্রোপির বাংলা কী করব? বোধহয় জাগতিক বিশৃঙ্খলা, যার একটি বৈজ্ঞানিক মাপ আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক হলডেনের একটি রচনায় পড়লাম এই এনট্রোপির ধারণা নাকি প্রথম পাওয়া যায় রোমক কবি সেনেকার কবিতায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি এই লাইনটির উল্লেখ করেছেন: Tempus nos auidum denorat et chaos (Greedy time and chaos devour us)। পাঠকেরা মিলিয়ে দেখবেন সেনেকার সঙ্কেত সুধীনের কাব্যে কতটা পাওয়া যায়।

পরিচয়-মণ্ডলীতে সুধীন রস পেয়েছিল আর প্রভূত রস সঞ্চারিত করেছিল। মননশীলতায় ও ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে সুধীন ছিল এই মণ্ডলীর উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। দশ বছর ধ'রে এই মণ্ডলীর আলো বিকীর্ণ হয়েছিল বাংলা দেশে। তারপর মহাযুদ্ধের ধাক্কায় আমরা হলাম ছত্রভঙ্গ। বিচিত্র মতের ভার বহন ক'রে পরিচয়-এর মঞ্চ দশ বছর অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু যখন ভিন্ন পথের তাগিদ প্রবল হয়ে উঠল তখন পুরোনো মঞ্চের আশ্রয় হ'ল নিরর্থক। এরপর সুধীনের সাহিত্য-সাধনায় কিছুদিন বাধা পড়ল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সুধীন একসময়ে আত্মনিয়োগ করেছিল সাহিত্য-সাধনায় ও সুহৃদ্-সাহচর্যে। আর-একবার সে ধরা দিল চাকরির জালে। বেশিদিন নয়।

চোরবাগানের দত্ত-পরিবার নতুন ক'রে শিকড় গজিয়েছিল হাতিবাগানে। সুধীনের বাবা মারা যাবার পর এই আস্তানাও আস্তে-আস্তে ভাঙল। কিন্তু সুধীন তখন বাংলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে স্বসমুত্থ শক্তিতে, ব্যাপকভাবে না-হলেও দৃঢ়ভাবে। দত্ত-বংশের আলো সে নিবতে দেয় নি। নব-নব সুহৃদ্‌সমাগমে সুধীনের নতুন আড্ডা গমগম করত।

নতুন বুধমণ্ডলী গ'ড়ে উঠল তাকে ঘিরে: সুশীল দে, বুদ্ধদেব বসু, এরিক্ ডাকস্টা : ধূর্জটি মুখুজ্যে, মৃণালিনী ও লিণ্ডসে এমার্সন—এঁরা তো ছিলেন পরিচয়-যুগ থেকেই। অপূর্ব চন্দ তো ঘরের লোক। আরো ছিল তরুণ সাহিত্যিকদের দল। প্রৌঢ় সুধীন যে এদের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সাক্ষ্য পেলাম 'উত্তরসূরী'র সুধীন্দ্র-স্মরণসংখ্যায়। সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য সুধীনকে বলেছেন নিঃসঙ্গ নায়ক। এ-কথা হয়তো সত্য। নিঃসঙ্গ ব'লেই কি সে পারত এমনভাবে প্রৌঢ় ও তরুণ সকলকে নিয়ে আড্ডা জমাতে?

চিরকালের মতন সেই আড্ডা ভাঙল। কিন্তু বাংলার সাহিত্য প্রাঙ্গণে দত্ত-পরিবারের আলো কি কখনো ম্লান হবে?

প্রতিমা ঠাকুর

১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী বিধবা প্রতিমা দেবীর বিবাহ বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা, ঠাকুর-পরিবারে এই প্রথম বিধবা-বিবাহ। এই সূত্রে এই কথা স্মরণীয় যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি। পিতৃভক্ত রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সকল বিষয়ে তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারেও তিনি যে কতটা উৎসাহী ছিলেন, তার প্রমাণ শুধু পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ নয়, তাঁর প্রিয় শিষ্য অজিতকুমার চক্রবর্তীর ঐ একইসময়ে বিধবা-বিবাহেও তিনিই ছিলেন উদ্‌যোগী।

বিবাহের পর নববধূর হাতে চাবির গোছা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বউমা, তোমার উপর বাড়ির সবকিছুর ভার দিলাম।" কিন্তু প্রতিমা দেবী ভার নিয়েছিলেন শুধু গৃহস্থাশ্রমের নয়, গৃহের বাইরে ভুবনডাঙার বিস্তৃত প্রান্তরে রবীন্দ্রনাথ যে দ্বিতীয় গৃহ রচনা করেছিলেন—সেখানকারও। তখনকার সেই বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনকে আশ্রয় ক'রে ক্রমে বিরাট বিশ্বভারতীতে পরিণত হ'ল, প্রতিমা দেবীর গৃহিণীপনার দায়িত্বও বাড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। এই দায়িত্ব তিনি জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত—যতদিন-না অক্ষম হয়ে পড়েন—বহন করেছেন স্বচ্ছন্দ নৈপুণ্যের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের বউমা হয়েছিলেন আশ্রমবাসী সকলেরই শ্রদ্ধার ও আদরের বউঠান। স্বদেশে ও বিদেশে যে-কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, প্রতিমা দেবীর মাধুর্যে মুগ্ধ হন নি এমন কেউ আছেন ব'লে জানি না। দার্শনিক শ্রীশচন্দ্র সেনের মুখে শুনেছি যে তাঁর গুরু জগদ্‌বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক অয়কেন্ প্রতিমা দেবীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ীর পক্ষে শিল্পচর্চা স্বাভাবিক, মাতা বিনয়িনী দেবীরও আঁকার হাত ছিল যথেষ্ট, আর মাসিমা সুনয়নী দেবী প্রবর্তন করলেন ছবি আঁকার এক স্টাইল। ঘরের ও বাইরের নানা কাজের

মধ্যেও প্রতিমা দেবী স্বামী রথীন্দ্রনাথের মতন নিয়মিত শিল্পচর্চা করতেন। তাঁর আঁকা কোন-কোন ছবি শিল্পরসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। স্বামীর সাহচর্যে ও উৎসাহে তাঁর শিল্পচর্চা বিস্তৃত হয়েছিল উদ্যান রচনায়। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর ছাপ রয়ে গেছে উত্তরায়ণের আশ্চর্য বাগানে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনায় ও প্রচ্ছদসজ্জায় প্রতিমা দেবী ছিলেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ করের সহযোগী। নৃত্যনাট্য সম্পর্কে তাঁর যে একটি স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল – তার পরিচয় পাওয়া যায় নৃত্যনাট্য-বিষয়ক তাঁর রচনায়। কিন্তু প্রতিমা দেবীর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা 'নির্বাণ' – যাতে আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের চরম অধ্যায়ের মর্মান্তিক বর্ণনা।

রথীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। তাঁর ভগ্নী মীরাদেবী ভগ্নদেহ নিয়ে বাস করছেন কলকাতায়। রবীন্দ্র-পরিবারের ক্ষীণ দীপশিখা শান্তি-নিকেতনে লালন করছিলেন প্রতিমা দেবী, আজ তারও হ'ল নির্বাণ। ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ সে মহানির্বাণ ঘটেছিল। তারপর এই নির্বাণও আমাদের কাছে মর্মান্তিক। কেননা, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত যোগসূত্র হ'ল সম্পূর্ণ ছিন্ন।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মজার লোক ছিলেন মোহনলাল। সারাজীবন তিনি নানারকম মজা ক'রে গিয়েছেন। জীবনের শেষদিনও নাকি তিনি বলেছিলেন, "মনে হচ্ছে আমার coronary attack হবে।" কথার ভঙ্গিতে মনে হয়েছিল যে তিনি মজা করছেন, যেমন প্রায়ই করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তাতে মনে হয় এমন মজা কি করতে আছে!

মোহনলালের নানা মজার কাহিনীর কিছু আমি শুনেছি তাঁর বন্ধুদের মুখে – বিশেষ ক'রে শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় বসুর, যিনি একসময়ে এই ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ল্যাবরেটরির যুগে। মোহনলালের আর-একজন বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত অমরেশ রায় কিছুকাল আগে ইনস্টিটিউট ছেড়ে গিয়েছেন।

বয়সে আমি মোহনলালের চেয়ে বছর-দশেকের বড়। তাই যদিও ১৯১৫ সাল থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আমার যাতায়াত, মোহনলালের সঙ্গে পরিচয় হয় বহু বৎসর পরে। তবে মোহনলাল তাঁর 'দক্ষিণের বারান্দা' বইতে ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের যে প্রাসাদোপম বাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন, তারই বিরাট বৈঠকখানা ঘরে মাঝে-মাঝে বসত রবীন্দ্রনাথের সাপ্তাহিক আসর, যার নাম দিয়েছিলেন 'বৈঠক'। মেয়েদেরও একটি স্বতন্ত্র আসরের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং তাঁদের এক প্রতিনিধি এসে একদিন রবীন্দ্রনাথকে জানালেন তাঁরা তাঁদের ঐ-আসরের নামকরণ করতে চান 'আলাপিনী'। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "নামটি ভালো, কিন্তু কথাটির মানে জানো?" প্রতিনিধিটি চুপ ক'রে রইলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আলাপিনী মানে বীণা।"

এইসময় আমার পরিচয় হয় মোহনলালের বাবা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখনকার সাহিত্যজগতে তিনি বেশ-একটু পসার জমিয়েছিলেন। তাঁর ছোটো ছেলেদের জন্যে লেখা 'জাপানী ফানুস' প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি হয়েছে অর্থাৎ এতে ফাঁকি নেই।... জাপানী ফানুসের রঙিন আলোতে শিশুদের কল্পনাসুদ্ধ প্রমোদিত হয়ে উঠবে

এতে সন্দেহ নেই।" মোহনলালের পিতৃ-দত্ত অধিকার উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে তাঁর লেখা বইগুলিতে। মোহনলাল ছিলেন জাতসাহিত্যিক। তিনি যে বড়রকমের সরকারি কোন পুরস্কার পান নি, তা আশ্চর্যের বিষয়।

যাক। যে-সময়ের কথা বলছিলাম মোহনলালের বয়স তখন আর কত হবে? এই পাঁচ'ছয়। বছর-পনেরো বয়সে মোহনলাল গিয়ে ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে। ম্যাট্রিক পাস ক'রে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন আই. এস্. সি. পড়ার জন্যে। এরপর তিনি কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজেও পড়েছিলেন শুনেছি। কিন্তু সে-সব খুঁটিনাটি খবর আমি বিশেষ জানি না।

মোহনলালের নাম আমি প্রথম জানলাম ১৯৩২ সালে, পরিচয় পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার বছরখানেক পরে। মোহনলাল ও শান্তিপ্রিয় বসু -লিখিত "বিবাহ-বিচ্ছেদ" নামে একটি প্রবন্ধ এসে পৌছল পরিচয়-সম্পাদকের কাছে। এই প্রবন্ধটি নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা হয়েছিল, কেননা প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এটি ছাপানো গেল না, কারণ অল্পদিন আগেই খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লেখা ঐ-জাতীয় একটি প্রবন্ধ পরিচয়-এ ছাপা হয়ে গিয়েছিল। এই প্রবন্ধটি পরে 'বিয়ের ভুল' নামক বইটির অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঐ-সময় আমেরিকার খ্যাতনামা বিচারপতি লিণ্ডসে-লিখিত *Companionate Marriage* বইটি প্রায় সারা পৃথিবীতে একটু আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। মোহনলাল ও শান্তিপ্রিয় ঐ-বিষয়ে কিছু লিখে বসলেন, কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তেও companionate marriage-এর বাংলা প্রতিশব্দ তাঁরা ঠিক করতে পারলেন না। তখন মোহনলাল রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি লিখলেন এই সমস্যা সমাধানের জন্যে। শান্তিনিকেতন থেকে অচিরাৎ এল একটি স্বাক্ষরবিহীন পোস্টকার্ড—তার একদিকে মোহনলালের নাম-ঠিকানা, আর-একদিকে শুধু একটি মাত্র কথা, "সখ্যবিবাহ"। কথায়-কথায় রবীন্দ্রনাথ এই তরুণ লেখকদ্বয়কে বলেছিলেন, "তোদের বিয়ে হয় নি, তাই বিয়ে সম্বন্ধে বেশ নিরাসক্তভাবে লিখতে পারবি।"

মজার মানুষ ছিলেন মোহনলাল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও মজা করতে তাঁর বাধত না। একদিন গানের কথা উঠলে মোহনলাল রবীন্দ্রনাথকে বললেন, "জানেন, ভাগ্‌নের (Wagner) একদিন একটা মোহর বাজিয়ে বলেছিলেন, 'এই হ'ল একমাত্র সংগীত যা আমার পছন্দ।'" কোথা থেকে মোহনলাল

ভাগ্‌নেরের মতন বিশ্ববিখ্যাত কমপোজার-এর এই অদ্ভুত বাণীটি সংগ্রহ করেছিলেন তা বলতে পারি না।

আর-একটি মজার ঘটনার কথা বলি। মোহনলাল ও তাঁর তিন'চারজন বন্ধু পরামর্শ ক'রে কলেজ স্ট্রীটে অল্পক্ষণ পরপর একই লোককে গিয়ে প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "মশায়, বলতে পারেন অক্রূর দত্ত লেন কোথায়?" লোকটি হতভম্ব!

উত্তরজীবনে মোহনলালের মজা ক'রে লোককে নাকাল করার প্রবৃত্তি অনেক ক'মে এসেছিল। তিনি ভালোবাসতেন আড্ডা জমাতে—কলকাতার অ্যালবার্ট হল-এর কফিখানায়, শান্তিনিকেতনে কালোর দোকানে (বিশেষ ক'রে পৌষ মেলার সময়ে) আর পথেঘাটে যেখানে সুবিধা পেতেন মৃদুভাষী মোহনলাল একটু হাসি আর দু'একটি মধুর টিপ্পনি দিয়ে সহজেই অপরিচিতকে আপন ক'রে নিতেন।

মোহনলালকে মনে হ'ত মাটির মানুষ। কিন্তু তিনি ছাঁচে-ঢালা মানুষ ছিলেন না। আপন স্বকীয়তায় তাঁর ছিল দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। যখন যে-পোশাক তিনি পরতেন, মনে হ'ত ঐ তাঁর একান্ত অভ্যস্ত পরিধেয়। যে-ধরনের আড্ডাই হোক, মোহনলাল মিশে যেতেন অবাধে। তেমনি নানা বিষয়ে তাঁর ছিল আগ্রহ। তিনি পরিসংখ্যান বিজ্ঞানিকের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন জীবিকার জন্যে। কিন্তু তাঁর আগ্রহ ছিল বিচিত্র ও ব্যাপক। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্. সি. (স্ট্যাট) ডিগ্রি ও চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে পত্নী মিলাডা—যিনি ঘরের ও বাইরের, রন্ধনশালার ও পাঠশালার কাজে সমান নিপুণ—সংগ্রহ ক'রে দেশে ফিরবার সময়ে কিন্তু তিনি পরিসংখ্যান বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে জীবিকা নির্বাহের কথা চিন্তা করেন নি। তাঁর আশা ছিল দেশে ফিরে একটি ছাপাখানা করতে হবে। সত্যিই মজার মানুষ ছিলেন মোহনলাল।

ছাপাখানা চালানো মোহনলালের কপালে ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাঁর অবলম্বন হ'ল পরিসংখ্যান, যাতে তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বহুবৎসরব্যাপী এই ইনস্টিটিউট-এর কাজের ফাঁকে তিনি কিছুদিন ঘুরে এলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স-এর অন্তর্গত ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর কাজ ক'রে। ফলে বাংলা সাহিত্য লাভ করল 'অসমাপ্ত চটাব্দ'। এই বইটিতে যে বাস্তবতাসচেতন, যে গভীর সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায় তা উত্তর-রবীন্দ্র বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিরল।

ছাপাখানা মোহনলালের কপালে ছিল না। কিন্তু ছাপাখানার কাজের একটি বিভাগে তিনি নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। নিজের হাতে বই বাঁধাইয়ের কাজ তাঁর ছিল একটি বিলাস। একবার সুন্দর একটি খাতা শুধু বাঁধিয়ে নয়, তার দুটি মলাটে দুটি ছবি (অবনীন্দ্রনাথের নাতি তো!) এঁকে তিনি উপহার দেন শান্তিপ্রিয় বসুকে। ছবি দুটি ছিল একটি পাখির আর একটি ফুলের। শান্তিপ্রিয় বইটি দিলেন রবীন্দ্রনাথকে একটি কবিতা লিখে দেবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

পাখি যবে গাহে গান,
জানে না, প্রভাত-রবিরে সে তার
প্রাণের অর্ঘ্যদান।
ফুল ফুটে বনমাঝে—
সেই তো তাহার পূজানিবেদন
আপনি সে জানে না যে।

কবিতাটি আছে 'স্ফুলিঙ্গ' বইতে।

মোহনলাল কোনদিন কবিতা লিখেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তত একটি কবিতার জন্য যে তিনি দায়ী, ইতিহাসে তা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

তিনটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের অন্তরঙ্গ যোগ ছিল: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, বিশ্বভারতী ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ছিল নাড়ির যোগ, বিশ্বভারতীর সঙ্গে অন্তরের ও আদর্শের; আর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট তো তাঁর নিজের হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধনার গৌরব।

বংশ ও পূর্বপুরুষ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের ঠিক পাশের তিনতলা বাড়ি, ২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, তাঁর জন্মস্থান। এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্রের পিতামহ গুরুচরণ মহলানবিশ। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলের (মোগল আমলের পরগণা) পঞ্চসার গ্রাম মহলানবিশদের আদি বাসস্থান। এই পঞ্চসার গ্রামের প্রায় মাইলখানেক দূরে ছিল বল্লাল সেনের রাজধানী। বল্লাল সেনের পূর্বপুরুষ রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে প্রভূত জমিজমা দিয়ে নিজ রাজ্যে স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, কিংবদন্তী এই যে, এই ঘটনাই হ'ল পঞ্চসার নামের উৎপত্তির কারণ। ওই পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণ নাকি মহলানবিশ বংশের আদিপুরুষ। এর দশম বংশধর মহেশ্বরকে বল্লাল সেন দিয়েছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি। এ হ'ল দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। এরপর নবাবি আমলে বন্দ্যোপাধ্যায়রা অর্জন করলেন নতুন খেতাব—মহলানবিশ; এই নামেই আজ পর্যন্ত তাঁরা পরিচিত।

জীবিকার অন্বেষণে আরো বহু বিক্রমপুরবাসীর মতো গুরুচরণ কলকাতায় আসেন, ১৮৫৪ সালে। তখন তাঁর বয়স ২১ বৎসর। পূর্বপুরুষদের যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ছিল, কিন্তু বংশবৃদ্ধির ফলে কালক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এই সম্পত্তির যেটুকু ভাগ গুরুচরণ লাভ করেছিলেন তা একটি ক্ষুদ্র পরিবারের পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তখন বাংলা দেশে গ'ড়ে উঠেছে নতুন এক সমাজ। গুরুচরণ ইংরেজি জানতেন না, কিন্তু তাঁর উন্মুখ মন বরণ ক'রে নিল তখনকার দিনের প্রগতি-আন্দোলন। ১৮৬১ সালে গুরুচরণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা অসাধারণ বাগ্মী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহচর হয়ে কলকাতার পথে-পথে বেড়াতে লাগলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ক'রে। এর অল্পদিন পরেই তখনকার ব্রাহ্মদের মধ্যে এক উৎসাহী গোষ্ঠী শুরু করলেন নারী-মুক্তি আন্দোলন। গুরুচরণ এই গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৬৪ সালে গুরুচরণ তাঁর স্বগ্রামের একটি বিধবাকে বিবাহ করেন বিদ্যাসাগরের উদ্‌যোগে ও উৎসাহে। ব্রাহ্মদের পক্ষেও বিধবা-বিবাহ তখন ছিল দুঃসাহসিক কাজ, কেননা বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে ব্রাহ্মরা তখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি। এই ঘটনার এক বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল ব্রাহ্ম যুবক মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ ক'রে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (নববিধান) স্থাপন করলেন তখন গুরুচরণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এর তেরো বছর পরে ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ আর-একবার আন্দোলিত হ'ল প্রতিবাদের ঝড়ে। এর ফলে প্রশস্ত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্থাপিত হ'ল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাস প্রভৃতির সঙ্গে গুরুচরণ এইবারও ছিলেন বিদ্রোহীদের দলে। গুরুচরণ যে একেবারে প্রথম থেকেই এই নবগঠিত সমাজের কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তার প্রমাণ তিনি নির্বাচিত হন সমাজের প্রথম কোষাধ্যক্ষ। এর পর আরো কয়েকবার গুরুচরণ উক্ত পদে এবং ১৯০০ সালে এই সমাজের সভাপতি নির্বাচিত হন।

গুরুচরণের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুবোধচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, তা ছাড়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। কনিষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র কিছুদিন পিতার ওষুধের দোকান দেখাশোনার পর নতুন এক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যবসা 'স্পোর্টিং গুডস্' বা খেলাধূলার সরঞ্জাম ও গ্রামোফোনের দোকান। এই দোকানটি প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন তাঁর শ্যালক বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার; তাই দোকানটির নামকরণ হয়েছিল "কার অ্যাণ্ড মহলানবিশ"। কিছুকাল পরে প্রবোধচন্দ্রই হলেন দোকানটির একচ্ছত্র মালিক। চৌরঙ্গির এই দোকানটি যতদিন টি'কে ছিল ততদিন ছিল বাঙালি খেলোয়াড়-ক্রীড়ামোদীদের প্রধান আড্ডা।

প্রবোধচন্দ্রের দুই পুত্র : জ্যেষ্ঠ প্রশান্ত ও কনিষ্ঠ প্রফুল্ল (যিনি 'বুলা' নামে সমধিক পরিচিত)। ১৮৯৩ সালের ২৯ জুন ২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে প্রশান্তচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৯০৮ সালে ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস ক'রে প্রশান্তচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন ও ১৯১২ সালে পদার্থ-বিদ্যায় অনার্স-সহ বি. এস্. সি. পাস করেন। এরপর তিনি বিলাত-যাত্রা করেন; সে আর-এক পর্ব। কিন্তু তাঁর উত্তর-জীবনের পূর্বাভাস ইতিপূর্বেই যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল। কৈশোর যেতে-না-যেতেই তিনি বেশ তার্কিক হয়ে উঠেছিলেন ও শাণিত যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে পারতেন। অতি অল্পবয়সেই তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবে আচ্ছন্ন হন এবং পারিবারিক সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পান। রবীন্দ্রনাথ তরুণ প্রশান্তচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ ও বিশ্লেষণীশক্তিতে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। সেইসময় শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়—বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে যা তখন ছিল পরিচিত—নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানই ছিল। প্রশান্তচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের নাম-লেখা ছাত্র কোনদিন না-হলেও আশ্রমবাসীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ হয়। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি প্রশান্তচন্দ্রকে বলেন এই সঙ্ঘের সভ্য হওয়ার জন্য। এর এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র পুনরুদ্বোধন করেন। কবির নির্দেশে এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি মনোনীত হন প্রশান্তচন্দ্র।

বিলাত-যাত্রা : কেম্‌ব্রিজ

১৯১৩ সালে গ্রীষ্মকালে প্রশান্তচন্দ্র বিলাত-যাত্রা করেন—উদ্দেশ্য ছিল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্. সি. ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন। কিন্তু কেম্‌ব্রিজে বেড়াতে গিয়ে তাঁর মত বদলে গেল। অতঃপর অক্টোবর মাসে কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯১৪ সালে প্রশান্তচন্দ্র গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপোজ-এর প্রথম ভাগ ও ১৯১৫ সালে পদার্থবিদ্যার ট্রাইপোজ-এর দ্বিতীয় ভাগ পাস ক'রে কেম্‌ব্রিজের বি. এ. উপাধি লাভ করেন। দ্বিতীয় পরীক্ষাটি তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র অধ্যয়নশীল ছাত্র ছিলেন, কিন্তু পাঠ্য-

পুস্তকের বাইরেও তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। তাই কেম্‌ব্রিজের নানা সভা-সমিতিতে তিনি উৎসাহের সঙ্গেই যোগ দিতেন। সেইসময়ে কেম্‌ব্রিজের যে-সব নামকরা লোক ছিলেন যেমন, বিশ্ববিখ্যাত বার্ট্রাণ্ড রাসেল, 'লেটার্স অফ জন চায়নাম্যান'-প্রণেতা ঐতিহাসিক লোয়েস ডিকিনসন (রবীন্দ্রনাথের "চীনাম্যানের চিঠি" দ্রষ্টব্য) ও গাণিতিক হার্ডি—প্রশান্তচন্দ্র তাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন ও এঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে রাসেল তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিলেন। অবশ্য এ ছাড়াও ছিলেন কেম্‌ব্রিজের তাঁর আপন গুরু বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ লেবরেটরির অধ্যক্ষ ইলেকট্রন-আবিষ্কর্তা স্যার জর্জ টম্‌সন।

আর-এক অসাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে কেম্‌ব্রিজে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ইনি হলেন গণিতের জাদুকর রামানুজন্। প্রধানত হার্ডির চেষ্টায় রামানুজন্ কেম্‌ব্রিজে গবেষণার সুযোগ পান। প্রশান্তচন্দ্র ও রামানুজন্ প্রায়ই একসঙ্গে লম্বা পথ হাঁটতে বেরোতেন ও এইসময় নানা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে এঁদের আলেচনা হ'ত। সেরা গাণিতিকরাও যে-সব জটিল সমস্যার সমাধান করতে যথেষ্ট বেগ পেতেন, রামানুজন্ নাকি সে-সব সমস্যা সমাধান করতেন প্রায় চক্ষের নিমেষে।

কৃতিত্বের সঙ্গে কেম্‌ব্রিজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশান্তচন্দ্র গবেষণার জন্য একটি বৃত্তি লাভ করেন ও কী বিষয়ে গবেষণা করবেন তাও স্থির ক'রে ফেললেন এবং তারপর অল্পদিনের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরলেন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন : কর্মজীবন ও সংসার

দেশে ফেরার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশান্তচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ পেয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে পরিসংখ্যান বা স্ট্যাটিস্টিক্‌স্-এ তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল ও বিলাত থেকে ফেরার সময় তাই সঙ্গে এনেছিলেন ঐ-বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা 'বায়োমেট্রিকা'র (*Biometrica*) কয়েকটি খণ্ড। পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাপনার সঙ্গে-সঙ্গে চলল পরিসংখ্যানের চর্চা। শুধু তাই নয়, যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনপুরুষের যোগ, তার কাজেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ জন্মায় ঐ-সময় থেকে। এইসকল কারণে তাঁর আর এ-সময়ে কেম্‌ব্রিজে ফেরা হয় নি। চাকুরিতে তিনি কিছুকাল পরেই পাকা হলেন উচ্চতম স্তরে অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস'-এ। পরিসংখ্যানচর্চাও শনৈঃ-

শনৈঃ এগিয়ে চলল। ১৯২৩ সালে প্রশান্তচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়ের কন্যা নির্মলকুমারীকে বিবাহ করেন; কিন্তু বিবাহের পথে এমন বিঘ্ন ঘটেছিল যা প্রায় অলঙ্ঘনীয়। তাঁর সমসাময়িক আরো অনেক প্রবীণ ব্রাহ্মের মতন হেরম্বচন্দ্র আচ্ছন্ন ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে। ঋষিতুল্য মহর্ষির ঋষিতুল্য সন্তান দ্বিজেন্দ্রনাথও তাঁদের অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা দেখতেন একটু ভিন্ন চক্ষে। একান্ত রবীন্দ্র-ভক্ত প্রশান্তচন্দ্র কী ক'রে হেরম্বচন্দ্রের প্রিয়পাত্র হতে পারেন? কিন্তু বিবাহের পথে সমধিক বিঘ্ন হ'ল আর-একটি ব্যাপার। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে প্রবর্তিত ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে বেশিরভাগ ব্রাহ্ম বিবাহ এতাবৎ রেজেস্ট্রি করা হ'ত—অবশ্য কোন-কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্রাহ্মবিধি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। যখন শেষ পর্যন্ত হেরম্বচন্দ্র বিবাহে সম্মতি দিলেন তখন প্রশান্তচন্দ্র বললেন, এই ৩ আইন অনুসারে বিবাহ না-ক'রে তিনি শুধু ব্রাহ্মবিধি-মতে বিবাহ করবেন, নতুবা নয়। তাঁর যুক্তি হ'ল এই যে, ৩ আইন অনুসারে বিবাহে পাত্রপাত্রীকে বলতে হয় যে তারা হিন্দু নয়, খ্রীস্টান নয় ইত্যাদি। ব্রাহ্মগণ হিন্দু কিনা এই নিয়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল ও রবীন্দ্রনাথ খুব জোরালো ভাষাতেই একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন যে ব্রাহ্মগণ অবশ্যই হিন্দু। প্রতিপক্ষের যুক্তি ছিল, প্রথমত শুধু ব্রাহ্মবিধি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহ বে-আইনি। কেননা ব্রাহ্মবিবাহবিধি হিন্দু বিবাহবিধি থেকে স্বতন্ত্র; দ্বিতীয়ত যদিও এইজাতীয় বিবাহ হিন্দু-বিবাহ ব'লে স্বীকৃত হয় তা হলে হিন্দু পুরুষদের মতো ব্রাহ্ম পুরুষেরাও একাধিকবার বিবাহ করার অধিকারী এবং তা অবশ্যই ব্রাহ্ম আদর্শের বিরোধী। প্রশান্তচন্দ্র নিজে-নিজে প্রচুর আইন ঘেঁটে ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, যেহেতু ব্রাহ্মগণ সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় অতএব ব্রাহ্মবিধি অনুসারে নিষ্পন্ন বিবাহ শুধু সম্পূর্ণ আইনসংগত নয়, এ-জাতীয় বিবাহের পর কোন পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা বে-আইনি—কেননা তা ব্রাহ্ম আদর্শ ও আচারের বিরোধী। প্রবল পিতৃনিষ্ঠা সত্ত্বেও নির্মলকুমারী এই মতে সম্পূর্ণ সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিতর্ক চলেছিল দীর্ঘ সাত বৎসর। ১৯১৬ সালে প্রশান্ত ও নির্মলকুমারীর প্রণয়ের সূত্রপাত থেকে সাত বৎসর পরে তাঁদের বিবাহ হয় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে প্রশান্তচন্দ্রের মাতুল ডাক্তার নীলরতন সরকারের গৃহে। কন্যার পিতা তখন কলকাতায় ছিলেন না।

অনেকে যোগ না-দিলেও বহু ব্রাহ্ম এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং গান গেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে তাঁর মত বিস্তারিতভাবে প্রকাশ ক'রে 'ব্রাহ্মবিবাহবিধি' ব'লে একটি পুস্তিকা সে-সময়ে প্রশান্তচন্দ্র প্রচার করেছিলেন। কিন্তু হেরম্বচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের তীব্র মতভেদের একমাত্র কারণ বিবাহবিধি নয়; সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্রের নেতৃত্বে সেইসময়ে আর-একটি প্রবল আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছিল —এর লক্ষ্য ছিল দুটি: প্রথম, রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য (Honorary Member) রূপে গ্রহণ করা। এই প্রস্তাবের সমর্থনে প্রশান্তচন্দ্র 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' এই নামে এক পুস্তিকা লিখে প্রচার করেন। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল শিবনাথ শাস্ত্রী-স্থাপিত 'ছাত্রসমাজ' প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধানের সংস্কার।

ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল যুবক বা যুবতী এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারতেন, কিন্তু সভ্যপদের আবেদনপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর ক'রে শপথ করতে হ'ত যে ধূমপান বা মদ্যপান করব না ও সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখব না। প্রশান্তচন্দ্রের বক্তব্য ছিল যে, এইজাতীয় নেতিবাচক শপথ প্রায় বলপ্রয়োগেরই শামিল, অতএব সুস্থ বিকাশের অন্তরায়। অবশ্য এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছিলেন সুকুমার রায় এবং তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব না-হলে ব্রাহ্মসমাজের এই যুব-আন্দোলন অগ্রসর হ'তে পারত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্বে দুইবার বিভক্ত হয়েছিল। এই যুব-আন্দোলন এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে মনে হয়েছিল চতুর্থ এক ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাচীনের দল হার মানলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সভ্য নির্বাচিত হলেন ও 'ছাত্রসমাজ' স্থাপিত হ'ল প্রশস্ততর ভিত্তিতে। যে-সব প্রবীণ ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের সম্মানিত সদস্যপদে নির্বাচনের সমর্থন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, প্রশান্তচন্দ্র তাতে নেমেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিয়েই।

এই কালে ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন মোড় ফিরছিল। এই যুগের বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা হ'ল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড—যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ বড়লাট লর্ড চেম্সফোর্ডকে তাঁর বিখ্যাত চিঠি লেখেন এবং তাঁর

'নাইটহুড' (স্যর) খেতাব বর্জন করেন। ঐ-সময় প্রশান্তচন্দ্র নিরন্তর কবির সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন। এইসময়কার একটি মনোজ্ঞ বিবরণও তিনি লিখেছিলেন দেশ পত্রে (শারদীয় ১৩৬৭)।

বিশ্বভারতী

১৯২১ সালের ২২ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার আগে কিছুদিন ধ'রে প্রশান্তচন্দ্রকে বিশ্বভারতীর সংবিধান রচনার কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পরও বিশ্বভারতী পরিচালনার অনেকখানি দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর স্কন্ধে—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ তিনি বিশ্বভারতীর যুগ্ম কর্মসচিব নির্বাচিত হয়ে দশ বৎসর দায়িত্ব বহন করেছিলেন। বিশ্বভারতীর কাজে তাঁর এতটা সময় দিতে হ'ত যে, সরকারি শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলেছিলেন, সরকার বিশ্বভারতীর কাছে তাঁদের এক কর্মচারীকে খুইয়েছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অধ্যয়নে ও চর্চায় প্রশান্তচন্দ্রের গভীর আগ্রহ ছিল একেবারে বাল্যকাল থেকে। কিন্তু নানা কাজের প্রবল তাগিদে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ বড় ক'রে কিছু লেখবার অবসর পান নি। বিশ্বভারতী যখন গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠা ক'রে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন প্রশান্তচন্দ্র বিশেষ সন্ধান ক'রে সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি রচনা উদ্ধার ক'রে গ্রন্থভুক্ত করেন, রবীন্দ্রনাথের কোন-কোন গ্রন্থ তিনি সম্পাদনও করেন। 'মুক্তধারা' প্রকাশিত হলে (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৯) প্রশান্তচন্দ্র 'পথ-মোচন' নামে প্রবাসী-তে (আষাঢ় ১৩২৯) তার একটি ব্যাখ্যানও প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর তিনি 'কবি-কথা' নামে বিশ্বভারতী পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৫০) একটি প্রবন্ধে, সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কবিচরিতের বহু বৈশিষ্ট্য ও মহনীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম-যৌবনে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, যেগুলি পরবর্তীকালে আর প্রচলিত ছিল না, পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে, বহু বৎসর পূর্বে প্রশান্তচন্দ্র প্রবাসী-তে (১৩২৮-২৯) "রবীন্দ্র-পরিচয়" প্রবন্ধমালায় বহুল উদ্ধৃতি-সহ এই গ্রন্থগুলির কয়েকখানির আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন।

১৩৩২ ফাল্গুনে প্রথম বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'চয়নিকা' প্রকাশিত হয়। প্রশান্তচন্দ্রের প্রস্তাবমতো এই সংস্করণের কবিতা নির্বাচিত হয় বিজ্ঞাপন দিয়ে জন-

সাধারণের ভোট নিয়ে। 'চয়নিকা'র 'পাঠ-পরিচয়ে' প্রশান্তচন্দ্র লেখেন, "আমরা পাঠকবর্গের মত অনুসারেই চয়নিকা সংকলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।" তাঁর সাহিত্যিক-রচনার সংখ্যা খুবই সামান্য; যে-কয়টির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল :

প্রবাসী

রবীন্দ্র-পরিচয়। মাঘ-চৈত্র ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩২৯; পথ-মোচন। আষাঢ় ১৩২৯; চলতি ভাষার বানান। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

বিচিত্রা

রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী। বৈশাখ, আষাঢ় ১৩৩৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কবি-কথা। কার্তিক-পৌষ ১৩৫০; 'সৎপাত্র' গল্প কাহার রচনা। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫; 'পালকি-বেহারার গান।' কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬; রাশিয়ার এক প্রান্তে। মাঘ-চৈত্র ১৩৫৮

একটি রচনার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে—"রবীন্দ্র-পরিচয়" (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯)। যে বিশ্বমানবিক আদর্শের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন তার অঙ্কুর যে পাওয়া যায় কবির কৈশোর রচনায়, এই প্রবন্ধটিতে প্রশান্তচন্দ্র তা জানান। প্রশান্তচন্দ্রই সূচনা করেন রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী সংকলনের এবং বিভিন্ন পাঠান্তরের তুলনামূলক আলোচনার।

পরিসংখ্যান (স্ট্যাটিস্টিক্‌স্)

প্রশান্তচন্দ্র পরিসংখ্যানচর্চাতেও নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট ছিলেন। পরিসংখ্যান যে একটি বিজ্ঞান, এ-ধারণা তখন এ-দেশের লোকের ছিল না; তাই আত্মীয় ও বন্ধু মহলে এই নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক মজার কথা শোনা যায়, যেমন শান্তি-নিকেতনের শিশুবিভাগের তক্তাপোষ নাকি প্রশান্তচন্দ্রের হিসেবমতো এ-দেশের শিশুদের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য অনুযায়ী। ফলে অবশ্য একটু লম্বা শিশু হলেই বাধত গোলমাল। পরিসংখ্যানচর্চায় ক্রমশ তাঁর দু'চারটি তরুণ সহযোগীও জুটল এবং এঁদের নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার লেবরেটরিতে নিজের কামরায়

উনি পত্তন করলেন 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল লেবরেটরি'। কাজের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে কামরার সংখ্যাও অবশ্য বাড়াতে হ'ল—তারপর এই কাজ বেশ জ'মে উঠে পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, ও ১৯৩১ সালের ২২ ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট'। এর তিন বছর পরে ১৯৩৪ সালের জুন মাসে প্রশান্তচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ইন্‌স্টিটিউটের মুখপত্র ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা 'সংখ্যা'। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পত্রিকার অন্যতম ব'লে 'সংখ্যা' স্বীকৃত হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৯২৬ সালে ইয়োরোপ-ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছিলেন সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম যান ইটালিতে মুসোলিনির আমন্ত্রণে। মুসোলিনির অভিপ্রায় ছিল রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিস্ট মহিমা প্রচারের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা। তাই রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাগুলির বিকৃত রিপোর্ট ছাপা হ'ত ঐ-দেশের কাগজে। প্রশান্তচন্দ্র প্রায় দিনরাত খেটে ডিকশনারি দেখে-দেখে যতটা সম্ভব ইটালিয়ান কাগজের মিথ্যা প্রচারের তর্জমা ক'রে রবীন্দ্রনাথকে সব কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন। এইসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' (১৯৬৯) বইতে।

কবির সঙ্গে ইয়োরোপ-ভ্রমণের সময় একাধিক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ধারা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে প্রশস্ত হয়েছিল এবং দেশবিদেশ থেকে বিশ্বের সেরা বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত প্রশান্তচন্দ্রের নিমন্ত্রণে ইন্‌স্টিটিউটের আতিথ্যগ্রহণ এবং এর কাজে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন।

চাকুরির শেষ অধ্যায়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মফস্বলে যেতে রাজি হ'লে তিনি বহুদিন আগেই অধ্যক্ষের পদমর্যাদা লাভ করতেন, উপরওয়ালাদের একসময় তাই ছিল সিদ্ধান্ত। কিন্তু তখন পরিসংখ্যানের চর্চা যথেষ্ট জ'মে উঠেছে, সুতরাং আর কলকাতা ছেড়ে গেলে প্রশান্তচন্দ্রের এই ঐকান্তিক সাধনা একেবারে পণ্ড হয়ে যেত। তাই তিনি স্থির করলেন চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সুবিধামতো বাড়ি দেখে তাঁর কর্মকেন্দ্রকে তিনি সেখানে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে শুধু উৎসাহ দিলেন না, নির্মলকুমারী ও প্রশান্তর সঙ্গে কলকাতার আশেপাশে বাড়ি খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত তখনকার (তিরিশ দশকের মাঝামাঝি) প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন

বেকার লেবরেটরিতে এসে পরিসংখ্যানের কাজ দেখে সরকারের পূর্বনির্দেশ রদ করলেন।

১৯৪৮ সালে প্রশান্তচন্দ্র চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট উঠে গেল কলকাতার উপকণ্ঠে তার বর্তমান আলয়ে। ইতিপূর্বে প্রশান্তচন্দ্র তাঁদের নিজের বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন ঐখানেই। রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত ও নির্মলকুমারীর নূতন বাসগৃহ দেখে যেতে পারেন নি কিন্তু এর সংলগ্ন আমবাগানের কথা শুনে বাড়িটির নামকরণ ক'রে গিয়েছিলেন 'আম্রপালী' আর নির্মলকুমারীকে বলেছিলেন যে বুদ্ধদেবের শিষ্যার এই নামটির যেন অমর্যাদা না-ঘটে।

পরিসংখ্যান-বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ দেশে ও বিদেশে প্রভূত সম্মান অর্জন করেছেন, যথা: রয়্যাল সোসাইটি অফ লণ্ডনের এবং রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সভ্যপদ লাভ। ১৯৪৬ সালে ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হবার পর থেকে উনি প্রায় প্রতি বৎসরই বিদেশ-যাত্রা শুরু করেন।

পরিসংখ্যান-বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রশান্তচন্দ্রের কীর্তির পরিচয় দিতে পারেন পরিসংখ্যান-বৈজ্ঞানিকেরাই। তাঁদের মধ্যে প্রশান্তচন্দ্রের একাধিক শিষ্যের আজ জগৎ-জোড়া নাম। যেমন, রাজচন্দ্র বসু, যিনি এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একজন সম্মানিত অধ্যাপক ও ডক্টর সি. আর. রাও, যিনি ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ-পদে প্রশান্তচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তবে একটি কথা বলা যেতে পারে — পরিসংখ্যানকে প্রশান্তচন্দ্র এমন একটা হাতিয়ার হিসাবে দেখতেন, যা দিয়ে জনগণের কল্যাণ প্রকৃষ্টতমভাবে সাধন করা যেতে পারে। যেমন, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। এই কথা উপলব্ধি ক'রেই রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালে ১২ জুন তারিখের একটি চিঠিতে প্রশান্তচন্দ্রকে লেখেন:

"দেশের নানা প্রয়োজনে তোমাকে যে চার দিকে ডাকাডাকি করে শুনতে খুব ভাল লাগে, মনে গর্ববোধ করি। প্রাদেশিক অহঙ্কার আমার মনে নেই, তবু যখন বাঙালির বুদ্ধির বিশিষ্টতার একটা কোনো পরিচয় পাওয়া যায় তখন সেটা স্বীকার করে নিতে হয়। তোমার কাজে যে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সেটা কেবল একাডেমি নয়, নানা দিকে তার ব্যাবহারিক মূল্য থাকাতে দেশের সর্বত্র সমাদরের সঙ্গে তোমার প্রবেশ ঘটেছে, সেটা তো কম কথা নয়, সকলের চেয়ে প্রশংসার বিষয় এই যে তুমি মানুষ তৈরি করছ, নানা লোককে তাদের প্রয়োজনীয়তার অবকাশ দিচ্ছ। আশা করি তুমি যে কাজ গড়ে তুলচ যুদ্ধের হাঙ্গামে তাতে গুরুতর আঘাত লাগবে না।"

রবীন্দ্রনাথের মতন আর-একজন মনীষীর উৎসাহ পরিসংখ্যান-চর্চার পথে প্রশান্তচন্দ্রের মূল্যবান পাথেয় হয়েছিল — তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যে ক্রমশ প্রশস্ত হবে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে এই কথা বলেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেছে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট। তাই প্রশান্তচন্দ্র তাঁর একাধিক বক্তৃতায় বলেছেন, ভারতীয় পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের প্রসারে রবীন্দ্রনাথের ও ব্রজেন্দ্রনাথের দান পরিসংখ্যানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা অসম্ভব।

অনুলেখন: সুবিমল লাহিড়ী

অমল হোম

অমল হোম ঝাঁপ দিলেন কর্মসাগরে—পরীক্ষাসাগর পার হবার আগেই। তারপর আর ফিরে তাকান নি। কতই-বা তাঁর বয়স তখন? গুরুজনদের মনে হয়েছিল আরো কিছুদিন লেখাপড়ার চর্চা করলে ভালো ছিল। লেখাপড়ার চর্চা অবশ্য তিনি করতেন একটু বেশি উৎসাহের সঙ্গেই। আর তার পরিধিও ছিল খুবই প্রশস্ত; কিন্তু রুচি ছিল তাঁর এমনি অভিজাত যে হীন পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষ স্পর্শকাতর।

আরো অনেকের মতো অমলবাবুও আচ্ছন্ন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে। রবীন্দ্রচর্চা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত আর শেষদিন পর্যন্ত ব্রত-পালনে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। কিন্তু রোজগারের কথা তিনি ভোলেন নি। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। আত্মীয়স্বজন, এমন-কি বন্ধুবান্ধবের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তার ওপর বেশভূষার বৈশিষ্ট্যের দিকে প্রবল ঝোঁক। সুতরাং রোজগার না-ক'রে উপায় কী?

অমল হোম রোজগারের পথ বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা। দৈনিক ইংরেজি কাগজ 'বেঙ্গলি' তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় অর্জন করেছিল ভারতব্যাপী অপ্রতিহত প্রভাব। অমল হোমের হাতে-খড়ি হয় এইখানে। গুরুমারা বিদ্যে তিনি অর্জন করেছিলেন, এ-কথা নিশ্চয় কেউ বলবে না, কেননা, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে অমল হোমকে যোগ দিতে হ'ল গুরুমারা ষড়যন্ত্রে। সে এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ। কলকাতার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট কে হবেন এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক। সুরেন বাঁড়ুয্যের দল প্রস্তাব করলেন আমুদাবাদের রাজা হোন প্রেসিডেণ্ট ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বহরমপুরের উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন। অন্য দল বললেন, প্রেসিডেণ্ট হোন আনি বেসাণ্ট ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন দ্বিতীয় দলের বড় পাণ্ডা; হবেনই তো, কেননা থিয়োসফিস্ট হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন থিয়োসফিস্ট সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট আনি বেসাণ্টের এক প্রধান অনুচর।

অমলবাবুর কোনদিনই রাজনীতিতে বিশেষ রুচি ছিল না, থিয়োসফি সম্বন্ধেও ছিলেন তিনি উদাসীন। কিন্তু ঐ-যে রবীন্দ্রনাথের নাম উঠেছিল, সুতরাং তিনি শুনলেন অতল জলের আহ্বান। কোমর বেঁধে তিনি যোগ দিলেন হীরেনবাবুর দলে। শোনা যায় এঁরা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল-এ ভোটাভুটির সময়ে সুরেনবাবুকে আটকে রেখেছিলেন পাশের লাইব্রেরি ঘরে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত আপস হ'ল এই যে আনি বেসাণ্টকেই প্রেসিডেণ্ট করা হবে তবে বৈকুণ্ঠনাথ সেন হবেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এইসব ঘটনার বিবরণ তরুণ অমল হোম লিখেছিলেন একটি পুস্তিকাতে একেবারে বিচক্ষণ সংবাদিকের মতন। এটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। অবশ্য সুরেনবাবুকে লাইব্রেরি ঘরে আটকে রাখায় তাঁর কতখানি হাত ছিল সে-কথা তিনি এই পুস্তিকায় লেখেন নি। ঐতিহাসিকরা কি আর সব কথা লেখেন?

তরুণ অমল হোম এই ব্যাপারের ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন পাকা সাংবাদিক ও সংগঠক হিসেবে। তারপর তিনি আরো হাত পাকালেন লাহোরের 'পাঞ্জাবী' ও এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট'—এই দুই ইংরেজি দৈনিকের দপ্তরে। শেষোক্ত সূত্রে পরিচিত হলেন নেহরু পরিবারের সঙ্গে, কেননা 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কাগজটির মালিক ছিলেন মতিলাল নেহরু। অমলবাবুর জীবনে পরিচয় মানেই ছিল অন্তরঙ্গতা। মানুষের সঙ্গে কী ক'রে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করা যায় তার রহস্য জানতেন অমল হোম—এইখানেই ছিল তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এই রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন ব'লেই তিনি পেরেছিলেন সারা দেশের মনীষীদের রচনা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর পাতায় প্রকাশ ক'রে একটি নাগরিক পত্রিকাকে সর্বভারতীয় মর্যাদা দিতে।

অমল হোমের রবীন্দ্র-সাধনা ছিল অব্যাহত। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই আমৃত্যু সাধনাকে তিনি সফল রূপ দিতে পেরেছিলেন তাঁর কর্মক্ষেত্রের প্রতিকূল পরিসরের মধ্যেই। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর যখন পূর্ণ হ'ল তখন অমলবাবুর পরিকল্পনায় ও প্রধানত তাঁরই উদ্যমে যে উৎসব-অনুষ্ঠান হয় তা তাঁর রবীন্দ্র-সাধনার চরম পরিণতি। প্রদর্শনী, বক্তৃতা ও জলসার কথা আর কে মনে রেখেছ? কিন্তু রবীন্দ্র-রচনার যে কালানুক্রমিক তালিকা তখন তিনি করেছিলেন ও পরে কবির আশি বছরের জন্মবার্ষিকীতে যে-তালিকাটি তিনি সম্পূর্ণ করেন, তার মূল্য উত্তরসাধকদের কাছে অপরিসীম। এর কুড়ি বছর পরে বেতার কর্তৃপক্ষের আহ্বানে বৃদ্ধ অমল হোম আর-একবার ঝাঁপ

দিলেন প্রচণ্ড কর্মস্রোতে। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী আগতপ্রায়। এই উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বেতার অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এক বিরাট কাজ। এরই ভার পড়ল অমল হোমের উপর। এই কাজ তিনি পূর্ণ করেছিলেন, কিন্তু উৎসবের সময় যখন এল তখন তিনি পক্ষাঘাতে অচল।

অমলবাবু দীর্ঘদিন রোগশয্যায় ছিলেন। এইসময়ে পরিচিত ও অপরিচিত বহু লোকের মুখে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন শুনেছি। অমলদা কেমন আছেন? কেননা তাঁর কর্মনৈপুণ্যের জন্য নয়, ব্যক্তিত্বের জন্যও তিনি ছিলেন বহু লোকের একান্ত প্রিয়। এরকম লোক আর দেখেছি কিনা জানি না, যিনি নানা বয়সের নানা স্তরের নানা রুচির মানুষকে এতটা আপন করতে পেরেছিলেন। অমল হোমের এইটেই সবচেয়ে বড় পরিচয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইস্কুলে পড়বার সময় ১৯১৪-১৫ সালে সুনীতিবাবুর নাম শুনেছিলাম আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় অনিলচন্দ্র সান্যালের কাছে। তিনি ছিলেন সুনীতিবাবুর সহাধ্যায়ী। ছাত্র হিসেবে সুনীতিবাবুর নাম তখন থেকে। ওঁদের আর-এক সহাধ্যায়ী ছিলেন Regina Guha—তাঁর খুব নাম ছিল। তবে তিনি ছিলেন ইংরেজির A group-এর ছাত্রী—তাঁর ঝোঁক ছিল সাহিত্যের দিকে। সুনীতিবাবু B group-এর ছাত্র ছিলেন যার বিশেষ পাঠ্য ছিল প্রাচীন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য। Regina Guha এবং সুনীতিবাবু দু group-এ এম. এ. পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এর অল্পদিন পরেই সুনীতিবাবুকে প্রথম দেখলাম অনিলবাবুর বিবাহ-বাসরে। তখন তাঁর চাপদাড়ি ছিল। সুনীতিবাবুর আর-এক সহপাঠী ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী—শুধু সহপাঠী নয়, অন্তরঙ্গ বন্ধু।

শিশিরবাবু ছাত্রাবস্থাতেই নাম করেন University Institute-এর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিয়ে—বিশেষ ক'রে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের ভূমিকাতে। ঐ-সময় আর-একটি গুণী লোক ছিলেন জ্ঞানপ্রিয় মিত্র—পরে অ্যাটর্নি হন। অমন গলা আর শুনলাম কই! চন্দ্রগুপ্ত নাটকে অন্ধ ভিক্ষুকের গান গেয়ে তিনি দর্শকদের মাৎ ক'রে দিতেন সেই প্রাক্-মাইক যুগে।

Institute-এর নতুন বাড়ি তখন হয় নি। অভিনয় হ'ত গোলদিঘির একেবারে গায়ে-লাগা একতলা বাড়িতে।

এই অভিনয়ের প্রসঙ্গেও সুনীতিবাবুর নাম শুনি সাজসজ্জার পরিচালক হিসেবে। আলেকজণ্ডর সেলুকস প্রভৃতি গ্রীক বীরদের পোশাক তিনি পুঁথি-পত্রের ছবি দেখে ও বর্ণনা প'ড়ে অবিকল নকল ক'রে অভিনেতাদের সাজিয়ে দিতেন। উত্তর-জীবনেও শিশিরবাবুর সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল অক্ষুণ্ণ—যদিও নিজের কাজে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল না ব'লেই জানি। তবে তাঁর কৌতূহলী ও সন্ধানী মন ঐ গ্রীক বীরদের

সাজসজ্জার মতো আরো অনেক ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি নিয়তই আবিষ্কার করত।

সুনীতিবাবু শুধু ভাষাতত্ত্বের গবেষণার রাজপথেই বিচরণ করতেন না, তাঁর যাতায়াত ছিল ইতিহাস ও সাহিত্যের নানা অলিগলিতে—বিচিত্র তথ্যের সন্ধানে। তার কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর নানা রচনাতে। তার চেয়েও বেশি পরিচয় পেয়েছে তারা, যাদের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর মুখের কথা শোনার।

আমার এই সৌভাগ্য ঘটেছিল মান্‌ডে ক্লাবের কল্যাণে—যার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৫ সালে—সুকুমার রায়, কালিদাস নাগ, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতির উদ্যোগে। অমল হোম, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও পরে সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই ক্লাবের সভ্য হন। অতুলপ্রসাদ সেন লখ্‌নৌ থেকে যখনই কলকাতায় আসতেন, মান্‌ডে ক্লাবে যোগ দিতেন। পরে কিছুদিন তো তিনি কলকাতায় এসে বাসা বেঁধেছিলেন।

সুনীতিবাবুকে এই ক্লাবে কে আনলেন ঠিক মনে নেই—হয়তো কালিদাস নাগ।

আমি তখন কিশোর মাত্র। কিন্তু কালিদাসবাবু ও অজিতবাবু দু'জনেই আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন। একরকম তাঁদেরই হাত ধ'রে আমি এই ক্লাবে প্রবেশ করি।

মান্‌ডে ক্লাবের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন সুকুমার রায়। কিন্তু সভ্যদের অনেকেই ছিলেন বেশ বিশিষ্ট, আর পরে তাঁরা খুবই খ্যাতিমান হন। সুনীতিবাবু এই জ্যোতিষ্কপুঞ্জে যে এক বিশিষ্ট স্থান পাবেন তা আর বিচিত্র কী। কেননা তিনি শুধু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার তিনি কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে উজাড় ক'রে দিতে ভালোবাসতেন—শুধু বন্ধুবান্ধব নয়, যাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ত তাদেরই মধ্যে।

মান্‌ডে ক্লাব বছর-তিনেক টিঁকে ছিল। সুনীতিবাবু তখনো বিদেশে যান নি। পৃথিবীর নানা দেশে তাঁর ভ্রমণের পালা শুরু হয় অনেক পরে। কিন্তু দেশবিদেশের নানা খবর—যা খবরের কাগজেও পাওয়া যায় না, পাঠ্য বইতেও না—তিনি গল্পচ্ছলে আমাদের শোনাতেন।

সুনীতিবাবুকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ হয়েছিল বিশ্বভারতীর আসরে। প্রতি বছর পৌষ-উৎসবের সময় বিশ্বভারতীর বার্ষিক অধিবেশন

হ'ত শান্তিনিকেতনে। অবশ্য ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর থেকে। মনে পড়ে এক-একদিন রাত্রে অতিথিভবনে যখন অনেকে গিয়ে শুতাম, সুনীতিবাবু আরম্ভ করতেন তাঁর গল্প। কখনো-বা প'ড়ে শোনাতেন হোমার বা কোরান থেকে, কখনো বলতেন শান্তিনিকেতনের চারপাশে যে-সব সাঁওতালরা বাস করত তাদের হাতের কাজের বৈশিষ্ট্যের কথা। কখনো-বা বঙ্কিমচন্দ্র বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির মজার গল্প।

১৯২৭ সালের বড়দিন। শান্তিনিকেতনের উৎসব শেষ হ'ল। সুনীতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কখনো গয়া দেখেছ?' বললুম, 'না।' বললেন, 'আমার সঙ্গে যাবে? সেখানে আমার শ্বশুরবাড়ি, ভালোই থাকবে।' আমার তখনো শ্বশুরবাড়ি হয় নি। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির আদর যে কাকে বলে তা সুনীতিবাবুর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বুঝলুম।

একদিকে যেমন ছিল খাওয়াদাওয়ার বহর তেমনই আর-একদিকে ছিল সুনীতিবাবুর সাহচর্য। মন্দির আর মূর্তি আর ঘাট—একটির পর একটি আমাকে দেখাতেন আর বলতেন তাদের ইতিহাস। বুদ্ধগয়ায় যাবার পথে যেতে-যেতে তাঁর মুখের কথায় আর-একবার জীবন্ত হয়ে উঠল বুদ্ধদেবের জীবন ও সাধনা। আবার একদিন যাওয়া গেল বরাবর পাহাড়ে—সেখানকার আশ্চর্য গুহামন্দির দেখতে, যার ভিতরকার দেওয়ালের পালিশ একটি রাসায়নিক বিস্ময়। তারপর আমাকে পাঠালেন নালন্দা ও রাজগীর দেখতে। একলা। এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন—শুধু দেখবার জিনিসের নয়, খাবার জিনিসেরও—যে, মনে হচ্ছিল তিনি সবসময় পাশেই আছেন। গয়ায় ফিরে যখন তাঁকে সব রিপোর্ট দিই, তিনি আগ্রহের সঙ্গে শুনে আবার মাঝে-মাঝে একটু সংশোধন ক'রে দিতেন। কেননা নিজের চোখে যা দেখেছি তা বলতে গিয়েও মাঝে-মাঝে একটু ভুলচুক হ'ত।

সুনীতিবাবুর প্রসঙ্গে আর কত লিখব!

সুনীতিবাবুকে একসময় লোকে অত্যন্ত কট্টর হিন্দু ব'লে জানত। কিন্তু শেষজীবনে দেখেছি, তাঁর মত হয়েছে অনেক উদার। কিন্তু বহুদিন আগেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল যেমন প্রবল তেমনই প্রবল ছিল হিন্দুদের আতিশয্যের প্রতি তাঁর বিরাগ। একটি ঘটনার কথা বলি।

১৯২৭ সাল। সিটি কলেজের ছাত্রবৃন্দ শুরু করল প্রবল আন্দোলন কলেজ-সংলগ্ন রামমোহন হোস্টেলে সরস্বতী পূজা নিষেধের বিরুদ্ধে। সুভাষচন্দ্র বসু

নেতৃত্ব নিলেন এই আন্দোলনের। আমি তখন সিটি কলেজের অধ্যাপনাতে সবে নিযুক্ত হয়েছি। সুনীতিবাবু তখন থাকতেন সুকিয়া রো-তে—আমি থাকতাম কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথ তখন 'প্রবাসী'-তে একটি প্রবন্ধ লিখে সিটি কলেজের পরিচালকদের তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন।

এইসময় একদিন সুনীতিবাবুর সঙ্গে পথে দেখা হতে বললেন, 'দ্যাখো হে, তুমি তো ব্রাহ্ম, কিন্তু আমি নিষ্ঠাবান হিন্দু, কিন্তু তাই ব'লে ধূমধাম ক'রে পূজা করলেই যে খুব ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া হয় তা মনে করি না। ছাত্রেরা বড়ই বাড়াবাড়ি করছে।' তারপর আমাকে বললেন, 'চলো, একবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী সত্যানন্দের কাছে যাই।' তাদের আশ্রম তখন ছিল সিটি কলেজের কাছে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে। স্বামী সত্যানন্দ সুনীতিবাবুকে সমর্থন ক'রে বললেন, 'শামিয়ানা খাটিয়ে বড় মূর্তি গড়িয়ে পূজা করার কী দরকার? যাঁদের সত্যিকারের নিষ্ঠা আছে তারা তো ঘরের মধ্যে ঘট পূজা করতে পারে—যেমন আমরা করি। সুতরাং ছাত্রদের এই আন্দোলন অহেতুক।'

এ তো গেল পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

অল্পদিন আগে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ অমিয়কুমার সেনের পত্নীর শ্রাদ্ধবাসর থেকে তাঁর গাড়িতে এলাম বালীগঞ্জ পর্যন্ত। পথে আসতে-আসতে তিনি বললেন, 'তোমাদের এই ব্রাহ্ম শ্রাদ্ধ-বিধি আমার বেশ ভালো লাগে। এতে অনাবশ্যক অনুষ্ঠান কিছু নেই। সোজাসুজি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। এইজন্য আমার শিখধর্ম-ও এত ভালো লাগে।' এরপর শিখধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন।

এই আমার তাঁর সঙ্গে শেষ আলাপ।

—